রেজ অফ অ্যাঞ্জেল

সিডনি সেলডন

সূচিপত্র

দু-হাজার বছর আগের কথা.....2

কয়েকটা সপ্তাহ.....82

অ্যাডাম বাইরে গেছে.....157

হাসপাতালের একটা বিছানায়.....226

দু-হাজার বছর আগের কথা

নিউইয়র্ক : ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।

আজ থেকে প্রায় দু-হাজার বছর আগের কথা। সে সময় রোমে একধরনের নিষ্ঠুর প্রাণসংহারী খেলা চলতো বিভিন্ন সার্কাস প্রতিষ্ঠানে। এই খেলা হতো মনুষ্যরূপী অসহায় শিকারদের সঙ্গে ক্ষুধার্ত নেকড়ে বা সিংহদের। শিকারীরা অত্যন্ত সতর্কভাবে শিকারের ওপর নজর রাখত। তারপর ধীর অথচ স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে যেত এবং ঝড়ের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তো নিরীহ শিকারদের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে, নির্মমভাবে তাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। এইভাবে অনুষ্ঠিত হত মল্লভূমির হত্যা পর্ব।

কিন্তু মানুষ বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছে। সে এখন আগের তুলনায় অনেক সুসভ্য ও আধুনিক মনস্ক হয়েছে। তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অতীতের সেই প্রাণসংহারী খেলার গতি-প্রকৃতি পাল্টেছে। শিকার ও শিকারীর চেহারার মধ্যে এসেছে পরিবর্তন। অতীতের মল্লভূমির একচ্ছত্র নায়ক সুয়েতোমিয়াসের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আদালতের স্টেনোগ্রাফার, যার কাজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ নথীভুক্ত করা।

সুদুর অতীতের রোমের সেই মল্লভূমির উদ্ভব ঘটেছে একালের ম্যানহাটানের ফৌজদারী আদালতের ষোলো নম্বর এজলাসে। এখানে এসেছেন বিভিন্ন সংবাদপত্রের ডজন খানেক সাংবাদিক ও বেশ কিছু দর্শনার্থীরা। এঁরা সকাল সাতটা থেকে এজলাসের বাইরে

সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করছিলেন–যাতে এজলাসের ভেতরে বসতে পারেন এবং খুনের মামলার চাঞ্চল্যকর বিবরণ পরিষ্কারভাবে জানতে পারেন। দৈনিক পত্রিকার শিরোনামে এই খুনের ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘটনাটি সব মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছে।

এই প্রাণসংহারী খেলায় যাকে শিকার হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে তিনি বছর বত্রিশের এক যুবক। নাম মাইকেল মোরেটি। মোরেটি শান্ত স্বভাবের, ভদ্র, মার্জিত চেহারার ব্যক্তি। তার মুখশ্রী সুন্দর হলেও এক ধরনের বন্যতা ও হিংস্রতার ছাপ সেই মুখে স্পষ্ট। মাইকেলের মাথায় একরাশ কালো চুল। পরিপাটি করে আঁচড়ানো। তার দুচোখের তারায় গভীর দৃষ্টি। তার পরনে হালকা নীল রঙের শার্টের ওপর ধূসর রঙের স্যুট। গলায় নীল রঙের রেশমী টাই বাঁধা। আর পায়ে পালিশ করা ঝকঝকে চামড়ার জুতো। মাইকেল মোরেটি শান্তভাবে : বিবাদীর টেবিলে বসে আছেন। তার দুচোখে চঞ্চলতা ও উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। তিনি এজলাসের চারদিকে বার বার দৃষ্টিপাত করছেন।

এই খেলায় আরেক চরিত্র হলেন রবার্ট ডি সিলভা। তিনি মাইকেল মোরেটির প্রতিপক্ষ। অর্থাৎ শিকারী সিংহের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। এই আদালতে তিনি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছেন। তিনি পেশায় নিউইয়র্ক কাউন্ট্রির দুদে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি। সারা জীবন তিনি কাজের পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন। উচ্চতায় তিনি যদিও খুব বেশি নন তবে তার দৈহিক গঠনশৈলী খুবই আকর্ষণীয়। ডি সিলভা মুষ্টিযুদ্ধে পারদর্শী। তিনি যৌবনে একাধিক মুষ্টিযুদ্ধে প্রতিযোগী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মুখের ক্ষত চিহ্নগুলি এখনও তার প্রমাণ স্বরূপ বিরাজ করছে।

রবার্ট ডি সিলভা একজন উচ্চাকাঙ্খী মানুষ। যেকোনো ভাবে উচ্চাকাঙ্খ পূরণ করতে তিনি বদ্ধ পরিকর। তিনি আজ যে জায়গায় এসে পৌঁছেছেন, সেখানে আসতে হলে টাকা। বা খুঁটির জোরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তিনি এ দুটোকে সাহায্যের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেননি। সকলের ধারণা ডি সিলভা অসহায় জনগণের সেবায় ব্রতী হয়েছেন। যে কোনো কাজে জনগণ তাকে পাশে পাবার আশা করেন। তাই তিনি অনায়াসে উন্নতির শিখরে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু মানুষের ধারণা ছিল ভুল। ওটা ছিল ডি সিলভার বাইরের মুখোশ। এই ছদ্মবেশের আড়ালে তিনি ছিলেন এক ভয়ংকর নিপুণ যোদ্ধা, ক্ষমা করা বা ভুলে যাওয়া কথাগুলি তার অভিধানের পাতা থেকে মুছে গেছে।

সাধারণত তিনি ছোটো খাটো মামলায় ফৌজদারী আদলতে আসেন না। মামলায় সওয়াল করার মতো তার অধীনে প্রচুর কর্মচারী আছেন। তাদের কাউকে কিংবা ইচ্ছে করলে সিনিয়ার সহকারীদের যে কাউকে পাঠাতে পারতেন। এটা মাইকেল মোরেটির মামলা। এ এক অসাধারণ জটিল মামলা, তাই তিনি নিজেই এই মামলার তদারকির দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি নিজেই এই মামলায় সওয়াল করবেন বলে স্থির করেছেন।

মাইকেল মোরেটির কেসটি নিয়ে গোটা দেশ তোলপাড় হয়েছে। তার সম্পর্কে দেশের সবকটি দৈনিক সংবাদপত্রে নানারকম চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। নিউইয়র্কের পূর্বাঞ্চলে পাঁচটি কুখ্যাত মাফিয়া পরিবারের বসতি। সেখানকার সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয় ওইসব মাফিয়াদের অঙ্গুলি হেলনে। এদের মধ্যে একটি হল গ্র্যানেলি। এই দলটির বিশাল প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। এই দলে কর্মীর সংখ্যাও অনেক। গ্র্যানেলির ডন বা নেতা হলেন আন্তোনিও গ্র্যানেলি। ইনি হলেন মাইকেল মোরেটির শ্বশুর। আন্তোনিও গ্র্যানেলির বয়স হয়েছে, তাই সকলের স্থির বিশ্বাস শ্বশুরের অবর্তমানে ডনের পদটি

মাইকেল মোরেটির দখলে আসবে। আর সেই জন্যই তাকে মাফিয়া বিদ্যায় শিক্ষিত করার প্রস্তুতি চলছে। মাইকেল মোরেটি ইতিমধ্যে ডজন খানেক অপরাধের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। মোরেটি শুধু মানুষের হাড় ভেঙ্গে পঙ্গু করে দেন না, খুন করাতেও হাত পাকিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি ডি সিলভা তার বিরুদ্ধে অতীত মামলায় এইসব অপরাধের কোনোটিরই প্রমাণ দাখিল করতে পারেন নি। প্রমাণ ছাড়া কোনো কেই আইনে যুক্তিগাহ্য হয় না।

মোরেটি খুব নিখুঁত এবং পরিকল্পিতভাবে একেকটি অপরাধ সংঘটিত করতেন। আর এমন সাবধানতা অবলম্বন করতেন যাতে কোনো প্রত্যক্ষদর্শী না থাকে। এর ফলে প্রমাণ সংগ্রহ করতে সরকারকে নাস্তানাবুদ হতে হতো। তবুও তারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারতো না।

এবার আসরে নামলেন ডি সিলভা স্বয়ং। মোরেটির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। এ কাজে তিনি পুরো তিনটি বছর ব্যয় করলেন, তারপর পরিশ্রমও করতে হয়েছে তাকে প্রচুর। এমন সময় অনভিপ্রেতভাবে একটি ঘটনা ঘটলো। কিছুদিন আগে পুলিশ একটি লোককে গ্রেপ্তার করেছিল, সে ডাকাতি করতে গিয়ে খুন করেছে। অনেক কসরত করে পুলিশ তার নাম জানতে পেরেছে, ক্যামিলো স্টেলা। মোরেটির পরিচালনাধীন মাফিয়া পরিবারের খুনে সদস্য ওই স্টেলা।

এই খবর রবার্ট ডি সিলভার কানে পৌঁছলো। তিনি ভাবলেন আমি যা চেয়েছি তা পেয়েছি। অপ্রত্যাশিতভাবে সৌভাগ্য দেবী আমার হাতে ধরা দিয়েছে। তিনি খুব খুশি।

ঠার পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হয়েছে। ডি সিলভা জানতেন ক্যামিলো যে অপরাধে অভিযুক্ত তাতে বিচারে তার ফাঁসি অবধারিত।

রবার্ট ডি সিলভা বিচক্ষণ উকিল। তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এল, যদি এই লোকটিকে কোনোভাবে আয়ত্বে আনা যায় তাহলে মোরেটির বিরুদ্ধে যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রামাণ আদালতে পেশ করতে তার অসুবিধা হবে না, যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি ক্যামিলোর সঙ্গে দেখা করতে জেলখানায় গেলেন। তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন–তার যাতে ফাঁসি না হয় সেই ব্যবস্থা তিনি করবেন বিনিময়ে তাকে কিছু খবর জানাতে হবে। আর সেই খবরগুলি যেন সত্যি ও পাকা হয়। সেসব খবর মাইকেল মোরেটির বিভিন্ন অপরাধ ও তাদের পরিকল্পনা। বিষয়ক।

বলা বাহুল্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ক্যামিলল স্টেলা রবার্টের কথায় সম্মত হল। ব্যাপারটা যে এত সহজে হয়ে যাবে তা রবার্টের ধারণার অতীত ছিল। ক্যামিলো তার চুক্তিতে সম্মতি দেওয়ায় তিনি পুলকিত হয়েছিলেন। এর পেছনে একটা কারণ ছিল। এই মামলায় তিনি জিততে পারলে তার উচ্চাশা পূরণ তথা স্বার্থসিদ্ধি হবে। যদি ক্যামিলো স্টেলা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার জবানবন্দী দেয় এবং এতে মাইকেল মোরেটির যাবতীয় অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে মাইকেল মোরেটির আদালতের রায়ে মৃত্যুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। এটা কেউ রুখতে পারবে না। বরং মোরেটি তা মেনে নিতে বাধ্য হবে। এটা ডি সিলভা ভালোভাবেই জানতেন, যে এর ফলে পূর্বাঞ্চলের সবচাইতে বড় ও প্রভাবশালী কুখ্যাত মাফিয়া পরিবারটি শিরদাঁড়া ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। এছাড়া তার নিজেরও স্বার্থসিদ্ধি সফল হবে। এতবড় কৃতিত্বের জন্য তাঁকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করা হবে। আর সেটি হবে অ্যালবানির গভর্নরের ওই আসনটি।

উচ্চাকাঙ্খী স্বার্থলোভী ডি সিলভা শুধু আইন ব্যবসার সাফল্যে তৃপ্ত নয়, আমেরিকার রাজনীতির আকাশে উজ্জ্বল তারা হয়ে ফুটে ওঠার আশা মনে মনে পোষণ করছিলেন বহুদিন ধরে। নিউইয়র্কের অন্যান্য গভর্নররা এর মধ্যেই হোয়াইট হাউসে যে যার আসন পাকা করে ফেলেছেন। সেই হোয়াইট হাউসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা এতদিনে পূরণ করতে চলেছেন রবার্ট। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন বুকের ভেতরে লালিত বাসনা পূরণ করতে হলে মাইকেল মোরেটিকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসাতেই হবে। তাহলে হোয়াইট হাউসে ঢুকতে আর কোনো বাধা থাকবে না। সময়ও তার অনুকুলে। এছাড়া রাষ্ট্রের ক্ষমতাশালী ও তুখর রাজনৈতিক নেতারাও তাকে সহায়তা করছেন। মোরেটিকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলেই ওইসব রাজনৈতিক নেতাদের বদান্যতায় গভর্নর পদের নির্বাচনে আগামী বছর প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে পারবেন। তাই যেভাবেই হোক মোরেটিকে কুপোকাৎ করতে হবে।

গোড়া থেকেই ডি সিলভা সতর্ক ছিলেন। কোনোরকম ঝুঁকির মধ্যে যাননি, মাইকেল মোরেটির বিরুদ্ধে মামলাটি তিনি সযত্নে সাজিয়েছিলেন। এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় করার কাজে তিনি যাদের নিযুক্ত করেছিলেন তারাও খুব আন্তরিকভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করেছে। আইনের কোনো ফাঁক ছিল না তাতে, যার মাধ্যমে আসামী মোরেটি বেকসুর খালাস পেতে পারেন।

এদিকে জুরি বাছাই করতে ডি সিলভার পুরো ছ-সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল। ডি সিলভা বিচারককে অনুরোধ করেছিলেন দুজন অতিরিক্ত জুরীকে বিকল্প হিসাবে রাখতে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রথম থেকেই এই মামলার জুরীদের নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল, তাও ডি সিলভার বিশেষ আর্জিতে। যাতে কোনো বাইরের লোক জুরীদের

বাড়ীতে ঢুকতে না পারে, তার জন্য বাড়ীর দরজায় তালা লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মামলার একমাত্র রাজসাক্ষী ছিল ক্যামিলো স্টেলা। যে একসময় মাইকেল মোরোটির দলের খুনে গুণ্ডাদের একজন ছিল। রবার্ট ডি সিলভা তাকেও নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আবদ্ধ করেছিলেন। অতীতের একটি ঘটনাই ডি সিলভাকে সতর্ক থাকতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। বহুদিন আগে এই রকমই একটি মামলার প্রধান অভিযুক্ত ছিল এক মাফিয়া চক্রের সর্দার। তার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী করা হয়েছিল আবে কিড টুইস্ট নামে এক ব্যক্তিকে। কনি দ্বীপপুঞ্জের হাফ মুন হোটেলের ছতলার একটি ঘরে আবে কিডের থাকার ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ। দুজন পুলিশ অফিসারকে তার পাহারায় নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রেখেও একদিন সেই রাজসাক্ষীর অন্তিম পরিণতি হয়েছিল মৃত্যু, দেখা গেল সে ওই ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছে এবং এতেই তার মৃত্যু হয়। অবশ্য এ বিষয়ে একটা সন্দেহ সবার মনে উঁকি দিয়েছিল, তা হল, সে নিজে জানালা দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে নাকি ওই পাহারাদার পুলিশ দুজন তাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে? তা রহস্যই থেকে গিয়েছে। সেই পুরনো ঘটনার স্মৃতি ডি সিলভাকে এতখানি দৃঢ় করেছিল। তা মনে রেখেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্যামিলোর প্রহরার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এমনকি প্রতি রাতে ক্যামিলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হতো। বিচারের আগে পর্যন্ত সুনিশ্চিত নিরাপত্তা বজায় রেখেছিলেন

বিচার পর্ব শুরু হল। তাই ক্যামিলো স্টেলার নিরাপত্তার কোনো অভাব রাখেন নি ডি সিলভা। জেলের একটি সেলে তাকে আটকে রাখা হল এবং চারজন সশস্ত্র ডেপুটি

পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা তার প্রহরারত ছিলেন। মাইকেল মোরেটির দ্বারা স্টেলারের যাতে কোনোরকম ক্ষতি না হয় তার জন্য এই নিচ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিচারের পঞ্চম দিনে জেনিফার পার্কার নামে একজন সরকারী উকিল হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিল। সে ছাড়া আরও পাঁচজন উকিল ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। তারা সবই সরকারী উকিলের টেবিলের ওপাশে বসেছিলেন।

জেনিফার পার্কারের বয়স কম, মাত্র চব্বিশ। পাতলা ছিপছিপে গড়ন তার। গায়ের রং ফ্যাকাশে, চোখের মণি দুটি সবুজ রঙের। সেই চোখের দৃষ্টি ভাবুকতাময়। মাথায় কালো একরাশ চুল। সে যেমন সাহসী তেমনি আবেগপ্রবণও বটে। তাছাড়া সে যত না সুন্দরী তার চেয়ে বেশী আকর্ষণীয়া। তাই তাকে যে দেখবে তার মনে ওই মুখটি চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

সরকারী উকিল হিসেবে অংশগ্রহণের প্রথম দিন জেনিফার পার্কারের বিশ্রীভাবে শুরু হয়েছিল। ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির অফিসে শপথ গ্রহণের সময় ঠিক করা ছিল সকাল আটটায়। তাই আগের দিন রাতে সে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে রেখেছিল। যাতে তার তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙে, সেই জন্য ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলেন। সময় নির্দেশিত ছিল ভোর ছটা।

কিন্তু ভাগ্য তার বিরূপ ছিল। তাই নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির অ্যালার্ম বাজেনি। আর জেনিফারের ঘুমও ভাঙেনি। ঘুম যখন ভাঙলো তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। চোখ খুলেই ঘড়ির দিকে তাকলো। সে চমকে উঠলো। ঘড়ির কাঁটা তখন আটটা ছুঁই ছুঁই

করছে। সময় নষ্ট না করে দ্রুত হাতে পোশাক পরলো। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সে মোজা ছিঁড়ে ফেলল, জুতোর হিল খুলে ফেলল।

অগত্যা তাকে আবার জামাকাপড় পাল্টাতে হল। তারপর অ্যাপার্টমেন্টর দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এল। সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল যে সদর দরজা খোলার চাবি ফ্ল্যাটের ভেতর রেখে এসেছে। সেটা আনতে একেবারেই ভুলে গেছে। জেনিফারের ইচ্ছে ছিল বাসে চেপে ফৌজদারী আদালত ভবনে যাবে। কিন্তু বিধি বাম। তাই অগত্যা তাকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করতে হল। তবে ট্যাক্সিতে চড়ার মতো আর্থিক অবস্থা জেনিফারের ছিল না। তবুও সে যথাসময়ে আদালত ভবনে হাজিরার উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি ভাড়া করল। উপরন্তু ওই ট্যাক্সি ড্রাইভার অনেক রাস্তা ঘোরাল। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে সেখানে গিয়ে জেনিফার পৌঁছল। ইতিমধ্যে পনেরো মিনিট সময় পার হয়ে গেছে। ফৌজদারী আদালত ভবনটি ছিল ১৫৫ নম্বর লিওনার্ড স্ট্রীটে। যখন সেখানে সে পৌঁছলো তখন সোয়া আটটা বেজে গেছে।

ফৌজদারী আদলত ভবনে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভার অফিস। বিশাল অফিস কক্ষটি দামী দামী সব আসবাবপত্রে সজ্জিত। এই ঘরটি দেখলেই ডি সিলভার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরের মাঝখানে বিরাট একটা ডেস্ক। ডেস্কের ওপাশে চামড়ার গদিমোড়া একটা আরাম কেদারা, উল্টোদিকে পরপর তিনটি চেয়ার সাজানো। ঘরের একদিকে রয়েছে। একটা কনফারেন্স টেবিল, আর টেবিলটিকে ঘিরে রেখেছে বারোটি চেয়ার। চার দেয়ালে ক্যাবিনেট আটকানো। সেগুলি মোটা মোটা আইনের বইতে ঠাসা। এছাড়া দেয়ালের গায়ে কয়েকটি ছবি টাঙানো আছে। সেগুলির কোনোটি জে এডগার

হুভার ফটো, কোনোটি জন লিন্ডসের ফটো। এইসব ছবিতে এঁদের প্রত্যেকের নাম সই করা আছে। এইসব ছবিগুলো ঘরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

জেনিফার পার্কারের যাওয়ার আগে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির অফিস পঁচিশজন তরুণ আইনজীবীদের আগমনে ভরে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সদ্য ল পাস করেছে। তারা সবাই আগ্রহী নিউইয়র্ক কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভার-এর সহকারী হিসাবে যোগ দিতে।

ডি সিলভা তরুণ আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে উদ্যত হলেন। হঠাৎ জেনিফার পার্কার সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। দেরী হওয়ার জন্য সে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ডি সিলভা বলছিলেন, এমন সময় জেনিফার অবিবেচকের মতো ঢুকে পড়ায় তার ভাষণে ছেদ পড়লো। ফলে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে জেনিফারকে ধমকে বললেন–কি ভেবেছো তুমি? তোমার ইচ্ছেমতো কি এখানে আসবে?

–আমি দুঃখিত স্যার, আমি–জেনিফার আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে ডি সিলভা বলে উঠলেন–খবরদার! মুখে মুখে কথা বোল না! আর কখনও যেন এরকম দেরী না হয়!

ঘরের ভেতর উপস্থিত অন্যান্য আইনজীবীদের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো জেনিফারের দিকে। তাদের সেই দৃষ্টিতে সহানুভূতির ছায়া ছিল। জেনিফার ধীরে ধীরে তাদের একজনের পাশে গিয়ে বসে পড়লো, আবার ডি সিলভা বলতে শুরু করলেন।

–তোমাদের আসার কারণ আমার জানা আছে। দিনের পর দিন আমার সঙ্গে থেকে তোমরা আইনের মারপ্যাঁচগুলো শিখবে, আইনের মোক্ষম মারণাস্ত্রগুলো সম্পর্কে অবহিত হবে। তারপর একদিন তোমরা ফৌজদারী উকিল হবে। তোমাদের এই প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমিও চাই তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন একদিন আমার যোগ্য হয়ে উঠবে এবং আমার আসনে আসীন হবে। তোমরা সেই যোগ্যতা নিশ্চয়ই অর্জন করতে পারবে। ভাষণ শেষ করলেন রবার্ট ডি সিলভা। তিনি তার সহকারীকে ডাকলেন। সহকারী কাছে আসতে রবার্ট বললেন–এইসব নবাগত তরুণ আইনজীবীদের শপথ গ্রহণ করতে বলো।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল। রবার্ট ডি সিলভা একটা চুরুট ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন তাহলে এবার তোমরা কাজে যোগ দাও। বিভিন্ন মামলার খসড়া, সমন ও পরোয়ানার বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করো। বর্তমানে আমার হাতে একটা মামলা আছে। আমার মনে হয় তোমরা সে সম্পর্কে খবরের কাগজ থেকে অনেক কিছু জেনেছো। ওই মামলার জন্য আমি ছ-জন সহকারী নিয়োগ করতে চাই। তারা আমাকে ওই মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করবে। আমি তাদের দিয়ে আমার প্রয়োজনীয় কাজগুলো করিয়ে নেবো।

রবার্ট কথা শেষ করতেই জেনিফার হাত তুলল। সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচ জন হাত তুললাম। রবার্ট কিছুক্ষণ ভাবলেন। তাপর তাদের দুজনকেই সহকারী হিসেবে নিয়ে নিলেন।

ছ-জন সহকারীকে পরিচয়পত্র দেওয়া হল। তারপর ডি সিলভা তাদের ১৬ নম্বর, এজলাসে যেতে হুকুম করলেন।

জেনিফার ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির ব্যবহারে একটুও ক্ষুদ্ধ হয়নি। বরং সে খুব খুশী হয়েছে, নিউইয়র্ক কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির অন্যতম সহকারী হতে পারার জন্য। তাই সে আনন্দে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির রুক্ষ কড়া কথাগুলো আর মনে রাখেনি। এর ফলে সে কিছুটা গর্বিতও হয়েছিল। জেনিফারের বিশ্বাস যে সে রবার্ট ডি সিলভার মতো রাগী মানুষকে ভুল বুঝবে না। তার দেওয়া যে কোনো কাজ জেনিফার সাফল্যের সঙ্গে করতে পারবে এমন একটা আস্থা সে মনে মনে লালন করতো। বিচার, আপীল, প্রতরণা এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধ জগতের আইন বিষয়ক দপ্তরের দায়িত্বে আছেন একজন করে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি। নিউইয়র্ক শহরে মোট পাঁচটি বরো আছে। এই প্রত্যেক বরোর জন্য একজন করে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি নিযুক্ত আছেন। তাদের সাহায্য করার জন্য আছে দুশোর বেশি সহকারী ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি। এইরকম একটি বরোর ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি হলেন রবার্ট ডি সিলভা, তিনি যে বয়োর ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির পদে আছেন সেটি হল ম্যানহাটান। এটি অন্য চারটির থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই জেনিফার ভাবছিল, আইন বিষয়ক ওই চারটি দপ্তরের মধ্যে কোনটির কাজ দেখাশোনা–করতে হবে তাকে।

মামলা চলাকালীন জেনিফার এজলাসে উপস্থিত থেকে ডি সিলভার সওয়ালের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। রবার্টের তদন্তের দক্ষতা দেখে জেনিফার মুগ্ধ হয়ে গেছে। একবার সে এই মামলার আসামী মাইকেল মোরেটিকে দেখলো। এতদিন মোরেটি সম্পর্কে জেনিফার খবরের কাগজের খবরগুলি পড়েছে। কিন্তু আজ চোখের সামনে মোরেটিকে দেখে সে বিস্মিত না হয়ে পারলো না। সে ভাবছিল এমন একজন রোগা

চেহারার মানুষ কি করে নৃশংস নিষ্ঠুর হতে পারে। নিজের চোখে না দেখলে নিজের কানে না শুনলে সে বিশ্বাস করতেই পারতো না যে মাইকেল মোরেটি একজন কুখ্যাত মাফিয়া ডন ও খুনী। জেনিফারের মনে হল সে যেন কোনো সিনেমা হলে বসে বসে কোনোও ফিল্মের ছবি ভোলা দেখছে। প্রকৃত পক্ষে মাইকেল মোরেটিকে দেখলে কোনো ফিল্মের নায়ক বললে ভুল হবে না। মোরেটি এখন স্থির হয়ে বসে আছে। কিন্তু তার কালো দুটি চোখ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই চোখের চাহনি সারা এজলাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয় সে যেন কিছু একটা খুঁজছে। হয়তো বা বাঁচার তীব্র তাগিদে কোনো একটি সুযোগের সন্ধানে রয়েছে। তবে তার সে চেষ্টা ফলবতী হবে না। কেননা রবার্ট ডি সিলভা মোরেটির বাঁচার সব রাস্তাই চারদিক থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন।

রাজসাক্ষী ক্যামিলল স্টেলাকে আদালত চত্বরে হাজির করা হয়েছে। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষীর কাঠগড়ায়, পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন রবার্ট ডি সিলভা। এসে থামলেন। কাঠগড়ার সামনে। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্টেলা শপথ বাক্য উচ্চারণ করছে–যা বলবো সত্য বলবো, সত্যি বই মিথ্যা বলবো না।

রবার্ট বলতে আরম্ভ করলেন–মিঃ স্টেলা, মাননীয় জুরীদের আগে আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে নরহত্যার মামলার অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। যেহেতু আপনি সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিতে সম্মত হয়েছেন তাই আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সামান্য লাঘব করা হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে যে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে তা অনিচ্ছাকৃত খুন বলে বিবেচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রও তা মেনে নিয়েছে। এবার বলুন আমি যা বললাম তা সত্যি কিনা?

– হ্যাঁ স্যার। শব্দ কয়টি উচ্চারণের সময় ক্যামিলোর গলা কেঁপে উঠেছিল।

–মিঃ স্টেলা, আপনি কি মাইকেল মোরেটিকে চেনেন?

হ্যাঁ স্যার। আমি মাইকেলের দলে কাজ করতাম। প্রায় দশ বছর ধরে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।

তাহলে আমি কি ধরে নেবো আপনি আসামীর খুব কাছের মানুষ ছিলেন? এবার আসামী পক্ষের উকিল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন–অবজেকশন। আসামী অর্থাৎ মাইকেল মোরেটির উকিলের নাম টমাস কোলফ্যাক্স। বয়স তার পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা মাথার চুল। তিনি মাফিয়া চক্র সংক্রান্ত আইন দেখাশোনা করেন। এছাড়া তিনি একজন খ্যাতনামা উকিলও বটে।

টমাস আবার বললেন–ধর্মাবতার, ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি সাক্ষীকে প্ররোচিত করছেন, এখানেই আমার আপত্তি আছে।

এই মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন লরেন্স ওয়াল্ডম্যান। তিনি আসামী পক্ষের উকিলের আপত্তি স্বীকার করে নিয়ে বললেন–অবজেকশন সাসটেইন্ড।

রবার্ট ডি সিলভা একটুও দমলেন না। তিনি আবার জেরা করতে শুরু করলেন আচ্ছা মিঃ স্টেলা, মাইকের দলে আপনি কি কাজ করতেন?

–আমার কাজ ছিল কোনো ঝামেলা হলে অর্থাৎ কেউ বেগড়বাই করলে তাকে শায়েস্তা করার জন্য মাইক আমাকে পাঠাতো।

–কিভাবে তাকে শায়েস্তা করতেন?

মারধোর করে।

–এ ধরনের একটা উদাহরণ দিতে পারেন মহামান্য বিচারকের কাছে?

আসামীপক্ষের উকিল আবার আপত্তি জানালে তা জজ লরেন্স ওয়াল্ডম্যান অগ্রাহ্য করলেন। তিনি বললেন–সাক্ষী ইচ্ছে করলে উত্তর দিতে পারে।

ক্যামিলো স্টেলা ঘাড়ের দপদপানি অনুভব করল। তবুও সে বলল হুজুর, আমার মনিব মাইক সুদের কারবারী, তার কাছ থেকে অনেকেই চড়া সুদে টাকা ধার নিতো। যে সময় মতো টাকা শোধ করতো না তখন আমায় ডাকতেন মনিব। জিমি সেরানো নামে একটি লোক মাইকের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল। দু-তিন বছর পরেও সে টাকা শোধ করেনি। তাই মাইক আমাকে পাঠিয়েছিলেন জিমিকে শিক্ষা দেবার জন্য। হুজুর আমি প্রথমে জিমি সেরানোর দুটি পা ভেঙে দিলাম।

রবার্ট ডি সিলভা আড়চোখে জুরী মহোদয়দের দিকে তাকালেন। ক্যামিলো স্টেলার এই ভয়ানক হিংস্র কার্যকলাপের বিবরণ শুনে তাদের কি প্রতিক্রিয়া তা প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যেই ডি সিলভা জুরীদের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে জুরীগণও এই বীভৎস কুৎসিত ক্রিয়াকলাপে শিহরিত হয়েছেন।

টাকা ধার দেওয়া ছাড়া মাইকেল মোরেটি আর কি কি ধরনের কাজ করতো বলে আপনি জানেন মিঃ স্টেলা?

–অনেক রকম কাজ, যেমন ওয়াটার ফ্রন্ট, যেখানে জাহাজের খালাসি ও বন্দরের কুলি মজুরদের বাস। সেখানকার যে ইউনিয়ন নেতা তার সঙ্গে মাইকের ভালো সম্পর্ক। আছে। এছাড়া মাইক আরও অন্যান্য কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

–মিঃ স্টেলা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন এডি আর অ্যালবার্ট র‍্যামোসূকে খুন করা হয়েছে। আর তা করা হয়েছে মাইকেল মোরেটির নির্দেশে। সুতরাং সেই অভিযোগে অভিযুক্ত মাইকেল মোরেটির বিচার হচ্ছে এই আদালতে।

স্টেলা অস্পষ্ট স্বরে বলল–জানি হুজুর।

–সেই সময় কি আপনি ওই অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন?

স্টেলা কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল–হ্যাঁ হুজুর।

–কেন আসামী র‍্যামোস ভাইদের খুন করতে চেয়েছিল?

উত্তর দেওয়ার আগের মুহূর্তে ক্যামিলো স্টেলা মাইকেল মোরেটির দিকে তাকালো। তাদের দুজনের মধ্যে চোখাচোখি হল। পর মুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নিয়ে স্টেলা বলতে শুরু করল–মাইক ঘোড়াদৌড়ের ওপর বেআইনী জুয়ার এক ব্যবসা করতেন। ওই ব্যবসা দেখাশোনার ভার ছিল এডি ও অ্যালবার্ট দু-ভাইয়ের ওপর। একদিন মাইক লোক

মারফত খবর পেলেন যে ওই দুভাই জুয়ার ব্যবসা থেকে টাকা আত্মসাত করছে। কিছুমাত্র চিন্তা না করে মাইক ওই বেইমান দুই ভাইকে কঠিন শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। সমুদ্রের ধারে মাইকের নিজস্ব একটা ক্লাব আছে। মাইক তার নাম দিয়েছিলেন দ্য পেলিক্যান, আর নিজেই ওটা পরিচালনা করতেন উনি। সেখানে এক পার্টি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আমাকে দিয়ে মাইক ওদের দু-ভাইকে নেমতন্ন করে আনলেন। পরিকল্পনা মতো নির্দিষ্ট দিনে আমি নিজে গিয়ে এডি আর অ্যালবার্টকে নিয়ে এলাম ওই ক্লাবে। মাইক আগে থেকেই সেখানে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা তিনজনেই গাড়ি থেকে নামলাম। আমি একপাশে সরে যেতেই মাইক ওদের দুজনকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরা মাটিতে পড়ে গেল।

–ওরা দুজনেই মারা গিয়েছিল?

হুঁ হুজুর।

তারপর আপনারা কি করলেন মিঃ স্টেলা?

–ওদের দুভাইকে খতম করার পর মাইক আর একটুও দেরী করলেন না, আমার সহায়তায় ওদের কবর দিয়ে দিলেন।

স্টেলার বক্তব্য শেষ হতেই এজলাসের ভেতর মৃদু গুঞ্জন উঠল। সেই অবসরে জেনিফার পার্কার ঘাড় ফিরিয়ে মাইকেল মোরেটির দিকে তাকালো। সে হয়তো মোরেটির মুখের অভিব্যক্তি অনুভব করার চেষ্টা করছিল। তার মধ্যে কোনো রকম বিকৃতির লক্ষণ দেখতে পেল না. জেনিফার। মাইক আগের মতোই অনড়, অটল ভাবলেশহীনভাবে বসে ছিলেন।

তার চোখ রবার্ট ডি সিলভা আর ক্যামিলো স্টেলার দিকে। এজলাসের গুঞ্জন স্তিমিত হওয়া পর্যন্ত রবার্ট ডি সিলভা মুখ বন্ধ করে রইলেন।

ডি সিলভা আবার ধীর শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন–মিঃ স্টেলা, আপনি কি জানেন যে আপনার এই সাক্ষ্যর বয়ান অনুযায়ী এই আদালত আপনাকেও দোষী হিসেবে অভিযুক্ত করতে পারেন?

-হ্যাঁ হুজুর।

আপনি এও নিশ্চয়ই জানেন আপনার সাক্ষ্য দানের জন্য একটি মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতে পারে?

–হ্যাঁ হুজুর।

–তাহলে মিঃ স্টেলা, আপনি স্বীকার করছেন র‍্যামোস ভাইদের পরিকল্পিতভাবে ঠান্ডা মাথায় মাইকেল মোরেটি নিজের হাতে খুন করেছেন, আর তার সাকরেদ আপনি তা দেখেছিলেন।

আসামী পক্ষের উকিল টমাস কোলফ্যাক্স আবার উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললেন অবজেকশন মী লর্ড! ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি সাক্ষীকে প্ররোচিত করছেন।

জজ লরেন্স ওয়াল্ডম্যান বললেন–ঠিক আছে, আপনার আপত্তি গ্রাহ্য হল।

ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি ডি সিলভা এজলাসের ভেতর বসে থাকা জুরীদের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন, তাঁদের ভাবভঙ্গি দেখে তিনি সুনিশ্চিত হলেন যে, এই কেসে তার জয় অবধারিত। তিনি উৎসাহিত হয়ে আবার ক্যামিলো স্টেলার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন মিঃ স্টেলা, আমি জানি এই আদালতে এসে আপনি সত্য গোপন না করে নির্ভীক চিত্তে সাক্ষ্যদান করেছেন। এতে আমরা সবাই আপনার সাহসিকতার প্রশংসা না করে পারছি না। আমি নিউইয়র্কের সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কথাগুলো বলেই রবার্ট ডি সিলভা তার দীর্ঘ জেরার ইতি ঘটালেন। তারপর আসামী পক্ষের উকিল টমাস কোলফ্যাক্সকে বললেন–এবার আপনি জেরা শুরু করতে পারেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে টমাস কোলফ্যাক্স চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ তিনি ঘড়িটার দিকে তাকালেন।

টমাস কোলফ্যাক্স দেয়াল ঘড়িটার দিকে আঙুল তুলে বিচারককে দেখিয়ে বললেন এখন বারোটা বাজে। এটা লাঞ্চের সময়, আমি চাই না আমার জেরার মাঝখানে লাঞ্চের বিরতি হোক। আমি অনুরোধ করছি আপনি এখনই যেন লাঞ্চের বিরতি ঘোষণা করে দেন।

জজ লরেন্স ওয়াল্ডম্যান আসামীপক্ষের উকিলের অনুরোধ মেনে নিলেন। তিনি বেঞ্চের ওপর হাতুড়ি ঠুকে জানিয়ে দিলেন যে দুপুর দুটো পর্যন্ত আদালত মুলতবি রইল।

বিচারক এরপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাশের দরজা দিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ করলেন। এরপর উপস্থিত সবাই যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, জুরী:ভদ্রমহোদয়গণ বাইরে বেরিয়ে গেলেন। চারজন সশস্ত্র ডেপুটি ক্যামিলো স্টেলাকে বেষ্টন করে সাক্ষীর কামরায় নিয়ে গেলেন। ক্যামিলল স্টেলার সাক্ষ্যদান কালে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রিকার প্রতিনিধিরা ওই বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারাও সবাই রবার্ট ডি সিলভার জেরা ও ক্যামিলোর সওয়াল জবাব শুনেছেন। এবার তারা সমস্বরে রবার্ট ডি সিলভাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলেন। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন–শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা কতদুর গড়াবে বলে আপনার ধারণা। এ মামলার নিষ্পত্তি হলে আপনি কি সত্যিই ক্যামিলল স্টেলার জীবন রক্ষা করতে পারবেন, মিঃ ডি সিলভা।

এই মামলার আগে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা,আদালতের ভেতর রিপোর্টারদের উপস্থিতি পছন্দ করতেন না। কিন্তু এখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতি একটু অন্য রকম। নিজের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের স্বার্থসিদ্ধির পরিপূরক হিসেবে এই সময় রিপোর্টারদের আগমন তার কাছে ভীষণ জরুরী, এটা উপলব্ধি করতে পেরেই তিনি রিপোর্টারদের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। বরং বিনীত ও নম্রভাবে তাদের সব প্রশ্নের জবাবদিহি করতে লাগলেন হাসি মুখে। গভর্নরের পদে উন্নীত হবার জন্য তাকে এখন বিনয়ের অবতার হতে হবে এবং এদের সঙ্গে শান্ত স্বরে কথা বলতে হবে।

ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা, আসামীর কি ধরনের সাজা হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

রবার্ট ডি সিলভা বিনীতভাবে জবাব দিলেন-দেখুন, আসামীর দোষ গুণ বিচার করবেন বিচারক ও জুরীগণ। এটা তাদের কর্তব্য, এক্ষেত্রেও মিঃ মাইকেল মোরেটির বিচারের রায় তারাই দেবেন, আমি আর কি বলবো?

জেনিফার ডি সিলভার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

হঠাৎ জেনিফারের চোখ গিয়ে পড়ল মাইকেল মোরেটির ওপর। সে দেখতে পেল আসামী মিঃ মোরেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অদ্ভুত শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই।

ইতিমধ্যে রিপোর্টাররা সবাই চলে গেছে। রবার্ট ডি সিলভা ততক্ষণে তার সহকারীদের নিয়ে মামলা সংক্রান্ত আলোচনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের আলোচনা শোনার জন্য জেনিফার উদগ্রীব হয়ে উঠল। সে অস্থির হল এখনকার আলোচনার বিষয়বস্তু জানার জন্য। তার এই মানসিক অস্থিরতার মধ্যে একজন অপরিচিত লোক হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটির হাতে একটা বড় ম্যানিলা খাম।

লোকটি জেনিফারকে জিজ্ঞাসা করল–আপনিই কি জেনিফার পার্কার?

হতভম্ব হয়ে জেনিফার কয়েক সেকেন্ড ওই লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল–হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে আপনার কী প্রয়োজন?

চীফ এটা আপনাকে দিতে বলেছেন। এর ভেতরে যেসব কাগজপত্র আছে তাতে মাফিয়া ডন মাইকের নানা কুকীর্তির ঘটনাবলী ও দিন তারিখ লেখা আছে। আপনি এটা স্টেলার

কাছে পৌঁছে দিন। আর বলবেন, এখানে সেগুলি যেন স্টেলা ভালো করে মুখস্থ করে নেয়, যাতে কোলফ্যাক্সের জেরার মুখে সব উল্টোপাল্টা না বলে বসে। জেরার চাপে হয়তো স্টেলা এতক্ষণ যা বলেছে সব ভুলে যাবে, তাই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বলেই লোকটি জেনিফারের দিকে খামটিকে এগিয়ে দিল।

জেনিফার খামটি হাতে নিল। মনে মনে রবার্ট ডি সিলভাকে কৃতজ্ঞতা জানালো সে এই ভেবে যে তিনি তার নামটি মনে রেখেছেন।

লোকটি এবার তাড়া দিয়ে বলল দয়া করে তাড়াতাড়ি যান, লাঞ্চের বিরতিটুকুর মধ্যেই এটাকে স্টেলার পড়ে ফেলতে হবে।

যাচ্ছি স্যার। বলেই একছুটে এসে হাজির হল জেনিফার যেখানে স্টেলাকে রাখা হয়েছে সেখানে। হাতে তার সেই ম্যানিলা খামটি।

সঙ্গে সঙ্গে একজন সশস্ত্র ডেপুটি জেনিফারকে বাধা দিয়ে বললেন–বলুন, আপনি কোথায় যাবেন?

–কিভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করবো?

তেজোদ্দীপ্ত স্বরে জেনিফার বলল–আমি ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির অফিস থেকে আসছি। মিঃ ডি সিলভা স্টেলাকে একটা খাম পাঠিয়েছেন। সে ব্যাগ থেকে তার পরিচয়পত্র বের করল এবং প্রহরারত ডেপুটিকে দেখালো।

সেই প্রহরী তার কর্তব্য কাজে অবহেলা করলেন না। তিনি পরিচয়পত্রটি বেশ ভালো করে পরীক্ষা করলেন এবং নিঃসন্দেহ হতেই তিনি রাজসাক্ষী স্টেলার ঘরের দরজা খুলে দিলেন। জেনিফার সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। জেনিফার দেখলো ঘরটি খুবই ছোট। আরামের কোনো উপকরণ সামগ্রী নেই কিছু। আসবাব বলতে একটা ভাঙা ডেস্ক, একটা সোফা আর কয়েকটি কাঠের চেয়ার। এসবই পুরনো আমলের জিনিস। র‍্যামোস ভাইদের খুনের মামলার রাজসাক্ষী ক্যামিলো স্টেলা সেই ঘরে একটি চেয়ারে চুপচাপ বসেছিল। তার একটি হাত থরথর করে কাঁপছিল, তাকে চারজন সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছিল।

জেনিফারকে দেখে একজন প্রহরী সন্দিহান হয়ে উঠল। সে বলল–এখানে বাইরের কারও প্রবেশ নিষেধ।

বাইরে যে ডেপুটি প্রহরায় ছিলেন তিনি আশ্বস্ত করে বললেন–অ্যাল ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির অফিস থেকে এসেছেন, ওঁর লোক, ওঁকে ছেড়ে দাও।

খামখানা ক্যামিলল স্টেলার হাতে দিয়ে জেনিফার ওই অচেনা লোকটির শেখানো কথাগুলো আওড়ে গেল।

এরপর জেনিফার লাঞ্চ খাবার উদ্দেশ্যে বাইরে বেরিয়ে এল। আদালতের ভেতরেই একটি খালি এজলাসের ওপর তার দৃষ্টি আটকে গেল। দুটি বড় টেবিল, এই টেবিল দুটি রয়েছে জজের বেঞ্চের ঠিক নিচে। একটির গায়ে বিবাদী লেখা, অন্যটির গায়ে বাদী লেখা। একপাশে জুরীদের বসার চেয়ার। সেগুলি চারটি করে দুটি সারিতে রয়েছে। এইসব দেখে গণতান্ত্রিক দেশের আইন ব্যবস্থার প্রতি জেনিফার শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলো

না। সভ্যতা ও বর্বরতার মধ্যে পার্থক্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিরাজ করছে এই আদালত কক্ষটি। প্রতিটি স্বাধীন দেশের জনগণ সুবিচার পাওয়ার দাবী করতে পারেন। এই অধিকারের দাবী ফলপ্রসূ হতে পারে একমাত্র জুরীদের মাধ্যমে। যদি কোনো দেশের নাগরিকরা জুরীদের মাধ্যমে বিচারের অধিকার হারিয়ে ফেলে তাহলে সেই দেশকে পরাধীন বলে পরিচিতি অর্জন করতে হবে। যেহেতু জেনিফার নিজে এখন এই আইন ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত হয়ে আছে, তাই এই পরিত্যক্ত ফাঁকা এজলাসে দাঁড়িয়ে তার খুব গর্ব হচ্ছে। আইনের অধিকার ও তার মর্যদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বদা সে সচেষ্ট থাকবে। এখানে দাঁড়িয়ে সে আনা ভাবনায় মশগুল হয়ে গিয়েছিল। জেনিফার খেয়ালই করেনি যে কখন সময়টা গড়িয়ে গেছে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেতেই সে সামনের দিকে পা বাড়ালো।

এমন সময় জেনিফারের কানে এল অনেকগুলো লোকের চীৎকার। সেই চীৎকার ভেসে আসছে আদালত ভবনের একটি অংশ থেকে, ক্রমশ সেই চীৎকার হট্টগোলে পরিণত হল। অতর্কিতে বিপদ ঘন্টা বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং রবে। জেনিফার পেছনে ফিরল। সে এগিয়ে। গেল। আদালত ভবনের সর্বত্র বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে সে হতচকিত হয়ে গেল। তার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। সে শুধু অপলক দৃষ্টিতে উদভ্রান্ত মানুষের ছোটাছুটি দেখছিল। পুলিশ রাইফেল উঁচিয়ে আদালত ভবনের প্রবেশ দ্বারের দিকে ছুটে যাচ্ছে। জেনিফার ভাবলো মাইকেল মোরেটি হয়তো পুলিশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আদালত থেকে পালিয়েছেন। আসল খবরটা জানার জন্য সে দ্রুত পায়ে করিডোরে এসে হাজির হল। সেখানকার মানুষ জন এমন আচরণ করছেন তা কেবলমাত্র পাগলদের ক্ষেত্রে সম্ভব। তখনও একটানা বিপদসংকেত ঘন্টা বেজে চলেছে। আর মানুষের ছোটাছুটিরও বিরাম নেই।

এতক্ষণ খবরের কাগজের সাংবাদিকরা টেলিফোনের মাধ্যমে তাদের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। তারা মোরেটি মামলার সমস্ত খবর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অফিসকে জানাচ্ছিল। তাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিল। ব্যাপারটা কি জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল তারা। স্বচক্ষে ব্যাপারটা অনুধাবন করার জন্য তারাও এসে দাঁড়িয়েছে করিডোরে।

ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিলেন। তিনি বেশ কিছু পুলিশকে কিসব হাত নেড়ে বলছিলেন। তার মুখে রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। কে যেন শুষে নিয়েছে সব রক্ত। এসব কিছু জেনিফারের নজর এড়াল না।

কোনও ভাবে ডি সিলভাকে সাহায্য করা যায় কিনা এই আশায় জেনিফার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। রবার্ট ডি সিলভা কয়েকজন ডেপুটির সঙ্গে কথা বলছিলেন। এরাই রাজসাক্ষী ক্যামিলল স্টেলার প্রহরার ভারপ্রাপ্ত প্রহরী। তাদের মধ্যে একজন জেনিফারকে দেখতে পেয়ে চিনতে পারলো। সে তৎক্ষণাৎ ডি সিলভাকে কিছু একটা বলল। ডি সিলভার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এসে পড়ল জেনিফারের ওপর। তারপর ডি সিলভার নির্দেশে জেনিফারকে ঘিরে ধরতে মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়েছিল পুলিশ ডেপুটিরা।

জেনিফারকে তারা জানালো এখন সে তাদের হাতে বন্দী। কারণটা বুঝে ওঠার আগেই তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হল।

জেনিফারের বিচার শুরু হল। বিচার স্থল জজ লরেন্স ওয়াল্ডম্যানের কামরা। সেখানে জজ লরেন্স ও জেনিফার ছাড়াও হাজির ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা ও আসামী পক্ষের উকিল টমাস কোলফ্যাক্স।

জজ ওয়াল্ডম্যান বলতে শুরু করলেন–মিস পার্কার, যে কোনো আসামীর বিবৃতি দেবার আগে একজন উকিলের পরামর্শ ও সাহায্য নেবার অধিকার আছে। আপনার ক্ষেত্রে তার অন্যথা হবে না। আপনি চাইলে আমরা তার ব্যবস্থা করতে পারি। অথবা আপনার ইচ্ছে হলে আপনি চুপ করে থাকতে পারেন, সে অধিকারও আপনার আছে।

জেনিফার দৃঢ় চিত্তে বলল–তার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। ঘটনা যা ঘটেছে তা আমি নিজেই বলতে পারবো, এ বিশ্বাস আমার আছে।

রবার্ট ডি সিলভা জেনিফার পার্কারের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাই সে স্পষ্ট। দেখতে পেল তার কানের রগের দাপাদাপি।

রাগে ডি সিলভার চোখ দিয়ে আগুন ঝরছিল। তিনি জোরালো কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জেনিফারকে–ওই প্যাকেটটা ক্যামিলো স্টেলাকে কে দিতে বলেছে আর তার বিনিময়ে তুমি কত টাকা পেয়েছো?

রাগে, অপমানে, উত্তেজনায় জেনিফার পার্কার থর থর করে কেঁপে উঠল। সে ডি সিলভার চোখে চোখ রেখে পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বলল–কে টাকা দিয়েছে আমাকে? আমি কারও টাকা নিইনি?

ওই কামরায় একটি ডেস্ক ছিল। তার ওপর একটি বড় ম্যানিলা খাম পড়ে ছিল। সেটা ডি সিলভা হাত বাড়িয়ে বললেন–এটা তাহলে কোথা থেকে এল, এটাকেই বা তুমি কেন আমার সাক্ষী ক্যামিলো স্টেলাকে দিতে গেলে? এসব কি তুমি বিনা স্বার্থে করেছো?

জেনিফারের উত্তরের আশা ডি সিলভা করেন না। তিনি জজের ডেস্কের সামনে আবার এগিয়ে গেলেন, ডেস্কের ওপর খামটাকে উল্টো করে ধরলেন, তারপর মুখ খুলে খামটিকে আঁকাতে শুরু করলেন। একটু আঁকাতেই মুখ খোলা খামটি থেকে বেরিয়ে এল হলদে রঙের একটা ক্যানারি পাখির মৃতদেহ। তার ঘাড়টা কে যেন ভেঙে দিয়েছে। তা দেখেই ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল জেনিফার পার্কার, সে তোতলাতে শুরু করল। সে অনেক কষ্টে বলল–আপনার একজন লোক এটা আমার হাতে দিয়ে স্টেলাকে দিতে বলেছে।

আমার লোক? গর্জে উঠলেন ডি সিলভা, কোথায় সে? কার কথা বলছ তুমি?

–আমি–আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না।

অথচ, তুমি এটা জানো যে, লোকটা আমার দলের, ডি সিলভার গলায় অবিশ্বাস।

–আমি মিথ্যে বলছি না। জেনিফারের কণ্ঠে মিনতি–আমি স্বচক্ষে ওই লোকটিকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। আপনার সঙ্গে কথা বলল, তারপর আমার কাছে এগিয়ে এল, খামটা তুলে দিল, বলল, স্টেলাকে দিয়ে দিতে। আমি ভাবলাম, আপনারই নির্দেশে-লোকটি আমার নামটাও জানে।

–জানতে তো হবেই। এবার বলো তো, কাজটা করার জন্য কত টাকা পেয়েছো?

জেনিফারের মুখে কথা নেই। সে বোকার মতো কেবল তাকিয়ে রইল। এই মুহূর্তে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা তার কাছে দুঃস্বপ্ন ঠেকল–সে তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। ছটা বাজতে আর কিছুক্ষণ বাকি আছে। তারপর সে বিছানা থেকে উঠে পড়বে। চোখ মুখ ধোবে। পোশাক পরবে, তারপর ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির অফিস গিয়ে উপস্থিত হবে। সেখানে আজ ডি সিলভা তাকে সহকারী হিসেবে শপথ গ্রহণ করাবেন।

কী হল, বল, কত পেয়েছো?

রবার্ট ডি সিলভা তখন রাগে ফেটে পড়লেন। আচমকা দুঃস্বপ্নের রেশ কেটে গেল জেনিফারের।

আপনি কি আমাকে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত করতে চাইছেন?

–অভিযুক্ত করছি কিনা প্রশ্ন করা হচ্ছে? রবার্ট ডি সিলভা ক্ষিপ্ত হয়ে দুহাতের মুঠো পাকাতে লাগলেন, শুনুন ভদ্রমহোদয়া, আমি এখনও আসল কাজ শুরু করিনি। আমার জেরার চোটে জেরবার হয়ে যাবেন। লম্বা জেল হবে।

যেদিন বাইরে আসবেন, সেদিন আর এই উঠতি বয়স থাকবে না, টাকাটা ভোগ করার সময় যাবে পেরিয়ে।

না, আমি কোনো টাকা নিইনি। জেনিফার প্রতিবাদী হয়ে উঠল।

এতক্ষণ ওদের দুজনের কথা চালাচালি চুপ করে শুনছিলেন টমাস কোলফ্যাক্স। তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন–মাপ করবেন ধর্মাবতার, এইভাবে চলতে থাকলে বেশীদুর এগানো যাবে না বলে আমার মনে হয়।

–ঠিকই বলেছেন। জজ ওয়াল্ডম্যান তাকালেন ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির দিকে। এখন আপনার কী করবার আছে ববি? স্টেলা কি জেরার সামনে দাঁড়াতে চাইবে?

রবার্ট ডি সিলভা বললেন–এখন জেরা করে কোনো সুরাহা হবে না। স্টেলা দারুণ ঘাবড়ে গেছে। জেরার উত্তর দেবার মতো ওর মানসিকতা এখন নেই।

ধর্মাবতার, আসামী পক্ষের উকিল টমাস কোলফ্যাক্স ধীর গলায় বললেন রাজসাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ যদি না পাই তাহলে এ মামলা খারিজ করে দেওয়ার আবেদন আদালতের কাছে পেশ করব।

–ববি, আপনি কিছু বলুন, ববি। জজ বললেন, এই মামলা খারিজ হতে পারে, এ সম্পর্কে আপনার রাজসাক্ষীর কি কোনো ধারণা আছে?

আছে ধর্মাবতার, ও এত ভয় পেয়েছে যে ওর মনে হচ্ছে, ওকে নিশ্চয়ই মাফিয়াদের হাতে মরতে হবে, কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

–এই পরিস্থিতিতে আসামী পক্ষের উকিলের আবেদন আমাকে গ্রাহ্য করতে হচ্ছে। জজ ওয়াল্ডম্যানের গম্ভীর গলা, মামলা খারিজ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই।

বিচারকের রায় শুনে রবার্ট ডি সিলভা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। মনে মনে রাগে তিনি ফেটে পড়লেন। দিনের পর দিন ধরে মামলাটা একটু একটু করে গড়ে তুলেছিলেন। সেই মামলা আজ খারিজ হয়ে যাবে। মাইকেল মোরেটির সামান্যতম ক্ষতি তিনি করতে পারবেন না। তিনি হতাশ হলেন। পরক্ষণেই এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন, মোরেটি তার হাত ফসকে: চলে গেছে ঠিকই, কিন্তু মিস জেনিফার পার্কার আছে তার হাতের মুঠোয়। যে অপূরণীয় ক্ষতি সে করেছে, তার শাস্তি ভোগ তাকে করতেই হবে। সুদে আসলে তিনি সব আদায় করে নেবেন।

আসামীকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হল। বিচারক তার রায় শোনালেন–জুরীদেরও মামলা খারিজ করে দেবার সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ হুজুর। আসামী পক্ষের উকিল টমাস কোলফ্যাক্স মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে জয়ের উল্লাসের প্রকাশ নেই।

আর যদি কিছু বলার না থাকে তা হলে–

বিচারককে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ডি সিলভা বললেন–এখনও অনেক কিছু বলার আছে হুজুর। শেষ হয়নি কিছুই। তারপর তিনি জেনিফারের দিকে তাকিয়ে বললেন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, গোপন সাক্ষীকে প্রভাবিত করা, এবং আদালতের কাজে বাধাদানের প্রচেষ্টার অভিযোগে আমি এই যুবতীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার আর্জি জানাচ্ছি। রাগে তখনও ডি সিলভা ফুলছেন।

জেনিফারও রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। আপনি যে সমস্ত অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে করেছেন সেগুলো একটাও আমি করিনি। জেনিফারের গলায় জোরালো প্রতিবাদী সুর। আপনি কোন কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না। না বুঝে আমি একটা কাজ করে ফেলেছি, সেটাই আমার অপরাধ। তবে আবার বলছি, এই কাজের জন্য আমাকে কোনো ঘুষ দেওয়া হয়নি। আমি ধরে নিয়েছিলাম, প্যাকেটটা পৌঁছে দেওয়া মানে, আপনার নির্দেশ পালন করা। এছাড়া আর কিছু নয়।

–আপনি কী ভাবছেন জানি না, বিচারক বলে উঠলেন, তবে পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। জেনিফারের দিকে তাকালেন তিনি–আমি চাই, ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা হোক এবং প্রয়োজনে আপনার আইনজীবীর অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে এবং কোনো আদালতে আপনি যাতে ওকালতি করতে না পারেন, সরকারী তরফে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে।

বিচারকের মুখ থেকে একথা শুনতে হবে বলে জেনিফার আশা করেনি। সে যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল। বলল–ধর্মবতার, আমি...

বিচারক তার কোনো কথা না শুনে আদালতের কাজ বন্ধ করে দিলেন।

জেনিফার অবাক এবং হতভম্ব। সে ওই নির্মম ও নিষ্ঠুর মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। না, এই মুহূর্তে তার কথা কেউ শুনবে না।

জেনিফারের বলার অপেক্ষা রাখে না ক্যানারি পাখিটা। বিচারকের ডেস্কের ওপর সে পড়ে আছে। মরণের মধ্যে দিয়ে সে যা কিছু বলার বলে গেছে।

–সেদিন সন্ধ্যেবেলা। টিভি, রেডিওর খবরে দেখা গেল জেনিফার পার্কারের ছবি। সেদিন জেনিফার যেন একটা তাজা খবর। চারদিকে রটে গেল, ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির সহকারী জেনিফার পার্কার এক রাজসাক্ষীকে একটি ঘাড় মটকানো ক্যানারি পাখি দিয়েছে। টিভি স্কিনে ফুটে উঠেছে–জজ ওয়াল্ডম্যানের ঘর থেকে জেনিফার পার্কার বেরিয়ে আসছে। তাকে দেখে বিভিন্ন গণমাধ্যম তার দিকে ছুটে আসছে। সে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

তখন কাগজ, টিভি, রেডিওর ক্যামেরাম্যান ও রিপোর্টারদের প্রশ্নের বিষতীর তার দিকে ছুটে আসছে।

মিস পার্কার, হলদে ক্যানারি পাখিটা আপনি কোথায় পেলেন?

–মাইকেল মোরেটির সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

–আপনি কি জানতেন, এই মামলায় রবার্ট ডি সিলভা জয় লাভ করলে তিনি আগামী গভর্নর হবেন?

ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি আপনার বিরুদ্ধে মামলা করবেন বলেছেন, আপনি যাতে কোনো কোর্টে কাজ করতে না পারেন, তার ব্যবস্থা করবেন। আপনি কি এর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনে জেনিফারের কান তখন ঝালাপালা কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যও তার দুটি ঠোঁট ফাঁক করেনি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা।

টনিজ প্লেস রেস্তোরাঁ।

মাইকেল মোরেটি তার দলের সাগরেদদের নিয়ে ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। অবশ্য এই হোটেলের মালিক তিনি নিজেই। মামলায় তিনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন। সেই উপলক্ষে চলল মদের ফোয়ারা। সবাই গলা পর্যন্ত মদ খেল। আনন্দ ফুর্তি করল।

মাইকেল মোরেটি বসল বারে টিভির সামনে। মদের গ্লাস হাতে। চোখ টিভির সাদা পর্দায়, হাতের গ্লাস তুলে ধরলেন। মনে মনে জেনিফারকে অভিবাদন জানালেন। তারপর ঠোঁট রাখলেন গ্লাসে।

উকিল মহলে আজকের ঘটনাটা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তারা দ্বিধাবিভক্ত। একদল জেনিফারকে ঘুষ দিয়ে মাফিয়ারা কাজটা করে নিয়েছে। আর একদলের বিশ্বাস, িেলফার থাকার নিরাপরাধ, সে পরিস্থিতির শিকার। তবে তারা একটা ব্যাপারে একমত–জেনিফার পার্কার আর নিজের পেশায় ফিরতে পারবে না। দেশের কোনো আদালতে সে কাজ করতে পারবে না।

ওয়াশিংটনের একটি ছোটো শহর, নাম কেলসো।

এখানেই জেনিফারের জন্ম হয়। তার বাবা অ্যাবনার পার্কার পেশায় আইনজীবী। তিন জাতি–ইংরেজ, আইরিশ ও স্কটিশ-এর রক্তধারা তার শরীরে প্রবাহিত। মাঝারি উচ্চতা, কালো চুল মাথায়। ঘন সবুজ দুটি চোখের তারা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আবেগি ও

অনুভূতিপ্রবণ। আইনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তবে অর্থ রোজগারের ব্যাপারে তার আগ্রহ বিশেষ দেখা যায়নি। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তিনি মনে মনে আগ্রহী ছিলেন। কাজের শত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি কিন্তু মেয়ে জেনিফারের জন্য সময় বের করে নিতেন। মেয়ের সঙ্গে আইন বিষয়ক আলোচনা করতেন। তার মক্কেলদের হাজার রকম সমস্যা। তিনি সহজ করে সেইসব মামলার আনুপূর্বিক বিবরণ শোনাতেন। বড়ো হয়ে জেনিফার বুঝতে পেরেছিল, বাবা নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘন্টা কথা বলে ও ভাবের আদান-প্রদান করে সময় কাটাতেন।

জেনিফারের মা ছিলেন খুব সুন্দরী। অথচ তার স্বভাব ছিল বাবা অ্যাবনারের বিপরীত। তিনি বাড়িতে বেশী সময় থাকতেন না, বাইরে কেটে যেত। দিনরাত কী নিয়ে মা অত ব্যস্ত থাকত, সে রহস্য জেনিফারের কাছে আজও অজানা।

স্কুল ছুটির পর জেনিফার বাবার কাছে চলে যেত আদালতে। বাবা কাজকর্ম করত। সে নিবিষ্ট মনে সেগুলো লক্ষ্য করত। দেখত, বাবা তাঁর মক্কেলদের নিয়ে নানা জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। সে সেগুলো বোঝার চেষ্টা করত। বাবার মক্কেলরা অবশ্য মনে মনে জানত অ্যাবনার উকিলের মেয়ে জেনিফার ভবিষ্যতে ওকালতি পেশাকেই বেছে নেবে, তাই তারা এ বিষয়ে বাবাকে কোনো কথা বলত না।

আইন শাস্ত্র জেনিফারের কাছে ছিল প্রথম প্রেম, ছোট্ট বয়স থেকেই। ফলে যে বছর সে পনেরোতে পড়ল, সেই বছরই সে আইনের জগতে প্রাথমিক অধিকার অর্জন করল। এই বয়সে অন্যান্য কিশোরী মেয়েরা ভালোবাসার প্রেমে পড়ে, সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য মন উসখুশ করে। অথচ জেনিফার। সে তখন গরমের ছুটি

কাটাচ্ছে। বাবার কাছে, তার কাজে নানাভাবে সাহায্য করছে। সে শিখেছিল ব্রিফ আর উইল পড়ার ধরন।

জেনিফার বাড়ির বাইরে খুব একটা বেরোত না। অবশ্য কিছু ছেলে তাকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল, তার ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করেছিল। কিন্তু জেনিফার কাউকে। পাত্তা দেয়নি।

মেয়ের এমন ভাব দেখে বাবা অবাক হতেন। সমবয়সী ছেলেদের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই কেন? এ প্রশ্নের জবাবে জেনিফার বলেছিল, বাবা, ওরা সবাই ছেলেমানুষ। কাঁচা বয়স, আমার ওদের ঠিক ভালোলাগে না।

জেনিফারের মনে একটা ধারণা ছিল, তার স্বামী হবে তার বাবার মতোই এক আইনজীবী।

ষোলো বছর বয়সে জেনিফারের জীবনে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। এর জন্য সে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিল না। আঠারো বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে তার মা বাড়ি ত্যাগ করল।

অ্যাবনার স্ত্রীর এই আচরণে মনে মনে অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিলেন। বাতাসে ভর করে হু-হু করে ছড়িয়ে পড়ল–অ্যাবনার উকিলের স্ত্রী প্রতিবেশীর আঠারো বছরের ছেলের হাত ধরে ঘর থেকে পালিয়েছে।

সাধারণ মানুষদের চোখে বাবা ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ। তারা বাবার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিল। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এর ফল হল উল্টো। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বাবা মানসিক দিক থেকে এত আঘাত পেয়েছিলেন যে দুঃখ ভোলার জন্য মদ ধরলেন। জেনিফারও অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু এর ফল হল উল্টো, বাবার ভাঙা সংসার ও মন জোড়া লাগাতে পারেনি। এরপর বাবা মাত্র সাত বছর বেঁচে ছিল।

পরের বছরই স্কুলের পাট শেষ হল জেনিফারের। সে ভাবল, কলেজে ভর্তি হবে না। পুরো সময়টা সে তাহলে বাবার সঙ্গে কাটাতে পারবে। কিন্তু বাবা বেঁকে বসলেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন-জেনি, তোমাকে আমার সহকারী হতে হবে। তাই কলেজে ভর্তি হয়ে গ্রাজুয়েট হয়ে আইনের ডিগ্রিটা নিয়ে নাও।

গ্র্যাজুয়েট হয়ে জেনিফার এল সিয়াটলে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন স্কুলে ভর্তি হল। আইন সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা সে আগেই লাভ করেছিল। তাই সহযোগীদের মতো ফৌজদারী আর দেওয়ানি আইনের হরেক রকম ব্যাখ্যা নিয়ে তাকে চিন্তিত হতে হয়নি। সে পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে তখন দিন কাটাচ্ছে। সে থাকত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডর্মিটরিতে। সেখানকার একটি লাইব্রেরিতে সে একটা কাজ পেল।

সিয়াটল জায়গাটার সাথে সে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছিল। দুজন সহপাঠীর সঙ্গে তার বেশ আন্তরিক হৃদ্যতা তৈরী হয়েছিল–আমিনি উইলিয়ামস আর জোসেফাইন কলিন্স।

রবিবার এবং যে কোনো ছুটির দিনে তারা তিনজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ত। শহরে মাঝখানে ছিল গ্রিন লেক, সেখানে তারা নৌকা বাইত। কখনও বা লেক ওয়াশিংটনে চলে যেত। গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠত। এখানে হেসটি টেসটি নামে একটি স্ন্যাকসের দোকান ছিল। এখানকার আলুভাজা ছিল খুব বিখ্যাত। তিন জনে হৈ-হৈ করে সেই দোকানে গিয়ে ঢুকত।

এই সময় দুজন পুরুষ তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। নাম নোয়া লারকিন, মেডিকেল নিয়ে পড়াশুনা করছে। দ্বিতীয় জন নোয়ার সহপাঠী, বেন মুনরো। জেনিফার তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে যেত, তাদেরকে সঙ্গ দিত। কিন্তু নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে। তার কাছে প্রেম ও ভালোবাসার চেয়ে পড়াশুনা ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আর একটা টার্ম বাকি আছে, জেনিফারের বাবা মারা গেলেন। সারা শহর সেদিন উজিয়ে এসেছিল তার মৃত বাবাকে শেষ দেখা দেখবে বলে। প্রায় শখানেক লোক তার শব যাত্রায় যোগ দিয়েছিল।

বাবার মৃত্যুতে শোকে তার বুক ফেটে গেল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করল না। সে হারাল তার বাবাকে, সে হারাল তার শিক্ষক, পথ প্রদর্শক এবং গুরুস্থানীয় এক মানুষকে।

বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে জেনিফার সিয়াটল ফিরে এল। বাবা তার একমাত্র কন্যা সন্তানের জন্য রেখে গিয়েছিলেন মাত্র এক হাজার ডলার। নিজের জীবন চলবে কী করে? তার ভবিষ্যতই বা কী? নানা প্রশ্ন তখন তার মনে ভিড় জমিয়েছে। সে কি

কেলসো তে ফিরে যাবে? ওখানে ওকালতি করবে শুধু? না, তা সম্ভব নয়। তাকে দেখিয়ে সকলে আঙুল তুলে বলবে, ওর মা ছেলের বয়সী একটা পুরুষকে নিয়ে কেটে পড়েছিল, স্বামী সংসার, এমনকী মেয়েটার কথাও ভাবেনি।

ল স্কুলে তার রেজাল্ট প্রথম থেকেই ভালো ছিল। তাই দেশের বিভিন্ন আইন প্রতিষ্ঠান থেকে সে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দেবার ডাক পেল।

ওই কলেজে ফৌজদারি বা ক্রিমিন্যাল আইনের অধ্যাপক ছিলেন ওয়ারেন ওকস। তিনিই একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এদেশে কোনো ভালো প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের কাজ পাওয়া সহজ কথা নয়।

পড়াশুনা শেষ হল, এবার কী করবে সে, একথাই ভাবছিল জেনিফার। সেদিন ক্লাস শেষে প্রফেসার ওকস তাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন।

জেনিফার তার ঘরে গেল।

-শোনো জেনি, ম্যানহাটানের ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেরাটিকে তারা সহযোগী হিসাবে নিতে চাইছেন। তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন। তুমি রাজী আছে চাকরিটা নিতে?

জেনিফারের মনে তখন বাঁধভাঙা আনন্দ। এ তো অভাবিত, মেঘ না চাইতেই জল। ম্যানহাটান মানে নিউইয়ক। তার চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই দৃশ্য, ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির

অফিস ঘরে বসে সে কাজ করছে। সহসা তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল ইয়েস স্যার, আমি চাকরিটা নেব।

প্লেনে করে জেনিফার নিউইয়র্কে এল। বার-এর পরীক্ষা দিল, কেলসোতে ফিরে এল। বাবার অফিস পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। বাবার এই অফিসের সঙ্গে তার জীবনের কত স্মৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। আইন শাস্ত্রে তার হাতেখড়ি হয়েছিল তার বাবার কাছেই।

তখন জেনিফার বিশ্ব বিদ্যালয়ের আইন পাঠাগারে একটা চাকরি করছে। বার-এর পরীক্ষায় পাশ করার খবরটা সে পেল।

অবশ্য এ ব্যাপারে জেনিফারের কোনো উদ্বেগ ছিল না। সে জানত, এই পরীক্ষায় পাশ সে করবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। মনে পড়ে গেল প্রফেসার ওকসের কথাগুলি আমাদের দেশে যত কঠিন পরীক্ষা আছে তার মধ্যে একটি হল এটি।

ওই দিনই জেনিফারের কাছে আর একটি সুখবর এসে পৌঁছল। নিউইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির অফিস থেকে কাজে যোগ দেবার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে।

এক বুক আশা নিয়ে জেনিফার পার্কার ম্যানহাটানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

.

থার্ড এভিনিউর একেবারে শেষ সীমানায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিল সে। একটা মাত্র ঘর। বড়ো কৌচ আছে একটা–শোওয়া এবং বসার জন্য। ঘরে মাত্র একটা জানলা। বহু বছর আগে জানলায় কালো রঙের পোচ দেওয়া হয়েছিল, তা আজ প্রকটিত। ঘরের অন্য সব আসবাবের দিকে তাকিয়ে জেনিফারের চোখ ফেটে জল এল।

নিজেকে প্রবোধ দিল সে, মাত্র তো কটা দিন। নিজের পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ভালো কোনো জায়গায় চলে যাব। এ ব্যবস্থা তো চিরস্থায়ী নয়।

কিন্তু তার এসব কল্পনা যে অবাস্তব, তা সে কখনো ভাবেনি। নাহলে মাত্র বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে তার স্বপ্নের মিনার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে? প্রথম দিন কাজে যোগ দিতে এসে যে বিশ্রী ঘটনার মুখোমুখি সে হয়েছে, তা তো আগেই বলা হয়েছে। মিথ্যে দুর্নাম মাথায় নিয়ে তাকে বিদায় নিতে হল ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির অফিস থেকে। এবার যে কোনোদিন তার নাম বার কাউন্সিল থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। তার মানে জীবনে কোনোদিন কোথাও সে উকিলগিরি করতে পারবে না।

টেলিভিশনের স্ক্রিনে জেনিফারের ছবি, ম্যাগাজিনে জেনিফারের ফটো, রেডিওতে জেনিফারের খবর–ওঃ অসহ্য। জেনিফার ম্যাগাজিন পড়া, টিভি দেখা, রেডিও শোনা বন্ধ করে দিল। পথে ঘাটে দোকানবাজারে কেবল একটাই আলোচনা-জেনিফার। তার। দিকে লোকেরা কৌতূহলী চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। এই উপদ্রবের হাত থেকে নিস্তার পেতে সে বাড়ির বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিল। সব সময় দরজা জানলা বন্ধ করে ঘুপচি ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে রইল।

বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে দিল জেনিফার। ঠিক করল, ললাটাকম্বল নিয়ে ওয়াশিংটনে ফিরে যাবে। ওকালতি নয়, অন্য কোনো পেশা বেছে নিতে হবে। তার মনে তখন হাজার চিন্তার আনাগোনা। এইভাবে কি জীবন বাঁচে, এর থেকে মরে যাওয়াই ভালো। আচ্ছ, যদি রবার্ট ডি সিলভাকে সব কিছু খোলাখুলি বলে আরেকবার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়? উনি কি তার অনুরোধ রাখবেন না?

চিঠি লিখতে বসল সে। একটার পর একটা কাগজ নষ্ট হল। খসড়া লেখা হল। অথচ শেষ পর্যন্ত সেটা আর পাঠানো হল না।

এইভাবে দিন কাটাতে কাটাতে জেনিফার হাঁপিয়ে উঠল। বন্ধু বান্ধবহীন। এত বড়ো শহরে সে একা। সে যেন সমাজচ্যুত এক জীব। বন্ধ ঘরের মধ্যে তার কেটে যেত সারাদিন, রাতের বেলা সে পথে বেরোত। নির্জন রাস্তা। একাকী হাঁটত। এমনকী, সমাজের নীচুতলার হতভাগা মানুষগুলো যাদের রাস্তাই আশ্রয়, তারা পর্যন্ত জেনিফারের থেকে দূরে দূরে থাকত। হয়তো তার দুচোখে তারা তাদের নিজেদের একাকিত্ব আর হতাশার ছবি প্রত্যক্ষ করেছিল।

রাতের বেলা নির্জন বড়ো রাস্তা ধরে জেনিফার আপন মনে. ধীর পায়ে হাঁটত, আর ভাবত, সেদিন ঘটে যাওয়া ঘটনাটির কথা। ভাবত আর ইচ্ছে মতো ঘটনাটির পরিণতি পাল্টে দিত কল্পনায়। সে কল্পনা করত লোকটি তার হাতে সেদিন একটা বড়ো খাম তুলে দিয়েছিল স্টেলাকে দেবার জন্য। সে লোকটির পরিচয় পত্র দেখতে চাইল। লোকটি তখন ভয়ে চম্পট দিল।

আবার তার কল্পনায় ভেসে উঠল, খামের মুখ খুলতেই দেখা গেল ভেতরে একটা ক্যানারি পাখি ঘাড় মটকে পড়ে আছে। লোকটাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

না, এসব কিছুই সেদিন ঘটেনি। সেদিন যা ঘটেছিল, তা স্রেফ তার বোকামির ফল। যা তার ভবিষ্যতকে বারোটা পাঁচ করে দিয়েছে।

জেনিফারের যেন চমক ভাঙল-কে বলেছে সে আর ওকালতি করতে পারবে না? ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি? না কি খবরের কাগজ? সে এখনও সম্পূর্ণভাবে একজন আইনজীবী। যতক্ষণ না সরকারীভাবে তার ওকালতি করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ সে পুরোদস্তুর এ্যাটর্নি।

নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণা পেল সে মনের গভীরে। একটি চাকরি করার জন্য অনেক নামী আইন প্রতিষ্ঠান তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সে খুঁজে খুঁজে সেইসব প্রতিষ্ঠানের ফোন নম্বর বের করে যোগাযোগ করল। কিন্তু হায়, তার সে গুড়ে বালি। তাদের মধ্যে অনেকেই অফিসে নেই। সে তার নিজের নম্বর দিয়েছিল, পরে যোগাযোগ করার জন্য কিন্তু কোনো ফোন পায়নি সে। তার বুঝতে দেরী হল না, ফৌজদারী আদালতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি এর জন্য দায়ী। কোলাহল থেমে গেছে, কিন্তু তার রেশ সবাইকে এখনও ছুঁয়ে আছে।

কিন্তু জেনিফার দমবার পাত্রী নয়। হতাশা আর অপমানকে অগ্রাহ্য করে সে তার প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকল। কিন্তু বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। জেনিফার একজন

পেশাদার আইনজীবী হতে চাইছে, ওকালতি করাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এতএব, যতক্ষণ না কেউ তাকে বাধা দেবে, ততক্ষণ সে তার এই চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

ম্যানহাটানের সবকটা ছোটো বড়ো আইন প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেন্টু মারল। রিসেপসনিস্টের কাছে নিজের পরিচয় দিল। পার্সোনেল বিভাগের বড়ো কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাকে হতাশ হতে হয়েছে। যদি বা দু-একজন তার সঙ্গে দেখা করেছে। অবশেষে এমন ব্যবহার করেছে যে, নিছক কৌতূহল মেটানোর জন্যই তারা তার সাথে কথা বলেছে। তাকে বলা হল, শূন্যপদ খালি নেই।

কেটে গেল বিয়াল্লিশ দিন, দেড় মাস। ধীরে ধীরে জেনিফারের ট্যাকে টান পড়তে শুরু করেছে। সে ঠিক করল, আরও সস্তার কোনো ঘরে উঠে যাবে। কিন্তু পেল না। ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ খাওয়া বন্ধ করে পয়সা বাঁচাল। প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য সস্তার ডিনার খেত। কিন্তু ওই নিকৃষ্ট ও জঘন্য রুচির খাবার তার গলা দিয়ে নামত না। স্যালাড খেয়ে খেয়ে সে পেট ভরাত। আর বিয়ার। অবশ্য বিয়ার তার অপছন্দের পানীয়। কিন্তু ওই বিয়ার তার খিদে মেটাতে পুরোপুরি সাহায্য করছে।

জেনিফার নামী প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে আশা ভরসা ছেড়ে দিল। সে ছুটল অনামী প্রতিষ্ঠানগুলিতে। সেখানেও তথৈবচ। চাকরি জুটল না। কিন্তু হার মানবে না সে। সে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। উৎসাহ বহু গুণ বেড়ে গেল। ওকালতি সে করবেই। স্থির করল, নিজেই একটা আইনের অফিস খুলবে। কিন্তু ঘর ভাড়া, বইপত্র, আসবাব, সেক্রেটারী, টেলিফোন, কাগজকলম, সীলমোহর–এসবের খরচ? কোথা থেকে পাবে?

প্রায় দশ হাজার ডলার। নাঃ, এ ভাবনাও তাকে ত্যাগ করতে হল। যদি কারও অফিসে ভাড়া দিয়ে নিজের স্বাধীন ব্যবসা শুরু করতে পারে, তা হলে কিছু একটা হবে।

অতএব খবরের কাগজের পাতা উল্টেপাল্টে দেখে একটা বিজ্ঞাপনঅফিসের জন্য জায়গা ভাড়া দেওয়া হয়।

ঠিকানাটা ছিল ব্রডওয়ে এলাকার। বহু পুরোনো হাড় জিরজিরে একটা বাড়ি। জেনিফার অফিসের নম্বর মিলিয়ে এগারো তলায় এসে হাজির হল। দরজার ওপর দুটো সাইনবোর্ড কেনেস বেইলি-পেশাদার বেসরকারী গোয়েন্দা। তার নীচে রকফেলার কালেকশন এজেন্সি। অনেকগুলো অক্ষর সাইনবোর্ড থেকে উঠে গেছে।

দরজা ঠেলল জেনিফার, ঘরে ঢুকল। জানলা বিহীন, তিনটে ক্ষতবিক্ষত নড়বড়ে টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। পাশাপাশি দুটি টেবিলে দুজন লোক বসে।

মধ্যবয়সী টাকমাথাওয়ালা লোকটি কয়েকটি কাগজে তাকিয়ে আছে, নিবিষ্ট মনে। পরনের পোশাক খুব একটা ধোপদুরস্ত নয়।

আর দ্বিতীয় লোকটির কানে রিসিভার তিরিশের কোটা পার হয়েছে, তামাটে রঙের চুল, নীল দুটি চোখের তারা। ফ্যাকাশে গায়ের চামড়া, তারা ওপর ছোপছোপ দাগ। টাইট জিনসের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরনে। পায়ে মোজা আর ক্যানভাসের জুতো।

মিসেস ভেসার, নিশ্চিন্তে থাকুন। লোকটি ফোনে বলছে, আপনি আমাদের মতো সেরা গোয়েন্দার ওপর কেসটা যখন দিয়েছেন, তখন আস্থা রাখতে পারেন। তদন্ত চলছে, যে কোনো দিন আপনার স্বামীর খবর পেয়ে যাবেন।

কিন্তু জানেন তো, খোঁজাখুজির জন্য কত টাকা খরচ হয়। আমাদের আরো কিছু টাকা লাগবে। নানা, ডাকে নয়। ও সব ভীষণ ঝামেলা। বরং হাতে-হাতে টাকাটা দেওয়া ভালো। আজ একটা কাজে ও পাশেই যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে আমি দেখা করে নেব। ঠিক আছে, এখন রাখছি।

রিসিভার নামাল, চোখ তুলল, সে দেখতে পেল জেনিফারকে, চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়াল। স্মিত হাসি দেখা দিল ঠোঁটে।

আমি কেনেথ বেইলি। বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?

তখন সেই ঘরে জেনিফার যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। সে স্পষ্ট জানাল–আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

এবার বুঝতে পেরেছি, কেনেথের চোখে বিস্ময়। এতক্ষণে টাকমাথা কাগজের ওপর থেকে চোখ সরাল। জেনিফারের দিকে সে দুটি ঘুরে এল।

কেনেথ তাকে দেখিয়ে বলল–অটো ওয়েনজেল, রক ফেলার কালেকশান এজেন্সির মালিক।

–হ্যালো, অটো ওয়েনজেলকে শুভেচ্ছা জানাল জেনিফার। এবার কেনেথ বেইলিকে জিজ্ঞাসা করল–বেসরকারী গোয়েন্দা তাহলে আপনি?

-হ্যাঁ, কিন্তু আপনার ব্যবসা?

আমার? জেনিফারের জবাব, আমার পেশা ওকালতি। আমি একজন উকিল।

কেনেথ বেইলি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মনে হল, তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, জেনিফার একজন উকিল। –আপনি কি সত্যিই এখানে অফিস ভাড়া নিতে এসেছেন?

জেনিফারের দৃষ্টি একবার ঘুরে ফিরল ভ্যাপসা ওই ঘরের চারদিকে। তার কল্পনায় ভেসে উঠল একটি ছবি-দুজন পুরুষের মাঝখানে একটি মহিলা বসে কাজ করছে।

–না, এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। আরও দু-একটা জায়গা দেখি, তারপর না হয়–

প্রত্যেক মাসে নব্বই ডলার ভাড়া।

নব্বই ডলার? তাহলে আর এই ছোট্ট ঘর কেন, গোটা বাড়িটাই কিনে নিতে পারি।

জেনিফার ফিরে আসার জন্য পা বাড়াল।

যাচ্ছেন কোথায়। দাঁড়ান একটু।

জেনিফার থামকে দাঁড়াল। কেনেথ বেইলির দিকে ঘুরে তাকাল।

–একটু কম-সম করে দেবেন। কেনেথ গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, নব্বই দিতে হবে না। ষাট দিলেই হবে। আপনার পসার জমুক। তারপর না হয় ভাড়া বাড়ানোর কথা ভাবা যাবে।

জেনিফার খুব ভালো করে জানে, এর থেকে সস্তা দামে ঘর পাওয়া যাবে না। আবার এই ভ্যাপসা ঘরে মক্কেল পাওয়াও কষ্টজনক। তাছাড়া তার কাছে ষাট ডলারও নেই।

–বেশ, জেনিফার জবাব দিল। আমি রাজী।

-দেখবেন, এখানে আপনার কারবার কেমন রম করে চলবে। কেনেথ বেইলি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। আপনার দপ্তর কবে আনবেন?

দপ্তর এসে গেছে। আপনার সামনে।

কেনেথ বেইলি নিজে হাতে একটা ছোটো সাইন বোর্ডে লিখল–জেনিফার পার্কার এ্যাটর্নি বার ল। সেটা দরজার বাইরে টাঙিয়ে দিল।

সাইন বোর্ডের দিকে জেনিফার অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে। কেমন একটা মিশ্র অনুভূতি তার মনে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে তাকে দুঃসময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হয়েছে। কিন্তু কখনও কল্পনা করতে পারেনি, এক বেসরকারী গোয়েন্দা আর এক বিল কালেকটরের নামের নীচে তার নামের সাইনবোর্ড ঝুলবে। একই ঘরে বসে তাকে মক্কেলের সাথে কথা বলতে হবে। অবশ্য সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদার দিক থেকে সে

ওদের থেকে অনেক উঁচুতে। তবে একটা কথা ভেবে জেনিফার মনে মনে গর্বিত হল– এত দিনে সে এ্যাটর্নির স্বীকৃতি পেয়েছে, চাকরির জন্য আর তাকে দোরে দোরে ঘুরতে হবে না। সে আজ এক স্বাধীন ব্যবসায়ী, স্বাধীন আইনজীবী, ওকালতিই যার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ও পেশা।

স্বাধীন ব্যবসা তো হল, কিন্তু মক্কেল কোথায়? তবে পসার যতদিন না জমে, ততদিন তাকে কষ্ট করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের খরচ থেকে কতগুলোকে বাদ দিতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাই তাকে করতে হবে। অতএব দুপুরের লাঞ্চ গেল বন্ধ হয়ে। টোস্ট আর কফি খেয়ে ব্রেকফাস্ট সারত। সারাদিন আর কিছু খেত না। রাতের ডিনারে কেবল পাউরুটি আর আলুর দম।

নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে জেনিফার তার অফিসে চলে আসত। সারাদিন মক্কেলের প্রতীক্ষায় হাপিত্যেশ করে কেটে যেত। অথচ ওরা? ওরা কত ব্যস্ত। টেলিফোনে মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলে।

জেনিফার ওদের কথা শোনে–কোথায় কার বউ, অথবা স্বামী কিংবা ছেলেমেয়ে বাড়ি থেকে না-বলে পালিয়েছে। তাদের খুঁজে বের করতে হবে।

প্রথমটায় কেনেথ বেইলিকে দেখে জেনিফারের মনে হয়েছিল, লোকটা একটা ধাপ্পাবাজ। মিথ্যে আশা দিয়ে টাকা পকেটে পোরার ধান্দা। কিন্তু তার ধারণা ভুল। –লোকটা চালাক এবং পরিশ্রমী। মক্কেলদের কাজ করে দেয়।

আর অটো ওয়েনজেল? লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না জেনিফার। ঘনঘন টেলিফোন আসে। কথা বলে, আর খসখস করে কাগজে কী সব লেখে। তারপরেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। কোথা থেকে ঘুরে ফিরে ঘন্টা খানেক বাদে অফিসে এসে ঢোকে।

কিছুদিন বাদে জেনিফার জানতে পারল, বিভিন্ন কালেকশন এজেন্সির হয়ে অটো কাজ করে। গাড়ি, বাড়ি, ওয়াশিং মেশিন কিনে যারা কিস্তির টাকা শোধ করতে পারেনি, তাদের কাছ থেকে ওইসব জিনিসগুলি সংগ্রহ করে আনাই ওর কাজ।

–আপনি মক্কেল পাচ্ছেন? বেইলির কৌতূহলী দুটি চোখ।

ব্যবস্থা ঠিকই একটা হবে। জেনিফার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

–হাল ছাড়বেন না যেন। কেনেথ বলল, ভুল সবারই হতে পারে।

কথাটা শুনে জেনিফারের বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। ধূর্ত লোক, মক্কেল যে পাচ্ছে না সে, সেটা টের পেয়ে গেছে। হয়তো তার দুর্নামের কাহিনীও সে জেনেছে।

কেনেথ বেইলি একটা বড়ো রোস্ট বীফ স্যান্ডউইচ প্যাকেট থেকে বের করল। জেনিফার কে সে আন্তরিকতার সুরে বলল–নেবেন একটু? খেয়ে দেখুন।

খাবারটা দেখেই জেনিফার বুঝেছিল, খুব সুস্বাদু। খাওয়ার লোভ হচ্ছে বটে। তাসত্ত্বেও নিজেকে সামলে নিয়ে কঠিন গলায় বলে উঠল, না, ধন্যবাদ। লাঞ্চে কিছু খাওয়ার অভ্যেস আমার নেই।

খাবারের একটা টুকরো কেনেথ গালে দিল। জেনিফার তাকিয়ে আছে সে দিকে। কেনেথ আড়চোখে লক্ষ্য করল। সন্দেহপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল–আপনি কি সত্যি বলছেন?

ধন্যবাদ। জেনিফার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমাকে এখুনি বেরোতে হবে, একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

জেনিফারের ফিরে যাওয়ার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল কেনেথ। সে নিজেকে নিয়ে খুব গর্ববোধ করে মুখ দেখলেই যে কোনো মানুষের স্বভাব চরিত্র বলে দিতে পারে। অথচ? অথচ জেনিফার তাকে এ ব্যাপারে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। মেয়েটা কী ধরনের,, আন্দাজ করতে পারছে না সে। খবরের কাগজ পড়ে আর টেলিভিশন দেখে সে নিশ্চিত হয়েছিল যে মাইকেল মোরেটির বিরুদ্ধে সরকার যে খুনের মামলা রুজু করেছিল, সেটা ভেঙে দেওয়ার জন্য জেনিফারকে কেউ ঘুষ দিয়েছিল। কিন্তু জেনিফারকে দেখে তা তো মনে হয় না। তার ওঠাবসা বা হাবভাবে তার কোনো চিহ্ন নেই। ও আদৌ ঘুষ নিয়েছিল কিনা, সেটাই সন্দেহ। মেয়েদের কেনেথ খুব একটা সুনজরে দেখে না। অসুখী দাম্পত্য জীবন তার। কিন্তু জেনিফার তার চোখে অন্য সাধারণ পাঁচটা মেয়ের মতো নয়, সে স্বতন্ত্র এক নারীসত্তা।

দিন কাটছে, জেনিফারের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটছে। শেষ সম্বল আঠারো ডলার ঘর ভাড়ার টাকা বাকি পড়ে গেছে। আর কয়েকদিন বাদে অফিস ঘরের ভাড়া দিতে হবে। নিউইয়র্কে থাকার ক্ষমতা, এমন কী খেয়ে বেঁচে থাকবে, সে সম্বলও নেই।

কিন্তু এভাবে হেরে গেলে চলবে না, বাঁচতেই হবে তাকে। আবার সে নামী-অনামী আইন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করল–একটা চাকরি যদি কোনো রকমে জোটাতে পারে, এই আশায়? সে কখনও অফিস ঘরে বসে এসব ফোন করত না। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কেউ তাকে চাকরি দিতে চাইছে না। কেলসোতেই তাকে ফিরে যেতে হবে। যদি কোনো আইনবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ পায়। নয়তো বাবার কোনো উকিল বন্ধুর কাছে যাবে, তার সেক্রেটারী হয়ে কাজ করবে। অবশ্য ব্যাপারটা তার কাছে মোটেও সম্মানজনক নয়, তবুও এছাড়া কোনো উপায় নেই।

জেনিফার পার্কারকে ভাগ্যের কাছে মাথা নোয়াতে হবে। নত মস্তকে নিউইয়র্ক ছাড়তে হবে। বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু কীভাবে? খরচের ব্যাপার রয়েছে। সে নিউইয়র্ক পোস্ট পত্রিকা ঘেঁটে একটা বিজ্ঞাপন বের করল। সিয়াটলে ফিরে যাবার জন্য সঙ্গী চাই। যে ভাড়া ভাগাভাগি করতে চায়।

জেনিফার ফোন করল। কিন্তু উত্তর পেল না। সে ঠিক করল, পরদিন সকালবেলা আবার ওই নম্বরে ফোন করবে।

পরদিন সকালে জেনিফার তার অফিসে এল, শেষবারের মতো ভেতরে কেনেথ বেইলি বসে আছে। টেলিফোনে কথা বলছে কার সঙ্গে, অটো ওয়েনজেল নেই।

কেনেথের পরনে নীলরঙের জিনসের টাউজার্স আর ভি কলারের একটা কাশ্মিরী সোয়েটার।

আপনার স্ত্রীর খোঁজ পাওয়া গেছে। তবে একটা কথা কী জানেন, কেনেথ ফোনে মক্কেলকে বলছে, উনি জানিয়েছে, আর বাড়িমুখো হবে না। তবে আপনাকে আমি ঠিকানা বলে দেব। আপনি যাবেন, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন।

একটা হোটেলের নাম আর ঠিকানা বলল, যেটা শহরের মাঝখানে অবস্থিত। ফোন নামিয়ে রাখল।

তারপর জেনিফারের দিকে চোখ তুলে বলল–আজ দেরী দেখছি, কারণ কী?

মি. বেইলি, জেনিফারে ঢোক গিলে বলল, আমাকে বোধহয় তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন, আমি সম্ভব মতো তাড়াতাড়ি আপনার ভাড়াটা পাঠিয়ে দেব।

কেনেথ বেইলি তাকিয়ে আছে জেনিফারের দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে খুব ভালোভাবে জরিপ করল।

জেনিফার তার এই আচরণে কেমন অস্বস্তিবোধ করল–মিস্টার বেইলি, আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না যে।

–আপনি সত্যিই কি ওয়াশিংটনে চলে যাবেন?

জেনিফার নীরবে ঘাড় নাড়ল।

–বেশ। কেনেথ বেইলি বলতে থাকে, যাবার আগে, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কাজ করে দেবেন? আমার এক উকিল বন্ধু একটা কাজ করে দেওয়ার জন্য কয়েকদিন ধরে আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি কত ব্যস্ত। সময় পাই না। কয়েকজন সাক্ষীর নামে শপিনা পাঠাতে হবে। প্রত্যেকটা শপিনার জন্য সাড়ে বারো ডলার দিতে রাজী আছে সে, সেইসঙ্গে গাড়ি ভাড়া। বলুন, কাজটা আপনি আমার হয়ে করে দেবেন?

এক ঘণ্টা বাদে জেনিফার পার্কার গিয়ে হাজির হল পিবডি অ্যাণ্ড পিবডির সুসজ্জিত অফিসে। ঠিক এরকম একটা অফিসে কাজ করার স্বপ্ন বহু দিন ধরে দেখে আসছিল সে। অফিসের পেছন দিকে ছোটো একটা কামরায় জেনিফারকে নিয়ে আসা হল, সেখানে যিনি বসেছিলেন, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী। জেনিফার দেখল, কাজকর্ম সামলাতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন তিনি।

কতগুলো শপিনা সেক্রেটারী ওর হাতে তুলে দিল। বলল–ধরুন, এগুলো ঠিকানা মিলিয়ে দিয়ে দেবেন। গাড়িভাড়া আপনি এখান থেকে পাবেন। কতটা পথ গেলেন নোট করে রাখবেন। আপনার গাড়ি আছে?

না, আমার–

কোনো অসুবিধা নেই। সাবওয়ে ধরুন। গাড়িভাড়া যা খরচ হবে আমরা দিয়ে দেব।

–ঠিক আছে।

ব্রংক্স, ব্রুকলিন আর কুইন্স অঞ্চলে শপিনা বিলি করতে করতে সারাদিন কেটে গেল জেনিফার। সন্ধ্যা আটটা বেজে গেল। হাতে পেল পঞ্চাশ ডলার আজকের রোজগার। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল। ঠান্ডায় হাত-পা যেন বরফ হয়ে গেছে। শরীর ক্লান্ত। তবু মনকে সে সান্ত্বনা দিল, কিছু টাকা রোজগার করতে পেরেছে তো। নিউইয়র্কে এই তার প্রথম উপার্জন। আরও কয়েকটা দিন তাকে শপিনা বিলি করতে যেতে হবে।

কাজটা মোটেও সোজা নয়। শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ানো। কিছুটা লাঞ্ছনা ও অপমানও ভোগ করতে হয়। কেউ কেউ তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কেউ অশ্লীল ইঙ্গিত করেছে, গালিগালাজ করতেও ছাড়েনি। শাপ-শাপান্তের ঢেউ ছুটিয়ে দিয়েছে। হুমকি আর ভয় দেখানোও বাদ যায়নি। তবে এই কাজ করতে এসে এক দারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে। দুটি বাড়ির দুই পুরুষ তাকে ইনিয়ে বিনিয়ে অশ্লীল ভাষায় বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। আবার তাকে শপিনা দিতে যেতে হবে। আবার তাকে ওই বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে। স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ মিইয়ে গেল, হতাশা চাগাড় দিয়ে উঠল। তবে এইটুকুই সান্ত্বনা, নিউইয়র্কে যতদিন থাকবে, ততদিন আশার একটা ক্ষীণ আলো সে দেখতে পাবে।

গরম জলের টবে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। উষ্ণ জলধারার পরশ। ক্লান্ত শরীরে যেন আরামের স্পর্শ। স্নান করতে করতে সে ঠিক করল, আজ একটা ভালো রেস্তোরাঁয়

যাবে। ডিনার খাবে। সুন্দর পরিষ্কার চাদর দিয়ে টেবিলগুলো ঢাকা থাকবে। হাতের সামনে থাকবে সাদা ধবধবে ন্যাপকিন। মৃদু মৃদু বাজনা বাজবে। সে সাদা ওয়াইন খুব আমেজ করে খাবে, আর

হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজ। জেনিফারের চিন্তারা তখন শতছিন্ন হয়ে গেছে। সে ঘাবড়ে গেল। গত দুমাসের মধ্যে একবারের জন্য তো কলিংবেলটা বেজে ওঠেনি। নিশ্চয়ই খিটকেলে ল্যান্ডলেডি এসেছে, বকেয়া ভাড়া চাই।

জেনিফারের ওঠার যেন তাড়া নেই। আসলে গরম জলে ডুবে থাকতে তার আরাম লাগছিল। সাড়াশব্দ না পেয়ে ফিরে যাবে। সে মরা মাছের মতো পড়ে রইল।

খানিকবাদে আবার কলিংবেল সশব্দে বেজে উঠল। ইচ্ছে করছে না, তবু উঠতে হল। কোনোরকমে স্নানের টব থেকে উঠে গায়ে টেরি ক্লথের একটা চাদর চাপিয়ে সে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

কাকে চান?

মিস জেনিফার পার্কার আছেন? দরজার ওপার থেকে একটি পুরুষের গলা শোনা গেল।

-হ্যাঁ, আছেন।

–আমার নাম অ্যাডাম ওয়ার্নার। আমি একজন উকিল।

উকিল? তাকে খুঁজছে? ব্যাপার কী? সিকিউরিটি চেন লাগিয়ে দরজার পাল্লা একটু ফাঁক করল জেনিফার।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের এক যুবক। লম্বা, চওড়া কাঁধ, খুব ফর্সা। চোখে চশমা। তার নীলচে ধূসর দুটি চোখের তারায় কৌতূহলের ছোঁয়া, জেনিফার স্পষ্ট দেখতে পেল। পরনে তার দামী পোশাক।

–আমি কি ভেতরে আসতে পারি? বাইরে থেকে অ্যাডাম ওয়ার্নার জানতে চাইল।

না, গুণ্ডা-বদমাস বলে মনে হচ্ছে না। তাহলে এত দামী স্যুট, ইটালিয়ান গুচ্চি কোম্পানীর দামী জুতো আর নীল টাই থাকত না। আর হাতে নখগুলোও হত নোংরা আর কদর্য।

–এক মিনিট। একটু পিছিয়ে এল জেনিফার। চেন আলগা করল। দরজা সম্পূর্ণ খুলে গেল।

অ্যাডাম ওয়ার্নার ঘরের ভেতরে ঢুকল। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। জেনিফারের বুঝতে বাকি রইল না, এই ভ্যাপসা ঘরে ঢুকে অ্যাডাম মোটেও স্বচ্ছন্দ বোধ করছে না। হাঁপিয়ে উঠছে যেন। সুখী ও বিলাসবহুল জীবন যাত্রায় উনি যে অভ্যস্ত তা তার চেহারা ও পোশাক-আশাকে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

-বলুন মি. ওয়ার্নার–জেনিফার বলল, আপনার প্রয়োজন কী?

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা তীব্র উত্তেজনা অনুভব করল সে। হয়তো কোনো আইন প্রতিষ্ঠান থেকে উনি এসেছেন, ইতিমধ্যে কম জায়গায় তো সে ঘোরাঘুরি করেনি। নিশ্চয়ই বলতে এসেছে, আমাদের প্রতিষ্ঠান আপনাকে চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। ইস, নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দুঃখবোধ করল, আগে থেকে জানলে একটা সুন্দর নীল রঙের তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে নিতাম। চুলটা ভালো করে আঁচড়ে নিতাম। আর এখন চুলের যা হাল, ভেজা জবজব করছে।

মিস পার্কার। মিঃ ওয়ার্নার বলতে থাকল–নিউইয়র্ক বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমি আসছি। শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির আমি একজন মেম্বার। ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা এবং জজ লরেন্স ওয়াল্ডম্যান চান, বার থেকে আপনার নাম কেটে দিতে। এমনকী ওকালতি পেশা আপনার চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। এই মর্মে অ্যাপিলেট ডিভিশনের কাছে তারা একটি আবেদন পেশ করেছেন। আপনাকে এই খবরটাই আমি জানাতে এসেছি।

.

ওয়াল স্ট্রিটের তিরিশ নম্বর বাড়ি। নিউইয়র্কের সেরা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি। মোট একশো পঁচিশজন উকিল এখানে বিভিন্ন পদে চাকরি করেন। নিডহ্যাম, ফিঞ্চ, পিয়ার্স অ্যান্ড ওয়ার্নারের মতো আরও অনেক অফিস আছে–বাড়ির ওপরতলাটা জুড়ে।

প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দুই পার্টনার স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম এবং অ্যাডাম ওয়ার্নার। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সকালবেলা তারা দুজনে বসে চা খাচ্ছিলেন।

স্টুয়ার্ট নিডহ্যামের বয়স ষাট ছুঁই-ছুঁই। উচ্চাভিলাষী, দেশের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতা আর উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে। নিজের বুদ্ধি দিয়ে কখনও সখনও তাদের চালনা করার চেষ্টা করেন।

তিরিশের যুবক অ্যাডাম ওয়ার্নার সম্পর্কে নিডহ্যামের ভাগনি-জামাই। অ্যাডাম ওয়ার্নারের বাবা ছিলেন একজন সিনেটর। খুব মেধাবী। কয়েক বছরের মধ্যে আইনি পেশায় খুব নাম করে নিয়েছে। হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে সে গ্র্যাজুয়েট হয়। অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাকরির অফার এসেছিল। কিন্তু সে কোনো ফার্মেই যোগ দেয়নি। তারপর একসময় নিডহ্যাম, ফিঞ্চ অ্যান্ড পিয়ার্স-এ চাকরি নিয়েছিল। সাত বছর ধরে সে খুব মনোযোগ সহকারে কাজ করেছিল। নিজের পারদর্শিতা দেখিয়ে সে আজ এই কোম্পানীর একজন পার্টনার হতে পেরেছে। অ্যাডাম সুপুরুষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। যে কোনো মেয়ে তার চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে কাছে পেতে চায়। এই কারণেই অ্যাডাম কোনো মেয়ে মক্কেলের কাজ নেয় না। ওরা ছলেবলে কৌশলে পুরুষকে তার ফাঁদে পড়তে বাধ্য করে। সে বিবাহিত, স্ত্রী মেরী বেথ। চোদ্দো বছরের দাম্পত্য জীবন। জীবনে স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সঙ্গলাভের প্রত্যাশা করেনি সে।

–অ্যাডাম, আর একটু চা? নিডহ্যাম জানতে চাইল।

না, ধন্যবাদ।

আসলে চা পান করতে অ্যাডামের ভালো লাগে না। এটা একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার। কিন্তু একথা সে মামাশ্বশুর ও পার্টনার স্টুয়ার্ট নিডহ্যামের কাছে ফাস করে না, যদি তিনি চটে যান। তাই গত আট বছর ধরে নিডহ্যামের মন রেখে সে চা পান করে চলেছে।

কাল রাতে কয়েকজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, নিডহ্যাম বলতে থাকল, ওঁরা চাইছে তোমাকে এবার যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর হবার জন্য ভোটে দাঁড় করাতে।

অ্যাডাম জানে, ওঁরা বলতে কাদের কথা বলছেন নিডহ্যাম। ওই দুই পুরোনো বন্ধু হল রাজনৈতিক আঙিনার দুই বড়ো খেলোয়াড়। অ্যাডাম মনে মনে খুব আত্মসুখ লাভ করল। তবে এটাও বুঝল সে, কথাটা নেহাত নিছক নয়, নাহলে এখন উনি এই প্রসঙ্গ তুলতেন না।

–তবে রাজী হবে কিনা, সেটাই প্রথম কথা। রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখলে জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটবে জেনে রেখো।

অ্যাডাম জানে, ভোটে জিতলে প্রচুর ক্ষমতা তার হাতে আসবে, যা উপভোগ করে এক ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করবে। তবে তাকে এই চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে যেতে হবে। সে এক নতুন জীবন। অবশ্য স্ত্রী বেথের কাছে এই জীবনযাত্রা খুব পছন্দ হবে। তবে এখনও পর্যন্ত নিজের মন থেকে সায় পাচ্ছে না সে।

–আমি রাজী স্টুয়ার্ট, অ্যাডাম বলে উঠল।

-বাঃ, এই তো কথার মতো কথা। নিডহ্যাম কাপে আবার চা ঢালতে ঢালতে বলে উঠলেন, আমার বন্ধুরা যে কী খুশী হবে। আর একটি কথা বলার জন্য তিনি মনে মনে তৈরী হয়ে নিলেন।

খানিক বাদে বললেন–অ্যাডাম, বার অ্যাসোসিয়েশনের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি তোমার ওপর একটি দায়িত্ব ন্যাস্ত করতে চাইছে, খুব বেশী সময় লাগবে না। এক বা দুঘন্টা লাগতে পারে।

কী দায়িত্ব?

মাইকেল মোরেটির মামলার কথা বলছি। আমার ধারণা, ওর দলের কেউ ববি ডি সিলভার সেই মেয়ে সহকারীকে ঘুষ দিয়েছিল।

খবরের কাগজে খবরটা পড়েছি। অ্যাডাম বলল, সেই হলদে ক্যানারি পাখিটা তো?

হ্যাঁ। জজ ওয়াল্ডম্যান আর ববি ডি সিলভা ওই মেয়েটাকে আর ওর পেশাতে রাখতে চায় না। ওরা চাইছে বার তালিকা থেকে ওর নাম চিরদিনের জন্য মুছে দিতে। আমিও ওদের সাথে এক মত। আমাদের মহান আইন পেশার মুখে চুনকালি লেপে দিল।

–এখানে আমার কাজ কী?

এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে হবে। বেশী দেরী করা চলবে না। মেয়েটা কোন অন্যায় ও রীতি বহির্ভূত কাজ করেছে কিনা খতিয়ে দেখবে। ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিতে

হবে। অতএব সেইভাবেই রিপোর্ট তৈরী করবে। ওর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার আবেদন জানাবে। তারপর ওরা ওকে শোকজ নোটিশ ধরিয়ে দেবে। এবং অন্যান্য সব কাজ করবে। তোমার কাজ এই পর্যন্ত। এটা তেমন বিশেষ কোনো কাজ নয়।

ব্যাপারটা অ্যাডামের কাছে হেঁয়ালির মতো ঠেকল–এসব ব্যাপারে আমাকে ডাকছেন কেন স্টুয়ার্ট। অনেক উকিল এখানে আছেন, যাঁরা স্বচ্ছন্দে আপনার দেওয়া দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

–কথাটা ঠিক। কিন্তু আমাদের মাননীয় জজ সাহেব চান, এ কেসটা তোমাকেই দেওয়া হোক। উনি চান শান্তিপূর্ণভাবে ব্যাপারটার ইতি ঘটাতে। তাছাড়া আমরা জানি, ববি ডি সিলভা দয়া-মায়াকে একেবারে প্রশ্রয় দেন না। উনি মেয়েটার সর্বনাশ না দেখে থামবেন না।

অ্যাডাম ওয়ার্নার নীরব। নিজের কাজের তালিকা নিয়ে মনে মনে ভাবছে সে।

অ্যাডাম, তুমি কি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না? স্টুয়ার্ট বলতে থাকে। ভবিষ্যতে আমরা ওনার কাছ থেকে প্রয়োজনে সাহায্য আশা করতে পারি?

বুঝতে পেরেছি। অ্যাডাম ওয়ার্নার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এখন আসছি।

তুমি আর চা খাবে না সত্যি?

না, ধন্যবাদ।

অ্যাডাম ওয়ার্নার এসে ঢুকল তার ঘরে। লুসিন্ডাকে টেলিফোনে ডেকে পাঠাল। লুসিন্ডা তারা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম এক সহযোগী, কৃষ্ণাঙ্গী অল্পবয়সী যুবতী।

মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল। অ্যাডাম বলল–সিন্ডি, জেনিফার পার্কার নামে ওই এ্যাটর্নির সমস্ত তথ্য আমি চাই। তুমি সেগুলি জোগাড় করো।

–সেই হলদে ক্যানারি পাখি? লুসিন্ডা সামান্য হাসল। এখুনি এনে দিচ্ছি। ওর সম্পর্কে কারও কিছু আর জানতে বাকি নেই।

.

সেদিন বিকেলে অ্যাডাম ওয়ার্নার মন দিয়ে মাইকেল মোরেটির মামলার বিবরণ পড়ছিল। রবার্ট ডি সিলভা নিজেই উদ্যোগ নিয়ে রিপোর্টটি তার কাছে লোক মারফত পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাত তখন বারোটা। রিপোর্ট পড়া শেষ হয়নি। স্ত্রী বেথকে নিয়ে একটা ডিনার পার্টিতে যাওয়ার কথা ছিল।

সে স্ত্রীকে ডেকে বলল–আমি আজ পার্টিতে যেতে পারছি না, তুমি একাই চলে যাও।

বেথ চলে গেল। একটা স্যান্ডউইচ খেল অ্যাডাম। তারপর আবার রিপোর্টের পাতায় । ডুবে গেল।সত্যি মাইকেল মোরেটির কপালের জোর আছে। জেনিফার পার্কার এর মধ্যে যদি নিয়তির মতো ঢুকে না পড়ত তা হলে কেউ ওকে জেলের বাইরে আনতে পারত না। রবার্ট ডি সিলভা নিখুঁতভাবে কেসটা সাজিয়েছেন, তার দিক থেকে কোনো খামতি নেই।

অ্যাডাম এবার পড়তে শুরু করল রবার্ট ডি সিলভা জেনিফারকে কী কী জেরা করেছিলেন, তার পূর্ণ বিবরণ–

ডি সিলভা–আপনি কি কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছেন?

পার্কার-হ্যাঁ, স্যার।

ডি সিলভা–আপনি তো ল স্কুল থেকে ডিগ্রি কোর্স করেছন?

পার্কার হ্যাঁ, স্যার।

ডি সিলভা–তারপরে আপনি একটা অজানা অচেনা লোকের কাছ থেকে একটা খাম পেলেন, লোকটি খুনের মামলার রাজসাক্ষীকে সেটা পৌঁছে দিতে বলল, আর আপনি সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করলেন। কোনো চিন্তা ভাবনা না করে, নিজের মতে। এটা কি আপনার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয়?

পার্কার–ঘটনাটা ঠিক এইভাবে ঘটেনি।

ডি সিলভা–আপনি নিজেই এইভাবে ঘটনাটার বিবৃতি দিয়েছেন।

পার্কার–আমি বলতে চেয়েছিলাম, লোকটা আমার অচেনা নয়, উনি হয়তো আপনার অফিসেই কাজ করেন।

ডি সিলভা–এরকম মনে হওয়ার কারণ কী?

পার্কার–আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, ওই লোকটা আপনার সাথে কথা বলছিল, আমি দেখেছি। তারপর সে আমার নাম ধরে ডাকতে থাকে। আমার কাছে এগিয়ে এসে খামটা তুলে দিল আর বলল, আপনার নির্দেশ আমি যেন ওটা সাক্ষীর কাছে পৌঁছে দিই। কিছু বোঝার আগেই ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে ।

ডি সিলভা–আপনি যেমন বলছেন, ঠিক তত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটেছে বলে আমার মনে হয় না। আমার ধারণা, এর জন্য আগে থেকে ছক কষা হয়েছে এবং যথেষ্ট সময় খরচ করা হয়েছে। আপনাকে ঘুষ দিয়ে যে লোক ওই জিনিসটা পাচার করেছে, তাকে খুঁজে বের করার জন্য প্রচুর সময় দেওয়া হয়েছে।

পার্কার–না, স্যার। আপনি আমাকে মিথ্যে সন্দেহ করছেন। আমি

ডি সিলভা–তাই নাকি? রাজসাক্ষীর হাতে ওটা পাচার করার ব্যাপারটা আপনি তো আগে থেকে জানতেন। তাই তো?

পার্কার-খামের ভেতরে কী আছে, তা আমার জানা ছিল না।

ডি সিলভা–তাহলে আপনি স্বীকার করছেন, আপনি ঘুরে খেয়েছেন?

পার্কার–না, আমি কোনো টাকা নিইনি। আপনি আমাকে কথার প্যাঁচে ফেলতে চাইছেন।

ডি সিলভা–আপনি তা হলে পরোপকারী?

পার্কার না। আমার ধারণা ছিল, আমি কেবল আপনার নির্দেশ পালন করছি মাত্র।

ডি সিলভা–ওই লোকটা আপনাকে নাম ধরে ডেকেছিল। একটু আগেই বললেন।

পার্কার–হ্যাঁ।

ডি সিলভা–কী করে আপনার নাম জানতে পারল?

পার্কার–আমার জানা নেই।

ডি সিলভা মিথ্যে কথা ছেড়ে আসল কথায় আসুন। যেমন প্রশ্ন করছি, তার সঠিক জবাব দিন। ব্যাপারটা আপনি আগে থেকেই জানতেন?

পার্কার–না। আমি জানতাম না।

ডি সিলভা–শুনেছি, আপনি মাইকেল মোরেটির প্রেমিকা। কত দিন ধরে চলছে?

পার্কার–মিস্টার সিলভা, আপনি আপনার অধিকার ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ ঘণ্টা ধরে আমি অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। আর সম্ভব নয়। আমি ক্লান্ত আমার পক্ষে আর কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কি এখন উঠতে পারি?

ডি সিলভা–তাহলে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব। মিস পার্কার, আপনি জানেন না, কী সাঙ্ঘাতিক বিপদের মধ্যে আপনি পড়েছেন। এই বিপদ থেকে আপনি

রক্ষা পেতে পারেন, যদি সাফ সাফ সঠিক জবাব দেন। বাজে কথা ছেড়ে আসল কথাটা বলুন।

পার্কার–আমি বারবার বলছি এ পর্যন্ত যা কিছু বলেছি সব সত্যি। মিথ্যে কিছু বলিনি। কোনো কিছু গোপন করিনি।

ডি সিলভা-কেবল ওই লোকটার নাম গোপন রেখেছেন, যে প্যাকেটটা আপনাকে দিয়েছিল। এবার সেই লোকটার নাম বলুন আর কাজটা করে দেওয়ার জন্য কত টাকা পেয়েছেন, ঠিক ঠিক বলুন।

তিরিশটি পাতার রিপোর্ট। খুব মন দিয়ে পড়া শেষ করল অ্যাডাম ওয়ার্নার। অপমানের চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন মিস্টার ডি সিলভা। এ প্রায় জেনিফারের গায়ের চামড়া তুলে। নেওয়ারই নামান্তর। কিন্তু রিপোর্টের প্রথম থেকে শেষ অব্দি পড়ে অ্যাডাম বুঝতে পেরেছিল, কোথাও জেনিফারের কথার হেরফের ঘটেনি। বারবার একই জবাব দিয়েছে।

ফাইল বন্ধ করে অ্যাডাম উঠে দাঁড়াল। দুপুর দুটো। আজ আর এ ব্যাপারে কিছু নয়।

.

কিন্তু অ্যাডাম ওয়ার্নার একটা ব্যাপারে পরিষ্কার হল যে, জেনিফার পার্কারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাকে অভিযুক্ত করা তার পক্ষে মোটেও সহজ হবে না। জেনিফারের অতীত সম্পর্কে সে খুব ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়েছে। সে কোনো দিনই অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এমন কী মাইকেল মোরেটির সঙ্গে কস্মিনকালেও তার

ভাব-ভালোবাসা গড়ে ওঠেনি। যদি-যদি মাইকেল মোরেটির সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক থাকত, তাহলে জেনিফার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তিটা আরও জোরালো করত। কিন্তু তেমনটি হয়নি। অতএব অ্যাডাম ওয়ার্নার ধরে নিল যে, জেনিফার পার্কারের বক্তব্যের মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই, যা কিছু বলেছে সব সত্যি।

বেলা বারোটা। টেলিফোন এল।

কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে? ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা জানতে চাইলেন।

-খুব ভালো।

অ্যাডাম, জেনিফার পার্কারের রিপোর্টটা পড়েছো তুমি?

–হ্যাঁ।

–ও মেয়ের বারোটা বাজিয়েই আমি ছাড়ব। ওকালতি করা ঘুচিয়ে দেব।

রবার্টের কণ্ঠে ঘৃণা ও আক্রোশ। টেলিফোনের এপ্রান্তে বসেও অ্যাডাম তা স্পষ্ট বুঝতে পারল। রবার্টের নৃশংস মানসিকতা অ্যাডাম ওয়ার্নারকে বিচলিত করল।

রবার্ট, আপনি উত্তেজিত হবেন না। অ্যাডাম তাকে আশ্বস্ত করে বললও এখনও পর্যন্ত বারের একজন সদস্য। ওর নাম কাটা যায়নি।

–জানি, বেশ, তুমি যা বোঝো করো। তোমাকেই দায়িত্ব দিলাম। রবার্ট ডি সিলভার হাসি শোনা গেল। এবার প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, শুনলাম, তুমি নাকি ওয়াশিংটনে যাচ্ছো? তুমি আমার সমর্থন সর্বদা পাবে।

ডি সিলভার কথা শুনে অ্যাডাম মোটেও অবাক হল না। এটাই তো স্বাভাবিক। ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির কাছে কোনো খবর চাপা থাকে না। তিনি জানেন স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম তাকে কায়দা করে রাজনীতির মধ্যে ঢোকাতে চাইছেন। রবার্ট এখন ঝোঁপ বুঝে কোপ মারলেন।

ধন্যবাদ রবার্ট। অ্যাডাম বিনয়ী হয়ে বলল, আপনি আমাকে সমর্থন করবেন, এ তো আমার সৌভাগ্য।

-শুনে খুশী হলাম। আর হ্যাঁ, ওই কেসটা তুমি ঠিক মতো দেখো। তোমার ওপর আমি ভরসা করে আছি।

জেনিফার পার্কারের ব্যাপারে মামাশ্বশুর স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম আগেই অ্যাডামকে শুনিয়ে রেখেছিল, রবার্ট সেটাকে এবার জোরদার করার চেষ্টা করছেন। অ্যাডাম যেন দাবার বোড়ে। সুবিধা মতো ব্যবহৃত হবে। মনে পড়ে গেল রবার্ট ডি সিলভার কথাগুলি– মেয়েটার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব। দেখি ওকালতি করে কী করে?

সওয়াল জবাবের বিবরণ পড়ে অ্যাডাম একটা সিদ্ধান্তে এল যে, জেনিফার পার্কারকে দোষী সাব্যস্ত করার কোনো জোরালো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এমন কী প্রমাণ করতে হবে যে, জেনিফার অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। এটা না করা পর্যন্ত ডি সিলভার

ক্ষমতা নেই ওর এক ফোঁটা ক্ষতি করতে পারেন। আসলে রবার্ট ডি সিলভা জেনিফারের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছেন অ্যাডামকে শিখণ্ডী করে।

মামাশ্বশুর স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম, জজ লরেন্স ওয়াল্ডম্যান, এবং ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা যা চাইছেন, তা করা অ্যাডামের পক্ষে যদিও কঠিন কিছু নয়, কিন্তু বিবেকের শাসন তো তাকে শুনতেই হবে। বিবেক সায় দিচ্ছে না। জেনিফার পার্কারের ফাইলটা তুলে নিল অ্যাডাম। কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাগজে লিখে নিল। টেলিফোনে নম্বর ডায়াল করল।

অ্যাডাম ওয়ার্নার বার অ্যাসোসিয়েশনের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির একজন সদস্য, প্রচুর দায়িত্ব সম্পন্ন কাজ। তার থেকেও বড় কথা, এ দায়িত্ব পালন করতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রচুর পরিশ্রম করেছে সে। বছরের পর বছর তীর্থের কাকের মতো প্রতীক্ষায় থেকেছে। বারের পরীক্ষা দিয়েছে। সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবেই আজ সে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছতে পেরেছে। সে কি পারবে জেনিফার পার্কারের বিরুদ্ধে যেতে? কয়েক জন প্রভাবশালী লোকের কথায় একজন এ্যাটর্নিকে বার থেকে বিতাড়িত করা। জেনিফার তো তারই মতো একজন উকিল। এর জন্য চাই যথেষ্ট ও উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ।

পরদিন সকাল বেলা অ্যাডাম প্লেনে চাপল। ওয়াশিংটনের সিয়াটলে এসে হাজির হল। যে স্কুলে জেনিফার আইন বিষয় পড়াশুনা করেছে সেখানে গেল। অধ্যাপকদের কাছে। জেনিফার পার্কার সম্পর্কে খোঁজখবর নিল। সহপাঠীদের সঙ্গেও কথা বলল। এমন কী যে আইন প্রতিষ্ঠানে সে হাতে কলমে শিক্ষানবিশী হয়ে কাজ করেছিল সেখানেও অ্যাডাম গেল।

এই সময় মামাশ্বশুর স্টুয়ার্ট নিডহ্যামের ফোন পেল অ্যাডাম।

–অ্যাডাম, তুমি ওখানে পড়ে আছ কেন? তোমার ওপর যে মস্ত বড়ো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা তো তাড়াতাড়ি মেটানো দরকার।

-হ্যাঁ, ওই ব্যাপারে কতগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে। অ্যাডাম বলল, আমি আর কয়েকটা দিনের মধ্যেই ফিরে আসছি, স্টুয়ার্ট।

-বেশ। অল্পক্ষণের নীরবতা, আবার শোনা গেল নিডহ্যামের গলা, মনে রেখো, মেয়েটার পেছনে বেশী সময় নষ্ট করা যাবে না।

.

জেনিফার পার্কারকে অ্যাডাম কখনও চোখে দেখেনি। অথচ মেয়েটার সম্পর্কে একটা ছবি ইতিমধ্যে সে গড়ে ফেলেছে। ওই ছবির মধ্যে জেনিফারের ল্যান্ড লেডি, অধ্যাপক, সহপাঠী এবং যে আইন প্রতিষ্ঠানে সে হাতে কলমে কাজ শিখেছে–তাদের সংলাপগুলো স্থান করে নিয়েছে। রবার্ট ডি সিলভার কাছ থেকে শোনা কথার সাথে এই ছবি বা সংলাপের কোনো মিল নেই।

.

অ্যাডাম ওয়ার্নার এই মুহূর্তে জেনিফার পার্কারের সামনে দাঁড়িয়ে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল। গায়ে একটা বড়ো পুরোনো তোয়ালে জড়ানো। মেকাপ বিহীন মুখ, কটা লম্বা চুল ভিজে সপসপে, তবুও ওই মুখে যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে।

মিস পার্কার, অ্যাডাম বলতে থাকল, মাইকেল মোরেটির মামলার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। আপনার সম্পর্কে কিছু জানার আছে আমার। সেই জন্যই আমার এখানে আসা।

-ও, তাই বলুন। জেনিফার তখন মনে মনে ভীষণ রেগে গেছে। রবার্ট ডি সিলভা এখনও তার পেছনে লেগে আছেন, তার ধ্বংস না দেখে তিনি ছাড়বেন না বুঝি।

নতুন করে কিছু বলার নেই আমার। জেনিফারের কণ্ঠস্বর কাঁপছে–আপনি আপনার রিপোর্টে যা খুশী বসিয়ে নেবেন। স্বীকার করছি, বোকামি করে ফেলেছি আমি, যার বিরুদ্ধে এদেশে আইনি কোনো ব্যবস্থা নেই। ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি ধরে নিয়েছে, আমি ঘুষ খেয়েছি। রাগে জেনিফার দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল।

...আপনার কী ধারণা, আমি মাইকেল মোরেটির থেকে টাকা পেয়েছি। দেখছেন তো আমার ঘর-দোরের হাল। তাহলে ছোট্ট একটা ঘুপচি ঘরে কেউ-রাগে ও উত্তেজনায় জেনিফার তখন ঠিক মতো কথা বলতে পারছে না। আমাকে একা থাকতে দিন। দয়া করে এখান থেকে চলে যান, যা ইচ্ছে আমার বিরুদ্ধে লিখুন।

ভেতর থেকে একটা কান্না উঠে আসছে। জেনিফার নিজেকে আর সংযত করতে পারল না। ছুটে সেখান থেকে চলে এল। বাথরুমে ঢুকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সিঙ্কের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ দিয়ে তখন নামছে লবণাক্ত জলের ধারা। আর একবার বোকামির পরিচয় দিল জেনিফার-সে বুঝতে পেরেছে। ওই ভদ্রলোককে ওভাবে সোজাসুজি আক্রমণ করা তার উচিত হয়নি। ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললে হয়তো কিছু একটা হত। পরক্ষণেই জেনিফার ভাবল, সবই অলীক কল্পনা তার। লাভ কিছু হত না। এসব তদন্ত ভড়ং মাত্র।

জেনিফার জানে, এরপর কী হবে? এরপর সে উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ পাবে। তিনজন এ্যাটর্নির একটি কমিশন বসবে। তারাই পরিচালন কর্তৃপক্ষের হাতে জেনিফারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ পেশ করবেন। কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে? তা তো আগে থেকেই তৈরীবার থেকে বহিষ্কার। নিউইয়র্কের কোথাও সে ওকালতি করতে পারবে না।

অবশ্য এই সিদ্ধান্ত তার একটা লাভ করে দিয়েছে। গিনেস বুক অব রেকর্ডসে তার নাম ছাপা হবে। বিশ্বের সবাই জানবেন সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে কে আইন ব্যবসাকে পেশা করেছিলেন? উত্তর : জেনিফার পার্কার।

জেনিফার গরম জলের কল খুলে দিল, উষ্ণ গরম জলে দেহটা ডুবিয়ে দিল। চোখ বুজে পড়ে রইল। গরম জলের স্পর্শে তার সমস্ত উত্তেজনা কেটে গেল। তন্দ্রা মতো এসেছিল তার। হঠাৎ ঠান্ডা জলের স্পর্শে নিদ টুটল। কতক্ষণ এভাবে পড়ে আছে, তা জানে না জেনিফার। বাথটব থেকে অনিচ্ছাকৃত অবসন্ন দেহটাকে টেনে তুলল। শুকনো তোয়ালে দিয়ে জল মুছে ফেলল। না, তার এখন আর খিদে নেই। অ্যাডাম ওয়ার্নারের বক্তব্য শুনে তার সব খিদে উঠে গেছে।

চুল আঁচড়াল। ক্রিম মাখল মুখে। ডিনার খাবে না সে। বিছানায় গা এলিয়ে দেবে এবার।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে।

অ্যাডাম ওয়ার্নার তার অপেক্ষায় তখনও বসেছিল, একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে দেখছিল। জেনিফারকে ঢুকতে দেখে মাথা তুলল। নগ্ন দেহের জেনিফারকে দেখে চোখ নামিয়ে নিল, অস্বস্তি বোধ করল সে।

দুঃখিত, অ্যাডাম বলে উঠল, আমি

জেনিফার একবারের জন্যও ভাবতে পারেনি, অ্যাডাম ওয়ার্নার তার প্রতীক্ষায় বসে থাকবে। সে চমকে উঠল, মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। ছুটে চলে গেল বাথরুমে। গায়ে একটা ভোয়ালে জড়িয়ে ফিরে এল। তখন সে বেশ ক্ষিপ্ত।

–আশা করি তদন্তের কাজ শেষ হয়েছে। জেনিফার পার্কারের তপ্ত গলা, আপনি এখন বিদায় হোন।

মিস পার্কার, ম্যাগাজিনটা নামিয়ে রেখে অ্যাডাম বলল, আমরা ব্যাপারটা নিয়ে শান্তভাবে কি আলোচনা করতে পারি না?

–অসম্ভব। প্রশমিত রাগ আবার জ্বলে উঠেছে, শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে যা খুশি বলুন গিয়ে, আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনারা সকলে উঠে পড়ে লেগেছেন, মনে হয় এক দাগী আসামীর পেছনে আপনারা ছুটছেন।

মিস পার্কার, এটা আপনার ভুল ধারণা। আপনার নাম বার থেকে কেটে দেওয়া হবে কী হবে না, সেই ব্যাপারে তদন্ত করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আপনার মুখ থেকে আমি কয়েকটা কথা শুনতে চাই।

–সে নমুনা পেলাম। এবার আসুন।

দুঃখিত, মিস পার্কার। অ্যাডাম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল।

দাঁড়ান।

থমকে দাঁড়াল অ্যাডাম ওয়ার্নার।

–আমায় মাফ করবেন। কী যে হয়েছে আমার, সবাইকে আমি শত্রু বলে মনে করি। ক্ষমা চাইছি।

–ঠিক আছে, ঠিক আছে।

জেনিফারের খেয়াল হল তার পরনে তোয়ালে, ছাড়া কিছু নেই। সে বলল, বেশ, একটু বসুন। আমি পোশাক পরে আসছি।

–উত্তম কথা। ডিনার খেয়েছেন আপনি?

–আমি, কথার শেষটুকু আর বলতে পারল না জেনিফার।

সামনেই একটা রেস্তোরাঁ আছে। ফরাসি। মনে হয় তদন্তের জন্য ওটাই মোক্ষম জায়গা।

ওরা মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসল।

-এই রেস্তোরাঁর নাম অনেকেরই অজানা, অ্যাডাম বলতে থাকে, রান্নাবান্না খুব ভালো। এক ফরাসি দম্পতির হোটেল।

–খাবার মুখে তোলার মতো অবস্থা নেই জেনিফারের। খিদে পেয়েছিল ঠিকই, এই মুহূর্তে তার খিদে উবে গেছে। উত্তেজনায় সে তখনও টগবগ করে ফুটছে। কিছুতেই নিজেকে আয়ত্তে আনতে পারছে না। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকা সুদর্শন সুপুরুষ এ্যাটর্নি ভদ্রতার মুখোশধারী এক শয়তান। লোকটা তার শত্রু। তবে তার মননামুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণীয় চেহারার তারিফ করতেই হয়। তবে পরিস্থিতির চাপে সে এই সন্ধ্যেটাকে মন খুলে উপভোেগ করতে পারছে না। ওই অপরিচিত লোকটি তার ভবিষ্যতকে মুঠোবন্দী করেছে। আগামী দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই জানা যাবে, তার ভবিষ্যতের গতিপথ কী?

অ্যাডামও বুঝতে পারল, জেনিফার এখন চাপা উত্তেজনা ও ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। সে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। সে সম্প্রতি জাপান থেকে ঘুরে এসেছে, বিশেষ কাজে যেতে হয়েছিল। উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের সঙ্গে খানাপিনায় যোগ দিতে হয়েছিল, সেই সব গল্প বলল জেনিফারকে। গত বছর শিকার করতে গিয়েছিল আলাস্কায়। হিংস্র বন্য ভালুকের হাত থেকে কী করে যে নিজের প্রাণ নিয়ে ফিরে

এসেছিল, সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীও শোনাল। এই জাতীয় হালকা ধরনের রসালাপে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

এরপরেই শুরু হল তার জেরা। জেনিফার আবার উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

–মিস পার্কার, আমি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। অ্যাডাম বলল, আশা করি আপনি শান্তভাবে জবাব দেবেন।

গলার ভেতরে যেন কী একটা দলা পাকিয়ে আছে, জেনিফার মুখে কিছু বলতে পারল না, কেবল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

–সেদিন আদালতে যা ঘটেছিল তার আনুপূর্বিক আমাকে বর্ণনা করুন। অ্যাডামের ধীর স্থির শান্ত কণ্ঠস্বর, কোনো কথা যেন বাদ না যায়, অবশ্য ভুলে যদি না গিয়ে থাকেন। দরকার মনে করলে একটু ভেবে নিতে পারেন।

জেনিফার ভাবল, রুখে দাঁড়াবে। বিশ্রী ব্যবহার করে লোকটাকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু ওই সুদর্শন চেহারা আর অমায়িক ব্যবহার দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল।

–বেশ শুনুন। একটু থামল জেনিফার। বোধহয় দম নিল, ফের বলতে শুরু করল। সেদিন যা যা ঘটেছিল সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে গেল। অ্যাডাম মনোযোগ সহকারে তার কথাগুলি শুনছিল।

–যে লোকটা আপনার হাতে প্যাকেটটা দিয়েছিল, অ্যাডাম প্রশ্ন করল, তাকে ডিস্ট্রিক্ট অফিসে আগে দেখেছেন আপনি, সকালবেলা শপথ নেবার সময়?

–সেদিন ওই অফিসে অনেক লোকের জমায়েত ছিল। তারা কেউই আমার চেনা নয়। ওই লোকটিকে দেখেছিলাম কিনা তাও মনে পড়ছে না।

অন্য কোথাও এর আগে ওকে দেখেছেন?

–সম্ভবত না, জেনিফারের কণ্ঠে অসহায়তার সুর। যদি বা দেখে থাকি, মনে করতে পারছি না।

আপনাকে প্যাকেটটা দেবার আগে লোকটা নাকি ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলেছিল, আপনি বলেছেন, আপনি কি দেখেছেন ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নিই ওই প্যাকেটটা লোকটার হাতে গুঁজে দিচ্ছে।

না, আমি দেখিনি।

লোকটি কি সত্যিই ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলেছিল, না কি ভিড়ের মধ্যে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

খানিকক্ষণের নীরবতা। জেনিফারের চোখ বন্ধ। সম্ভবত সেদিনের ঘটে যাওয়ার ছবিটা সে স্পষ্ট দেখার চেষ্টা করছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে চোখ খুললনা, সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি ঠিক জানি না।

–আপনি বলেছেন, লোকটি আপনার নাম ধরে ডেকেছিল। লোকটি আপনার নাম জানল কী করে বলতে পারেন?

-না।

–আচ্ছা, এ কাজ তো সে অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারত। আপনাকে বেছে নিল কেন?

–এ তো সহজ কথা। আমি একটা গাধা। চোখ মেলে তাকিয়েই লোকটা আমাকে দেখেছিল, আর ঠিক করে নিয়েছিল, এই গাধাটাকেই দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। জোরে জোরে মাথা দোলাচ্ছে জেনিফার, মিঃ অ্যাডাম। এ প্রশ্নেরও জবাব আমার জানা নেই। দুঃখিত।

দীর্ঘদিন ধরে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা মাইকেল মোরেটিকে বাগে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনভাবে তিনি মামলাটা সাজিয়েছিলেন, মোরেটির বেরোনোর সব পথ বন্ধ। কিন্তু মামলা চলাকালীন মাঝখানে আপনি এসে সব গড়বড় করে দিলেন। ডি সিলভা আপনার ওপর ভীষণ চটে আছেন।

–আমি নিজেও নিজের ওপর ভীষণভাবে বিরক্ত। জেনিফার বলল। সে জানে অ্যাডাম ওয়ার্নারের কোনো দোষ নেই। সে তার কর্তব্য পালন করছে মাত্র। রবার্ট ডি সিলভা তাকে বার থেকে তাড়িয়ে ছাড়বেন। তারই প্রাথমিক প্রথম পদক্ষেপ হল এই জেরা। এর জন্য সে অ্যাডাম ওয়ার্নারকে মোটেই দায়ী করছে না। সে নিমিত্তমাত্র।

হঠাৎ একা থাকার এক অদ্ভুত ইচ্ছে জাগল জেনিফারের মনে। লোকে তার দুঃখ দুর্দশা দেখবে আর মুখ টিপে হাসবে, সে সেটা বরদাস্ত করতে পারছে না।

দুঃখিত। শরীরটা খারাপ লাগছে। জেনিফার বলল–বাড়ি ফিরতে চাই, যদি আপনি বলেন।

অ্যাডাম তার দিকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখল। ক্ষণিকের জন্য, তারপর শান্ত গলায় বলল বার থেকে বহিষ্কার করার মামলা যদি আপনার বিরুদ্ধে না করা হয়, তাহলে কি আপনি সুস্থ বোধ করবেন না?

কী অবিশ্বাস্য কথা। জেনিফার অ্যাডামের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল। খানিক বাদে ঢোক গিলে বলল, এটা কি সত্যি?

–আইনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করাকে আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন।

অ্যাডামের প্রশ্ন শুনে জেনিফারের মনে পড়ল তার বাবা বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি আইনের ডিগ্রিটা নিয়ে নাও, তখন তুমি হবে আমার এক সহকারী।

–হ্যাঁ, জেনিফারের নীচু কণ্ঠস্বর।

আপনার শুরু যদি কঠোর ও দুঃখপূর্ণ হয় এবং সেই সব বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারেন তাহলে ভবিষ্যৎ হয় অত্যন্ত সুখের। অবশ্য আমি এরকমটাই মনে করি।

ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠল জেনিফারের দুটি ঠোঁটে–আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

জেনিফার নিজে একটা স্বাধীন ব্যবসা দিয়েছে। আইনের প্রতিষ্ঠান। হতে পারে সেটা পুরোনো জরাজীর্ণ বাড়ির একখানা নোংরা ভ্যাপসা ঘিঞ্জি ঘর, দুজন পুরুষের মাঝখানে একটা টেবিল স্পেস, তবুও সে গর্বিত এই ভেবে যে, সে একজন আইনজীবী।

বারের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি তাকে ব্যবসা চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছে। জেনিফারের হঠাৎ মনে হল সে যেন মস্ত বড়ো একটা কাজ সম্পন্ন করেছে। অ্যাডাম ওয়ার্নারের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভরে গেল তার অন্তর। আজীবন এই লোকটিকে সে মনে রাখবে।

টেবিল থেকে কাপডিসগুলো নিয়ে গেল ওয়েটার।

কী একটা বলতে যাচ্ছিল জেনিফার। কিন্তু তখন হাসি ও কান্না মিলিত হয়ে তার কণ্ঠকে যেন টিপে ধরেছে। কেবল একটি শব্দ শোনা গেল মিঃ ওয়ার্নার।

না, মিঃ ওয়ার্নার নয়। অ্যাডামের গম্ভীর গলা, আজ থেকে আমি কেবল অ্যাডাম।

কয়েকটা সপ্তাহ

পরবর্তী কয়েকটা সপ্তাহ কোথা দিয়ে কেটে গেল জেনিফার টের পেল না। সপিনা বিলি করার কাজে প্রচণ্ডভাবে ব্যস্ত সে-ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। সে খুব ভালোভাবেই জানে, কোনো বড়ো প্রতিষ্ঠান তাকে চাকরি দেবে না। নিজের ব্যবস্থা নিজে করা ছাড়া উপায় নেই।

তখন পিবডি অ্যান্ড পিবডি প্রতিষ্ঠানের গোছ গোছা শমন আর সপিনা এসে জমা হচ্ছে জেনিফারের ডেস্কের ওপর। অবশ্য এই কাজটাকে সে কখনোই আইনজীবীর পেশা হিসেবে গণ্য করে না। কিন্তু জীবন ধারণের জন্য মোটামুটি উপার্জন তো করতে পারছে। সাড়ে বারো ডলার তাকে দেওয়া হয় প্রতি সমন ও শপিনা পিছু। যাতায়াতের জন্য গাড়িভাড়াও তার পকেট থেকে যায় না।

অনেক সময় কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যায়, তখন সে কেনেথ বেইলি আর অটো ওয়েনজেলকে সঙ্গে নিয়ে ডিনার খেতে যায়।

কেনেথ বেইলিকে দেখে জেনিফার প্রথম প্রথম ভুল ধারণা করেছিল, রুক্ষ ও কঠোর প্রকৃতির জীবনের প্রতি কোনো টান নেই। তবে কয়েকদিন পরেই তার এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হল। সে তার সম্পর্কে আর একটা তথ্য আবিষ্কার করেছে-কেনেথ নিঃসঙ্গ। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেনেথ গ্রাজুয়েট হয়েছে, প্রচুর পড়াশুনা করেছে। অথচ এই লোকই ঘিঞ্জি নোংরা অফিস ঘরে বসে, কার হারিয়ে যাওয়া বউ বা স্বামী, অথবা ছেলেমেয়ের অনুসন্ধান করে খবর এনে দিচ্ছে। কেন যে সে জীবনটাকে

এমনভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে, জেনিফার জানে না। সম্ভবত কোনো কারণে জীবনে এগিয়ে যাবার পথে প্রথমেই বিশ্রী এক প্রতিরোধের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। তাই আজ সাফল্যের কথা ভাবতে ভয় পায়।

কথা প্রসঙ্গে জেনিফার তাকে বিয়ের কথা বলেছিল। কেনেথ বেইলি ভীষণ চটে গেল। চিৎকার করে বলল–ওসব নিয়ে আপনাকে না ভাবলেও চলবে।

এরপর থেকে জেনিফার তার কাছে বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না।

আর অটো ওয়েনজেল? কেনেথ বেইলির সম্পূর্ণ উল্টো পিঠ, মোটা ও বেঁটে চেহারার লোকটা বিয়ে-থা করে সুখেই ঘরকান্না করছে। সে জেনিফারকে মেয়ের মতো স্নেহ করে, বাড়ি থেকে বউয়ের বানিয়ে দেওয়া কেক আর স্যুপ সে মাঝে মধ্যে জেনিফারকে খেতে দিয়েছে। জেনিফার খেতে চায় না। কিন্তু ভয়, যদি অটো ওয়েনজেল দুঃখ পায়, সে জন্য সে যা পেত, সব খেয়ে নিত, আপত্তি করত না।

সেদিন ছিল শুক্রবার। ডিনারে নিমন্ত্রণ করল অটো। জেনিফার তার বাড়িতে গেল। একটা বিশ্রী রান্না বেঁধেছিল তার বউ। চাল, বাঁধাকপি আর মুরগির মাংস দিয়ে বানানো একটা নতুন পদ। খেতে বসে জেনিফারের বমি পাচ্ছিল-বাঁধাকপি আর চাল আধসেদ্ধ, মাংসটা চামড়ার মতো শক্ত আর সিটানো। সে কোনোরকমে ডিনার সেরেছিল।

খাবারগুলো কেমন খেতে লাগছে? আগ্রহ ভরে অটোর বউ জানতে চাইল।

–ওহ দারুণ। জেনিফারের ঠোঁটে কৃত্রিম খুশীর আভাস, এই পদটা খেতে আমি ভীষণ ভালোবাসি।

এরপর থেকে প্রতি শুক্রবার তাকে অটো ওয়েনজেলের বাড়িতে যেতে হত ডিনার। খেতে। অটোর বউ জেনিফারের প্রিয় পদটি রান্না করে খেতে দিত।

.

সকাল হয়েছে। ফোন বেজে উঠল।

মিস পার্কার, আমি মিঃ পিবডি জুনিয়ারের সেক্রেটারী বলছি, মিঃ পিবডি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। আজই, সকাল এগারোটায়। দয়া করে ওই সময় আপনি একবার আসবেন।

-ঠিক আছে, ম্যাডাম।

পিবডি আর পিবডি একটি নামকরা বড়ো আইন প্রতিষ্ঠান। সপিনা আর শমন বিলি করার সুবাদে এখানকার ডজন ডজন সেক্রেটারী আর কেরানীদের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। অল্পবয়সী উকিলরা আইন পাশ করে এখানে চাকরিতে ঢুকতে পারলে বর্তে যায়। পিবডি অ্যান্ড পিবডি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে জেনিফার বেরিয়ে পড়ল। তারও মনে কত স্বপ্নের আনাগোনা। পিবডি স্বয়ং তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হয়তো তার মধ্যে প্রচুর সম্ভবনা লক্ষ্য করেছেন। তাই নিজে থেকে ডেকে তাকে চাকরি দিতে আগ্রহী। জেনিফারের মধ্যে যে এলেম আছে, তা তিনি প্রমাণ

করে দেখাবার সুযোগ দিতে চাইছেন। সত্যি, এমন সুযোগ যদি জেনিফার পায়, তাহলে সবাইকে একেবারে অবাক করে দেবে। এমনও তো হতে পারে, কোনো একদিন সে এই কোম্পানীর একজন অংশীদার হয়ে উঠেছে। তখন এই কোম্পানীর নাম পিবডি, পিবডি অ্যান্ড পার্কার।

এগারোটার অনেক আগেই জেনিফার নির্দিষ্ট অফিসে এসে ঢুকল। বাইরের করিডরে আধঘন্টা কাটিয়ে দিল। ঘড়ির দিকে তাকাল। পাক্কা এগারোটা। সে রিসেপশনে ঢুকল। তারপর দু-ঘন্টার প্রতীক্ষা। ডাক এল।

পাতলা ছিপছিপে চেহারা মি. পিবডি জুনিয়ারের। পরনে স্যুট ও পায়ে দামী জুতো। সবই লন্ডনের তৈরী।

উনি জেনিফারকে বসতে না বলে রুক্ষ কর্কশ গলায় বললেন মিস পটার–

পার্কার, জেনিফার ভুলটা ঠিক করে দিল।

এক টুকরো কাগজ তিনি এগিয়ে দিতে দিতে বললেন–এটা একটা শমন। আপনাকে এটা পোঁছে দিতে হবে।

জেনিফার বুঝতে পারল, তাকে চাকরি দেওয়ার জন্য ডাকা হয়নি।

–এই কাজটা করতে পারলে আপনাকে পাঁচশো ডলার দেওয়া হবে পারিশ্রমিক হিসেবে।

–আঁ, জেনিফার আঁতকে উঠল। পাঁচশো ডলার!

–হ্যাঁ, পাঁচশো ডলার, যদি কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারেন।

জেনিফারের বুঝতে আর দেরী হল না, কাজটা সহজ সোজা সাপটা নয়।

–শুনুন মিস পটার, জেনিফার এবার আর তার ভুল শুধরে দিল না। গত এক বছর ধরে আমরা লোকটার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লোকটা হল উইলিয়াম কারলাইন। লং আইল্যান্ডে বাস করে লোকটা। নিজের ওই বাড়ির মধ্যেই সর্বদা থাকে, বাইরে বেরোয় না। একডজন লোক শমন বিলি করতে গিয়ে দরজা থেকেই ফিরে এসেছে। গেটে এক প্রহরী কাম বাটলার আছে। সে কাউকেই কারলাইনের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

কীভাবে যে কাজটা

–এটা প্রচুর টাকার ব্যাপার, মি. পিবডি জুনিয়ার একটু ঝুঁকে পড়ে বলতে থাকলেন, ওই লোকটাকে কিছুতেই আদালতে হাজির করাতে পারছি না। শমন বিলি না করা অব্দি কিছু করা যাবে না। আপনার পক্ষে কি কাজটা করা সম্ভব?

তখন জেনিফারের মাথায় ঘুরঘুর করছে পাঁচশো ডলারের ছবি। কীভাবে টাকাটা খরচ করবে তা ভাবছে। বলল–দেখি, উপায় তো একটা বের করতেই হবে।

.

সেদিন ঠিক মধ্যে দুপুরে জেনিফার এসে হাজির হল লং আইল্যান্ডে। উইলিয়াম কার লাইনের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দশ একর জায়গার ঠিক মাঝখানে প্রাসাদোপম বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটির চারদিকে সুন্দর সুন্দর ফুল ও ফলের বাগান।

কী করে কাজটা হাসিল করবে, সেটাই ভাবতে লাগল জেনিফার। আগেই সে জেনেছে বাড়িতে ঢোকা অসম্ভব। তাহলে যে কোনো উপায়ে মিঃ কারলাইনকেই বাড়ির বাইরে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু

হঠাৎ সে দেখল, পথের ঠিক মাঝখানে বাগানের মালির ট্রাক দাঁড়িয়ে। সে পায়ে পায়ে ট্রাকটির সামনে এসে দাঁড়াল। তিনজন জাপানি কাজ করছে।

মালিদের প্রধান কে?

জেনিফারের প্রশ্ন শুনে একজন জাপানি এগিয়ে এল–আমি।

একটা ছোট্ট কাজ তোমাকে করে দিতে হবে।

দুঃখিত মিস, আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।

–পাঁচ মিনিট মাত্র লাগবে।

–তাহলেও হবে না।

–তোমরা প্রত্যেকে একশো ডলার করে পাবে। কী রাজী? মালিরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল বোকার মতো–পাঁচ মিনিটের কাজের জন্য একশো ডলার করে দেবেন?

-হ্যাঁ, দেব।

–আমরা রাজী, বলুন, কী কাজ?

পাঁচ মিনিট বাদে দেখা গেল মালির ট্রাকটা এসে ঢুকল উইলিয়াম কারলাইনের বাগানের ভেতর। তিনজন জাপানি আর জেনিফার সেই গাড়ি থেকে নামল। চারপাশে ভালো করে লক্ষ্য করল সে। তারপর একটা সুন্দর গাছের দিকে আঙুল তুলে বলল–তোমরা ওই গাছের গোড়াটা খুঁড়তে থাকো।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল কাজ। শাবলের আঘাত এসে পড়তে থাকল গাছের গোড়ায়। আধমিনিটের মধ্যেই বাড়ির দরজা সশব্দে খুলে গেল। ছুটে এল একটা বিশাল দেহের লোক, পরনে বাটলারের পোশাক।

থামো। থামো! লোকটা ছুটে এল, কী করছ?

লং আইল্যান্ড নার্সারি থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে। জেনিফারের কণ্ঠে সামান্য ভয়ও নেই। ওই গাছগুলো তুলে নিয়ে যাব।

কী বলছেন আপনি?

বিশাল দেহী লাকটির চোখে অবিশ্বাস।

–বললাম, এখানকার সব গাছ তুলে নিয়ে যাব। ধরো সরকারী হুকুম। এই বলে জেনিফার এক টুকরো কাগজ লোকটির হাতে তুলে দিল। অসম্ভব। এই হুকুম দেখলে মি. কারলাইন অজ্ঞান হয়ে যাবেন। লোকটি এবার তিন জাপানির দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা শাবল চালানো বন্ধ করো।

সাবধান। জেনিফার গর্জে উঠল, কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো না।

-শুনুন, লোকটি বোঝানোর চেষ্টা করল, নিশ্চয়ই আপনার কোনো ভুল হচ্ছে। এরকম কোনো হুকুম মি. কারলাইন দেননি।

উনি দেন নি তো কী হয়েছে, আমার মালিক দিয়েছেন।

উনি এখন কোথায়?

উনি ব্রুকলিনে গেছেন, বিশেষ কাজে। অফিসে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। লোকটি বড়োবড়ো চোখে জেনিফারের দিকে তাকাল, পারলে যেন তাকে চিবিয়ে খেয়ে নেয়। বলল–বেশ, একটু থামুন। আমি আসছি মিনিট খানেকের মধ্যেই, কোনো কিছুতে এখন আর হাত দেবেন না।

বাটলার লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কয়েক মিনিটের নীরবতা।

বেঁটেখাটো মাঝবয়সী একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে বাটলার ফিরে এল।

–এসবরে অর্থ কী? বেঁটে লোকটা জেনিফারকে প্রশ্ন করল।

আপনার অতশত জেনে লাভ কী? জেনিফার পাল্টা প্রশ্ন করল।

লাভ তো আছেই। এটা আমার জমি। আমি হলাম উইলিয়াম কারলাইন।

–ও, আপনিই উইলিয়াম কারলাইন। জেনিফার দ্রুত পকেট থেকে শমনটা বের করে ওর হাতে খুঁজে দিল, এটা দিতেই আমি এখানে এসেছিলাম। তারপর মালিদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের কাজ শেষ।

উইলিয়াম কারলাইন কিছু বোঝার আগেই জেনিফার সেখান থেকে সরে পড়ল।

পরদিন খুব সকালে অ্যাডাম ওয়ার্নার ফোন করল।

-শোনো জেনিফার, গলাটা শুনেই জেনিফার বুঝতে পারল কে ফোন করছে, তুমি সত্যিই দুশ্চিন্তা মুক্ত হলে। তোমাকে বার থেকে বহিস্কৃত করার যে মামলা দায়ের করার কথা ছিল, তা বাতিল করা হয়েছে।

জেনিফার দুটি চোখ বন্ধ করল। গাল বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ছে খুশীতে। পরম করুণাঘন ঈশ্বরকে তার কৃতজ্ঞতা জানাল। অ্যাডামের প্রতিও জানাল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সত্যি, তোমাকে যে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব, জানি না। জীবনে তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না।

জেনিফার, ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য নয়। ধন্যবাদ দাও আইনকে, অ্যাডাম বলতে থাকে, আইনের চোখ বাঁধা বলে সে কিন্তু অন্ধ নয়।

অবশ্য এর জন্য মামাশ্বশুর স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম আর ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি ডি সিলভার কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে, জেনিফারকে ইচ্ছে করেই সেকথা বলল না।

–ওই হারামজাদীকে তুমি ছেড়ে দিচ্ছো অ্যাডাম। রাগে গজগজ করতে থাকে রবার্ট ডি সিলভা। মাফিয়াদের সঙ্গে ওর ওঠা-বসা আছে। আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। আর তুমি কিনা ওই নচ্ছার মেয়েটাকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করছে। সাবধান, ও তোমাকেও বিপদে ফেলবে।

রবার্ট, আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অ্যাডাম শান্ত গলায় বলতে লাগল, আপনি জেনিফারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করেছিলেন, তা ছিল পারিপার্শ্বিক। কিন্তু আমি তদন্তে জেনেছি, ও মাফিয়াদের পাতা ফাঁদে নিজের অজান্তেই পা দিয়েছিল। মাফিয়াদের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি

থামো, ডি সিলভা মন্তব্য করলেন, তার মানে তোমার জেনিফার পার্কার আগের মতোই উকিল থাকছে, তাই তো? বার থেকে কেউ ওকে তাড়াতে পারবে না। তবে তুমি জেনে রাখো, আমার হাত থেকে ও রেহাই পাবে না। কোনো একটা মামলায় ওকে পাই, দেখবে এমন কোণঠাসা করে ছাড়ব যে পালাবার পথ পাবে না। ওর ভবিষ্যৎ কালো করে ছাড়ব আমি।

অ্যাডাম জানে, ডি সিলভা অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ, জেনিফারের এক প্রবল শত্রু। জেনিফার এমনই এক নরম ও স্পর্শকাতর লক্ষ্যস্থল যেখানে তীর নিক্ষেপ করা ডি সিলভার পক্ষে কঠিন কাজ নয়।

জেনিফার অসাধারণ রূপবতী, মেধাবী, আদর্শবাদী আইনজীবী। অ্যাডাম বুঝতে পারল, জেনিফারের সঙ্গে আর দেখা না করাই ভালো।

.

জেনিফার একা এবং নিঃসঙ্গ। সারাদিন নানারকম কাজের মধ্যে দিয়ে কেটে যায়। কিন্তু রাত হলেই সেই একাকীত্বের যন্ত্রণা গ্রাস করে তাকে। দুচোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে, কিন্তু ঘুম আসে না। রাশি রাশি দুঃস্বপ্ন তাকে যেন তাড়া করে বেড়ায়। যেদিন তার মা আঠারো বছরের একটা ছেলেকে সঙ্গে করে স্বামী কন্যা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল সেদিন থেকে জেনিফার দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। নিঘুম থেকে রাত কেটে যায় তার।

সে একজন সঙ্গীর অভাব বোধ করে। মন হাঁপিয়ে ওঠে। শরীর ছটফট করে। মাঝে মধ্যে সে সমবয়সী তরুণ উকিলদের সাথে ডেট করে। কিছুদিন মেলামেশার পর সে অনুভব করে, তার ক্ষুরধার বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বের কাছে ওরা অত্যন্ত সাদাসিধে। কেউ কেউ তাকে বিছানায় পেতে চায়। দৈহিক চাহিদা মেটাতে সেও ছুটে যায়। ব্যাস ওই পর্যন্ত। কিন্তু দেহের খিদে মিটলে তো হল না, মন বলেও একটা বস্তু আছে। সেই মন এমন কোনো পুরুষকে খুঁজে পায়নি, যে অ্যাডাম ওয়ার্নারের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। সে এমন কাউকে মন দিতে চায়, যে তার জন্য ভাববে, আবার সে তার জন্য ভাববে।

বিবাহিত পুরুষরাও জেনিফারের দিকে হাত বাড়াত। ডেট করতে চাইত। কিন্তু জেনিফার এই সব পুরুষদের পছন্দ করত না। তাদের ডাকে সাড়া দিত না। মায়ের দুর্ব্যবহার আর বেলেল্লাপনা সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না, যে মহিলা নিজের হাতে গড়া সংসার দুপায়ে। মাড়িয়ে থেতলে দিয়ে চলে গেছে, যে বাবার বাকি জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল, জেনিফার কোনোদিন তার মাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

.

বড়োদিন এল, আর কয়েকটা দিন পরেই পুরোনোকে বিদায় দিয়ে নববর্ষের আগমন ঘটবে। এই সময় শহরে প্রচুর তুষারপাত হল। জেনিফার পথে বেরোল একা। হাঁটতে হাঁটতে দেখল কত সুখী দম্পতিকে, দেখল প্রেমিক-প্রেমিকাকে। পুরোনোকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে আহ্বান জানাতে খুশীতে মেতে উঠেছে। সবাই জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে। অথচ সে? একা, নিঃসঙ্গ ভীষণভাবে সে এই একাকীত্বটাকে অনুভব করে, মনে পড়ে বাবার কথা। ভয়ানক খারাপ হয়ে যায় মন।

বড়োদিনের ছুটি শেষ। এল উনিশশো সত্তর সাল। জেনিফার ভাবল, এই বছর তার জন্যে নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ বহন করে এনেছে।

কেনেথ বেইলির কথা মনে পড়ল। জেনিফারকে চাঙ্গা করার জন্য লোকটার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। মাঝে মধ্যে সে জেনিফারকে সিনেমা দেখতে নিয়ে গেছে। কখনও বা পার্কে বেড়াতো। জেনিফার টের পেয়েছে কেনেথ তার প্রতি আসক্ত। কিন্তু কাছে ঘেঁষতে চায় না, দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

মার্চ মাস। অটো ওয়েনজেল ঠিক করল, সস্ত্রীক ফ্লোরিডায় যাবে।

অটো বলল জেনিফারকে উদ্দেশ্য করে, নিউইয়র্কে ভীষণ ঠান্ডা। শীতে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বয়স তো বাড়ছে। এত ধকল সহ্য হয়।

–আপনার অভাব আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করব।

কথাটার মধ্যে একটুও ভেজাল নেই। গত কয়েক মাসে ওয়েনজেল পরিবারের সে একজন ঘনিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হয়েছে।

–জেনি, অটো বলল, কেনেথের প্রতি খেয়াল রেখো।

কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে জেনিফার বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

–ও তোমায় কিছু বলেনি? অটো জানতে চাইল।

–কী?

–ওর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল। এ ব্যাপারে কেনেথ নিজেকে দায়ী করে।

-তাই নাকি? জেনিফার তাজ্জব বনে গেল। কী এমন হয়েছিল যে, সে আত্মহত্যা করল?

-কেনেথ, একটু ইতস্তত করে অটো বলল, ও একজন সমকামী ওর বউ দেখেছে, ও একটা সুন্দর ছেলের সঙ্গে একবিছানায় শুয়ে

হায় ভগবান।

–ওই দৃশ্য দেখে ওর বউয়ের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কেনেথকে খুন করে নিজে মরতে চেয়েছিল। তাই কেনেথকে লক্ষ্য করে একটা গুলি চালিয়ে দিয়েছিল, অন্যটা নিজের মাথা তাক করে। কেনেথ বেঁচে গেল। কিন্তু ওর বউ

–এমন এক ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা কেনেথ আমাকে কখনও বলেনি। অথচ তাকে দেখে–

ওর বাইরেটা হাসিখুশী হলে কী হবে, অন্তরে দুঃখের অনল জ্বলছে।

ব্যাপারটা আমায় বলার জন্য ধন্যবাদ।

জেনিফার অফিসে ফিরে এল।

কেনেথ বলল–তা হলে সত্যি সত্যি অটো ওয়েনজেল আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

-হ্যাঁ।

–তাহলে এবার সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের দুজনকে লড়াই করতে হবে।

–ঠিক তাই।

ওই ঘটনা শোনার পর থেকে জেনিফারের মনে কেনেথের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। সে কেনেথের মধ্যে সমকামিতার কোনো লক্ষণ খুঁজে পায় না। তারা এক সঙ্গে লাঞ্চ খায়, ডিনার খায়। তবে জেনিফার জানে, কেনেথ সম্পর্কে অটো যা বলেছে সব সত্যি। লোকটা এখন আত্মগ্লানিতে ভুগছে।

ধীরে ধীরে জেনিফারের ব্যবসা জমতে শুরু করল। কয়েকজন মক্কেল আসছে। তবে তাদের বেশীর ভাগই বেশ্যা। কোনো সমব্যবসায়ী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, তাকে জামিন করাতে হবে। এরা সংখ্যায় কম। কিন্তু নিয়মিত মক্কেল। কিন্তু কার কাছ থেকে তারা জেনিফারের ঠিকানা পেয়েছে, তা বারবার জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেনি সে। কেনেথ বেইলকেও এব্যাপারে প্রশ্ন করেছে। সে নীরব থেকেছে। বোকার মতো তাকিয়ে থেকেছে, যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।

যখন মক্কেল আসত, তখন কেনেথ বেইলি ঘরের বাইরে চলে যেত। সেই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হত, সে বুঝি এক গর্বিত পিতা, মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক, এটাই তার একমাত্র কামনা।

বিবাহ বিচ্ছেদের মামলাও এল। কিন্তু এসব কেস জেনিফার হাতে নেয় না। মনে পড়ে যায় সেই প্রফেসারের কথা। যিনি বলেছিলেন, ওকালতিতে পসার জমাতে গেলে ডিভোর্সের মামলা কখনওই গ্রহণ করা উচিত নয়। তাই ডিভোর্সের জন্য যেসব উকিল, লড়ে, তাদের কম বেশী বদনাম আছে। বিয়ে ভাঙার কারণেই এটা তাদের কপালে জুটে যায়। আসলে মোটা টাকার লোভ তারা সামাল দিতে পারে না। তাদের কারণেই এক

একটি সুন্দর সংসার ভেঙে যায়। স্বামী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জীবনে নেমে আসে এক বিভীষিকা।

এবার আসতে শুরু করেছে অবস্থাপন্ন লোকেরা। সাধারণ ফৌজদারী মামলা নয়, তারা আসছে দেওয়ানি মামলার জন্য। লক্ষ লক্ষ ডলারের ব্যাপার। এসব মামলা সাধারণত বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো পেয়ে থাকে।

কিন্তু তার মতো এক অনামী উকিলের কাছে তারা আসবে কেন? কে পাঠাচ্ছে তাদের?

মক্কেলদের কাছে জেনিফার প্রশ্ন রাখত। কিন্তু কখনও স্পষ্ট জবাব পায়নি।

এক বন্ধুর মুখ থেকে শুনেছি।

কাগজে পড়েই আপনার কথা জানতে পেরেছি।

এক পার্টিতে গিয়ে একজন পরিচিত আপনার নাম বলেছিলেন। তাই চলে এলাম। লোকটা কে? কে তার হিতাকাঙ্খী? একদিন জেনিফার তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল।

এক ধনী মক্কেল তার নিজের সমস্যা বলতে বলতে নামটা বলে ফেলল–অ্যাডাম ওয়ার্নার।

–ও, আপনাকে তাহলে উনিই পাঠিয়েছেন! জেনিফার স্পষ্ট ভাবে জানতে চাইল। ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেল। ঢোক গিলে বলল, আপনাকে আমি কথাটা বলে ফেললাম, মি. ওয়ার্নার যেন জানতে না পারেন।

অ্যাডাম ওয়ার্নারের প্রতি আরো একবার কৃতজ্ঞতাবোধ করল জেনিফার। এমনিতেই সে তার কাছে ঋণী। ফোন করে ওকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।

টেলিফোনে অ্যাডাম ওয়ার্নারকে পাওয়া গেল না। সেক্রেটারী জানাল, তিনি ইওরোপে গেছেন একটি বিশেষ কাজে। কয়েক সপ্তাহ পরে ফিরবেন।

অ্যাডাম ওয়ার্নারকে খুব বেশী করে মনে পড়ছে জেনিফারের। যেদিন সন্ধ্যায় অ্যাডাম প্রথম তার কাছে এসেছিল। ছিঃ ছিঃ, কী দুর্ব্যবহারই না সে করেছিল। কিন্তু অ্যাডাম ওসব গায়ে মাখেনি। জেনিফারকে সে বাঁচিয়েছে, তার দয়াতেই সে এখনও ওকালতি পেশা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিন সপ্তাহ পর জেনিফার আবার ফোন করল।

মি. ওয়ার্নার দক্ষিণ আমেরিকায় গেছেন। সেক্রেটারী জানাল, ওনাকে কোনো জরুরী খবর দেবার আছে কি?

না, বিশেষ কিছু নেই। জেনিফার ফোন নামিয়ে রাখল।

চেষ্টা করল অ্যাডামকে ভুলে যেতে। কিন্তু পারছে না। আচ্ছা, অ্যাডাম কি বিয়ে করেছে, নাকি এখনও অবিবাহিত? আমি যদি ওর বউ হতে পারতাম? ব্যাপারটা কল্পনা করে জেনিফার আপন মনে হেসে উঠল–যত সব অলীক ভাবনা।

দৈনিক খবরের কাগজ আর সাময়িক পত্রে মাঝে মাঝেই মাইকেল মোরেটির সম্বন্ধে ছাপা হয়। জেনিফারের নজরে পড়েছে। নিউইয়র্কের ম্যাগাজিনে অ্যান্টোনিও গ্র্যানেলি সমেত পূর্বাঞ্চলের বহু মাফিয়া পরিবার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। অ্যান্টোনিও গ্র্যানেলির জামাই মাইকেল মোরেটি। শ্বশুরের স্বাস্থ্য দিনে দিনে ভেঙে পড়ছে। তাই অপরাধমূলক কাজকর্ম আর খুনখারাপির বিরাট রাজ্যপাট জামাইয়ের ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

মোরেটির বিচারের খবরটা লাইফ ম্যাগাজিন ছেপেছিল। ক্যামিলো স্টেলা, মোরেটির ডান হাত এখন লিভেনওয়ার্থ জেলে বন্দী। রবার্ট ডি সিলভা একেই রাজসাক্ষী করতে চেয়েছিলেন। অথচ নাটের গুরু মোরেটি বহাল তবিয়তে মুক্ত জীবন কাটাচ্ছে। আইন তার চুলও স্পর্শ করতে পারছে না। মাইকেল মোরেটির বিরুদ্ধে সাজানো মামলাটি কীভাবে জেনিফার পার্কারের জন্য বানচাল হয়ে গিয়েছিল, তাও বিস্তারিত ভাবে লাইফ ম্যাগাজিন লিখেছে। যদি মামলাটি ঠিক পথে চলত তাহলে এতদিনে মাইকেল মোরেটির ফাঁসি হয়ে যেত, নতুবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করত।

প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে জেনিফার কেমন অস্বস্তিবোধ করল। বৈদ্যুতিক চেয়ার? সম্ভব হলে সে নিজেই ওই বৈদ্যুতিক চেয়ারের সুইচ চালু করে দিত।

.

জেনিফারের মক্কেলের সংখ্যা কম নয়। তবে বেশীর ভাগই সাধারণ স্তরের অপরাধী। তাদের হয়ে মামলা লড়তে গিয়ে ফৌজদারী আইনের পুরোটাই জেনিফার রপ্ত করে

ফেলল। ফৌজদারী আদালতে সব কটা এজলাস তার ঘোরা। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দেহ বেচা, নিষিদ্ধ মাদক বিক্রি, ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী, এমন মক্কেলদের হয়ে মামলা লড়তে হত জেনিফারকে। এখানে দাম দস্তুর করা একটা মামুলি ব্যাপার।

বিচারক রায় দিলেন–জামিন পাঁচশো ডলার।

ধর্মাবতার আমার মক্কেল গরীব, অত টাকা নেই। জেনিফার বলে উঠল, যদি দয়া করে টাকার পরিমাণ কমিয়ে দুশো ডলার করেন তা হলে বেচারী আবার কাজকর্ম শুরু করতে পারে। সংসারটাও রক্ষা পায়।

–ঠিক আছে। দুশো ডলার জামিন।

ধন্যবাদ মী লর্ড।

.

ফাদার ফ্রান্সিস জোসেফ রায়ান। পঞ্চাশের ওপর বয়স। মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল কানের ওপর দিয়ে ঝুলছে। তাকে দেখেই জেনিফারের ভালো লেগে গিয়েছিল। কেনেথ বেইলি অবশ্য তার সঙ্গে জেনিফারের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। উনি কেনেথ বেইলিকে অনেক মর্কেল পাঠিয়ে ছিলেন। তাই কেনেথ তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

এক মাস পর একদিন সকালবেলা ফাদার রায়ান এসে হাজির হলেন জেনিফারের অফিসে।

–একটা বিশেষ দরকারে তোমার কাছে আসা, ফাদার বলে চললেন, আমার এক বন্ধু খুব ঝামেলায় পড়েছে। কিন্তু বেচারার কাছে

অর্থ নেই। জেনিফার তার কথাটা সম্পূর্ণ করে দিল।

–তোমার অনুমান যথার্থ। লোকটিকে সাহায্য করা আমার একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। তাই তোমার দ্বারস্থ হয়েছি।

ব্যাপারটা কী? খুলে বলুন।

–ও হল আব্রাহাম, আব্রাহাম উইলসন। ওর বাবা আমার যজমান। মদের দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে আব্রাহাম মালিককে খুন করেছিল। তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম করাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ও এখন জেলে দিন কাটাচ্ছে।

-সাজা তো হয়েই গেছে, আমার কী আর করার আছে।

আগে সবকথা শোনো, ফাদার রায়ান বলতে থাকেন, কয়েক সপ্তাহ আগে আব্রাহাম জেলের মধ্যেই একটা খুন করেছে। এক কয়েদিকে। নাম রেমন্ড থর্প। দ্বিতীয় বার খুনের অভিযোগে পুলিশ ওকে আদালতে হাজির করবে। এবার নিশ্চয়ই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে ওকে।

হ্যাঁ, কয়েক দিন আগে কাগজে খবরটা সে পড়েছিল, জেনিফারের মনে পড়ল।

আমি কী করতে পারি বলুন?

আব্রাহামের যাতে মৃত্যুদণ্ড না হয়, সেটা তোমায় দেখতে হবে।

–ফাদার, মামলাটা খুব জটিল। জেনিফার চেয়ারে পিঠ দিয়ে বসল। ওর বিরুদ্ধে তিনটে অপরাধ একই সঙ্গে কাজ করছে–প্রথমত ও কৃষ্ণাঙ্গ, দ্বিতীয়ত খুনের দায়ে তার জেল হয়েছে, তৃতীয়ত সে জেলের ভেতর বসে এক কয়েদিকে হত্যা করেছে। সে যে এই খুনটা করেছে, তা নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছে।

–তা তো দেখেছে। প্রায় একশো জন কয়েদি আর ওয়ার্ডারের সামনে খুন করেছে সে।

–তাহলে ওর বাঁচার আশা আপনি ছেড়ে দিন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো দিকই ওর জন্য ভোলা নেই। যাকে ও খুন করেছে সে ওকে মারধোর করার ভয় দেখিয়েছিল, অথবা মারতে এসেছিল। সে ক্ষেত্রে আব্রাহাম জেলের ওয়ার্ডারদের ডেকে সাহায্য চাইতে পারত। তা না করে সে বোকামি করে বসল। আইন নিজের হাতে তুলে নিল। পৃথিবীতে এমন কোনো আদালত নেই, যেখানকার জুরীরা ওকে নির্দোষ বলবে।

জানি, তবুও ও একজন মানুষ। তুমি কি একবার ওর সঙ্গে কথা বলবে?

–বেশ, আপনার কথা আমি রাখব। ওর সঙ্গে দেখা করব। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেনিফার বলল, তবে এই মামলার ফলাফল কী হবে, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না আমি।

-তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। খুব জানাজানি হোক এটা তুমি চাও না।

.

হাডসন নদীর পূর্ব পারে ম্যানহাটান শহর। সেখান থেকে তিরিশ মাইল ভেতরে সিং সিং জেলখানা। এখানেই আব্রাহাম উইলসন জেল খাটছে। জেলে কোনো কয়েদির সঙ্গে দেখা করতে গেলে আগে থেকে সহকারী ওয়ার্ডেনের কাছে আবেদন করতে হয়। জেনিফার তাই টেলিফোনে ওই জেলের সহকারী ওয়ার্ডেনের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

জেলের বাইরে মূল ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল জেনিফার। কলিংবেলে হাত রাখল। মস্ত বড়ো গেট খুলে প্রহরী বেরিয়ে এল। জেনিফার ভেতরে ঢুকল। দর্শন প্রার্থীদের তালিকায় জেনিফারের নাম আছে কিনা মিলিয়ে দেখা হল। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল সহকারী ওয়ার্ডেন হাওয়ার্ড প্যাটারসনের কাছে। বিশাল চেহারা। সামরিক রীতি অনুযায়ী চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। মেচেতার দাগে মুখ ভরা।

–আপনাকে আমি টেলিফোনে কথা বলেছি। আমার পরিচয় আপনি জেনেছেন। জেনিফার বলল, আব্রাহাম উইলসন সম্পর্কে আপনি কী জানেন বলুন।

কিছু মনে করবেন না, ওর প্রতি আমার কোনো দরদ নেই। সামনে পড়ে আছে। আব্রাহাম উইলসনের কাগজপত্র। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্যাটারসন বলতে থাকল, জীবনের বেশীর ভাগ সময় সে জেলের মধ্যে কাটিয়েছে। ওর কীর্তিকলাপের ইয়ত্তা নেই। এগারো বছর বয়সে সে প্রথম অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছিল। চুরি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। এর দু-বছর বাদে ছিনতাই করতে গিয়ে আবার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। পনেরো বছর বয়সে ধর্ষণের অভিযোগে ওর জেল হয়েছিল। আঠারো বছর বয়স থেকে বেশ্যাদের দালাল হয়ে কাজ করছিল। এক বেশ্যাকে এমন পিটিয়ে ছিল, যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। সেই অভিযোগে ওর জেল হল। ওর কী গুণের শেষ আছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ এবং অবশেষে খুন

আমি একবার আব্রাহাম উইলসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি কি

–নিশ্চয়ই অনুমতি পাবেন। হাওয়ার্ড প্যাটারসন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তবে আপনি একটা কথা জেনে রাখুন, একশো কুড়িজন লোক ওর ওই খুনের প্রত্যক্ষদর্শী, আপনি শুধু শুধু ওর জন্য সময় খরচ করছেন।

আব্রাহাম উইলসন–আলকাতরার মতো কালো গায়ের রং, ছুরির দাগ মুখটাকে ফালা ফালা করে দিয়েছে। নাকের হাড় ভাঙা। কুতকুতে ছোটো দুটি চোখ। ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ে তার। অসীম শক্তির অধিকারী। ছ-ফুট চার ইঞ্চি লম্বা। এমন বীভৎস চেহারার মানুষ জেনিফার আগে কখনও দেখেনি। যে কোনো সুস্থ মানুষের বুকে কাঁপন জাগাতে পারে।

একটা সেলে সে একাই ছিল। প্রহরী এসে তাকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে নিয়ে গেল। জেনিফার আর আব্রাহাম উইলসন মুখোমুখি বসল। অবশ্য তাদের মাঝখানে দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে মোটা ইস্পাতের জাল। একজন প্রহরী দুরে দাঁড়িয়ে আছে, আব্রাহামকে পাহারা দিচ্ছে।

জেনিফার তার পরিচয় দিয়ে বলল, ফাদার রায়ানের কথাতেই আমি এখানে এসেছি।

ফাদার রায়ানের নাম শুনেই আব্রাহাম তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। ফাদারকে উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য গালিগালাজ দিতে লাগল। এমন কী জেনিফারও বাদ পড়ল না। রাগে ঘেন্নায় জেনিফারের গা গুলিয়ে উঠল। সহকারী ওয়ার্ডেন ঠিকই বলেছেন, ওর সঙ্গে দেখা করা মানে সময় অপচয় করা।

তবু জেনিফার ধৈর্য হারাল না। একসময় কাজ হল। আব্রাহাম উইলসন খিস্তি দেওয়া বন্ধ করে বলল হ্যাঁ, আমিই সেই খুনী, যে ওই খানকির বাচ্চাটাকে খুন করেছে।

সে তো শুনেছি। কিন্তু খুন করার কারণ কী? জেনিফার জানতে চাইল।

–কেন খুন করব না? মস্ত বড় একটা রামদা নিয়ে ও আমাকে মারতে এসেছিল। ওকে খুন করে নিজে বেঁচেছি।

বাজে কথা রেখে সত্যি কথা বলল। জেনিফার গর্জে উঠল, জেলের মধ্যে রামদা কোথায় পাবে?

দূর হও? দূর হও এখান থেকে। চেঁচিয়ে বলতে লাগল আব্রাহাম। আমি বাজে কথা বলছি। তোমাকে কে ডেকেছে শুনি? আমি তো আসতে বলিনি। নিজেই আগ বাড়িয়ে এসেছে। আমার উপকার করবে। হুম। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, শোনো একটা কথা বলে দিই, আর কখনও এখানে আসবে না। আমাকে বিরক্ত করবে না। তোমার উপদেশ শোনার মতো আমার সময় নেই। প্রহরী নিয়ে চলে গেল।

জেনিফার হতাশ হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর কিছু করার নেই। কথা রেখেছে, এটুকু তো সে ফাদারকে বলতে পারবে।

আমরা এখানকার আপরাধীদের মানসিক দিক থেকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করে থাকি সবরকমভাবে। সহকারী ওয়ার্ডেন হাওয়ার্ড প্যাটারসন বলতে থাকল, কিন্তু আব্রাহাম উইলসন এ সবের বাইরে চলে গেছে। ওর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, বৈদ্যুতিক চেয়ার।

বাঃ, দারুণ প্রশংসনীয় যুক্তি। জেনিফার মনে মনে উচ্চারণ করল। সে জানতে চাইল, উইলসন বলল, ওকে নাকি রামদা নিয়ে তাড়া করেছিল বলে ও খুনটা করেছে। জেলের মধ্যে রামদা কোথা থেকে আসবে?

মিস পার্কার, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই জেলের মধ্যে মোট বারোশো চল্লিশজন কয়েদি আছে, তাদের মধ্যে অনেকেই এসব হাতিয়ার বানাতে জানে। আসুন, আমার সঙ্গে একটা জিনিস দেখুন।

করিডোর ধরে তারা দুজনে এগিয়ে গেল। একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তালা বন্ধ। দরজা খুলে হাওয়ার্ড ভেতরে ঢুকল জেনিফার তার পেছনে।

একটা বড়ো বাক্সের দিকে আঙুল তুলে হাওয়ার্ড বলল–এটার ভেতরে কয়েদিদের অনেক অস্ত্র থাকে।

বাক্সটা খুলে ফেলল হাওয়ার্ড। ডালা তুলে ধরল। জেনিফার তাকাল। আঁতকে উঠল। বলল–মি. প্যাটারসন, আমি আমার মক্কেল আব্রাহাম উইলসনের সঙ্গে আবার দেখা করতে আগ্রহী।

.

জেনিফার আবার এল সিং সিং জেলখানায়, ওয়ার্ডার আর কয়েদিদের সঙ্গে কথা বলল। সে জানতে চাইল, রেমন্ড থর্পের খুন হতে কেউ স্বচক্ষে দেখেছে কিনা।

একশো কুড়ি জন কয়েদি নিজের চোখে দেখেছিল ওই হত্যাকাণ্ড। কিন্তু কেউ তা স্বীকার করল না। এই খুনের সঙ্গে কেউ নিজেকে জড়াতে চাইল না। প্রত্যেক একটাই জবাব দিল, না, রেমন্ড থর্পকে খুন হতে দেখিনি।

.

আব্রাহামের মামলা নিয়ে জেনিফার তখন খুবই ব্যস্ত। এমন কী দুপুরে লাঞ্চ করার সময় নেই তার হাতে। আদালতের কফি কাউন্টার থেকে স্যান্ডউইচ এনে কোনোরকমে খিদে মেটাল। এর ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওজন কমে গেল সাঙ্ঘাতিক ভাবে। যখন তখন মাথা ঘুরছে। চোখে সরষের ফুল।

জেনিফারের স্বাস্থ্যের অবনতি দেখে কেনেথ বেইল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। আদালতের কাছেই ফোরলিনি রেস্তোরাঁ। সে প্রায় জোর করে জেনিফারকে সেখানে নিয়ে গেল লাঞ্চ খাওয়াতে। একটা বড়ো লাঞ্চের অর্ডার দিল।

–আপনি কি তিলে তিলে মরতে চান? কেনেথ বেইলি জানতে চাইল।

কখনো নয়।

–আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছেন?

না।

মরতে না চাইলে এই মামলাটা থেকে সরে আসুন।

কারণ?

কারণ এটা সামান্য মামলা নয়। খবরের কাগজগুলো ওৎ পেতে বসে আছে। কেনেথ বলতে থাকল, হাজার হাজার চোখ আপনার ওপর। এই মামলায় আসামীর হয়ে লড়তে গেলে আপনাকে নিয়ে নানারকম প্রচার শুরু হবে।

–কেনেথ, ভুলে যাবেন না, আমি একজন উকিল, আব্রাহাম উইলসন আমার মক্কেল। জেনিফার বলে চলল। মক্কেলের সুবিচার আমি আশা করি। আপনি আমাকে নিয়ে মোটেও দুশ্চিন্তা করবেন না। আর এ মামলা নিয়ে বেশী কথা বলবেন না।

তাই বুঝি? কেনেথ বলল, আপনি জানেন, এই মামলায় সরকারী উকিল কে?

না।

–রবার্ট ডি সিলভা।

.

পরপর তিনটি রাত বিনিদ্রার মধ্যে কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত জেনিফার একটা সিদ্ধান্তে এল। তার ওপর থেকে রবার্ট ডি সিলভার রাগ এখনও যায়নি, এটা সে ভালো মতোই জানে। আর এটাও সে জানে, এই মামলায় রবার্ট ডি সিলভা তার ওপর প্রতিশোধের পুরোনো জ্বালা মেটাতে চেষ্টার কোনো ফাঁক রাখবেন না। কিন্তু এর ফলে তার মক্কেল আব্রাহাম উইলসনের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হবে। একজন উকিল হয়ে মক্কেলের এই ক্ষতি সে কখনো করতে পারে না। একবছর নিজের বোকামির ফলে যে ভুল সে করেছিল, দ্বিতীয়বার সেটা সে ঘটতে দেবে না। সে ঠিক করল, আব্রাহাম উইলসনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হলে, তার সরে আসাই শ্রেয়। চোখের সামনে জেনিফারকে না দেখে রবার্ট ডি সিলভার রাগ তাহলে কিছুটা প্রশমিত হবে। আর উইলসনও কিছুটা সুবিচার পাবে। জেনিফার তাই স্থির করল, সে নিজে ডি সিলভার সঙ্গে দেখা করবে। তার সিদ্ধান্তের কথা জানাবে, এবং উইলসনের প্রতি তিনি যেন একটু সদয় হন, সে প্রার্থনাও জানাবে।

টেলিফোন করল সে। রবার্ট ডি সিলভার সঙ্গে দেখা করার দিন ঠিক করল।

নির্দিষ্ট দিনে লিওনার্দো স্ট্রিটের ফৌজদারী আদালত ভবনে জেনিফার এসে দাঁড়াল। সাত তলায় ডি সিলভার অফিস, জেনিফার দেখল দরজার গায়ে রবার্ট ডি সিলভার নাম জ্বলজ্বল করছে।

জেনিফার ভেতরে ঢুকল। পুরোনো সেক্রেটারী তার ডেস্কে বসে আছে।

-আমি জেনিফার পার্কার। মি: ডি সিলভার সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট ছিল।

–উনি ভেতরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি যান। বিশাল ঘর। ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি তখন চুরুট মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডেস্কের পেছনে। দুজন সহকারী ডেস্কের পেছনে। দুজন সহকারী বসে। সম্ভবত তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছিলেন। জেনিফারকে দেখে তার মুখের চোয়াল শক্ত হল।

আমার ধারণা ছিল, তুমি এ জীবনে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে না। ভয়ানক নিষ্ঠুর। গলা ডি সিলভার।

–আমি আপনার কাছে এসেছি।

–ভেবেছিলাম, লেজ গুটিয়ে শহর ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি। বেহায়া কোথাকার। বলো কী জন্য এসেছো?

দুটো চেয়ার খালি। ডি সিলভা তাকে বসতে পর্যন্ত বললেন না।

–আমার মক্কেল আব্রাহাম উইলসন সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই আমি।

রবার্ট ডি সিলভা জেনিফারকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল, তিনি যেন আব্রাহাম উইলসনের নাম জীবনে শোনেন নি।

খানিকবাদে বলে উঠলেন–ও ঘঁা, মনে পড়েছে। ওই কালো চামড়ার লোকটা, যে জেলের মধ্যেই এক কয়েদিকে খুন করেছে। তুমি ওর হয়ে সাওয়াল করছো তো? কোন অসুবিধা হবে না।

ডি সিলভার ইঙ্গিতে সহকারী দুজন ঘর ছেড়ে চলে গেল।

–এবার শুনি তোমার বক্তব্য।

–একটা আবেদন আছে আমার।

–তার মানে সন্ধি করতে চাইছো? তোমার চিন্তা কীসের? তুমি হলে প্রতিভাসম্পন্ন আইনজীবী। আব্রাহামকে নির্দোষ প্রমাণ করতে তোমার কোনো বেগ পেতে হবে না।

মি: ডি সিলভা। জেনিফার নরম স্বরে বলল, এটা একটা সাধারণ মামলা। এর মধ্যে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই।

–তুমি এসেছো, আমার সঙ্গে আপোস করতে। ডি সিলভা গর্জে উঠলেন, তুমি আমার জীবন, আমার উচ্চাশা, আমার ভবিষ্যৎ সবকিছু ধ্বংস করেছ। সাধ মেটেনি না? এখন এসেছে আপোস করতে নির্লজ্জ কোথাকার? বলিহারি তোমার সাহস, অভিনয়

ক্ষমতাকেও প্রশংসা করতে হয়। তুমি আমাকে চেনো না। একটা কথা জেনে রাখো, তোমার ওই কালোমানিককে আমি বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়েই ছাড়ব।

–মি: ডি সিলভা, জেনিফার মিনতি করল, এমনিতেই ও যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। আপনাকে বলতে এসেছি যে, এই মামলায় আমি থাকছি না। দয়া করে ওর কেসটা একটু হালকা করে দিন।

অসম্ভব। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ডি সিলভা। খুনের দায়ে উইলসন দোষী, তা প্রমাণিত হয়েছে। ওকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসতেই হবে।

জেনিফার এতক্ষণ নিজেকে সামলে রেখেছিল। আর সে পারছে না। সে বলল–মি: ডি সিলভা, আপনি একজন সরকারী উকিল, জুরী নন। উইলসন দোষী কী নির্দোষ, তা বিচার করবেন আদালতে উপস্থিত জুরীরা।

বাঃ দারুণ। তুমি একজন আইন বিশেষজ্ঞ, আমাকে শিক্ষা দিচ্ছো। খুব আনন্দের কথা। হা-হা করে বিশ্রী ভাবে হেসে উঠলেন ডি সিলভা।

আমরা কি আমাদের পুরোনো কথগুলো ভুলে যেতে পারি না?

–আজীবন তোমার ওপর আমার ঝাল থাকবে। ডি সিলভা বললেন, তোমার বন্ধু মাইকেল মোরেটিকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।

মামলা শুরু হতে আর তিনদিন বাকি। জেনিফার জানতে পেরেছে, এই মামলার বিচারক লরেন্স ওয়াল্ডম্যান। মাইকেল মোরেটির মামলাটি ওনার এজলাসেই উঠেছিল। আর উনি রবার্ট ডি সিলভার গলায় গলা মিলিয়ে জেনিফারকে বার থেকে বের করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

.

১৯৭০ সাল, সেপ্টেম্বর মাসের এক সোমবার।

আব্রাহাম উইলসনের মামলা শুরু হল।

জেনিফার নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে আব্রাহামকে ভদ্র করে তোলার চেষ্টা করেছে। সে পরেছে সাদা রঙের শার্ট, নীল রঙের স্যুট আর নীল রঙের টাই। এত সুন্দর পোশাক তার চেহারার বীভৎসতার কাছে পাত্তা পাচ্ছে না। জেনিফার খুব ভালো করেই জানে, ওই বীভৎস খুনী চেহারা কোনো বিচারক বা জুরীর সহানুভূতি লাভ করতে পারে না।

সরকারের পক্ষে সওয়াল শুরু হল। ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি ডি সিলভা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তার বক্তব্য পেশ করলেন–

মাননীয় ধর্মাবতার। কয়েক বছর আগে একটি মামলায় আব্রাহাম উইলসনকে দোষী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেখানে ছিল বারোজন জুরি। তার অপরাধ কী ছিল, সেকথা আমি আর উত্থাপন করার প্রয়োজন মনে করছি না। তবে একটা কথা বলব, আমাদের দেশের আইন রক্ষকদের ধারণা ছিল, ওই দাগী অপরাধীকে জেলের চার

দেওয়ালের মধ্যে। বন্দী রাখলে সে নিজেকে শুধরে নেবে। আর কোনো অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়াবে না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে ওই ধারণা ভুল বলে আজ প্রমাণিত হয়েছে। জেলের ভেতরে বন্দী থেকেও আব্রাহাম উইলসন তার স্বভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটায় নি। তাই রেমন্ড থর্প নামে এক আপাত নির্দোষ কয়েদিকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে সে। আব্রাহাম উইলসন এক নরপিশাচ। তাকে নর হত্যার অপরাধ থেকে বিরত করা উচিত। এরজন্য একটি মাত্র উপায় আছে। তা হল প্রাণদণ্ড। আব্রাহাম উইলসনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলে মৃত রেমন্ড থর্প বেঁচে উঠবে না আমরা জানি। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোনো নিরাপরাধকে ওর হাতে মরতে হবে না। এটাই সমাজের লাভ।

রবার্ট ডি সিলভা এবার ধীর পায়ে জুরীদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বলতে থাকলেন–এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিটি দোষী, না নির্দোষ তা বিচার করতে আশাকরি আপনাদের বেশী সময় লাগবে না। কথাটা বলার কারণ আছে। আব্রাহম উইলসন, যে লোকটা আসামীর টেবিলে বসে আছে, সে ঠান্ডা মাথায় একজনকে খুন করেছে, এমন কী, সে নিজের অপরাধের কথা স্বীকারও করেছে। তবে আব্রাহাম উইলসন যদি খুনের কথা স্বীকার না করত, তা হলেও বিচারের কোনো অসুবিধা হতো না। কেননা একশোর বেশী সাক্ষী আছে, যারা আব্রাহামকে খুন করতে দেখেছে নিজের চোখে।

ঠান্ডা মাথায় খুন কী, সেই ব্যাপারটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলছি। এমন অনেক খুন করার কথা জানা যায়, যার পেছনে উপলব্ধিকর যুক্তি থাকে। আগে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু বলি। মনে করুন, আপনার পরিবার কোনো দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। সে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে। তখন আপনি তাদের প্রাণরক্ষার তাগিদে নিজের হাতে বন্দুকের ট্রিগার টিপে দিলেন। অথবা ধরুন, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখলেন, একজন

আততায়ী খুন করার জন্য আপনার ওপর চড়াও হয়েছে। আপনি তাকে খুন করলেন। এসব ক্ষেত্রে আপনাকে মারাত্মক অপরাধী বলা যাবে না। কারণ প্রাণরক্ষার তাগিদে হঠাৎ মাথাগরম করে কাজটা করে ফেলেছেন। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় খুন, ডি সিলভার কণ্ঠস্বর আরও কঠিন শোনাল, টাকার জন্য, বেআইনি মাদকের জন্য, অথবা নিছক খুন করার আনন্দ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে যে খুন করা হয় তাকেই বল হয় ঠান্ডা মাথায় খুন। এক্ষেত্রে কোনো আবেগ বা অনুভূতির প্রয়োজন হয় না।

জেনিফার জুরীদের মুখের দিকে তাকাল। দেখল তারা মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে ডি সিলভার যুক্তিতে সায় দিচ্ছেন।

জেনিফার তার মক্কেল আব্রাহাম উইলসনকে বারবার সাবধান করে দিয়ে বলেছিল ভুলেও জুরীদের দিকে চোখ তুলে তাকাবে না।

কিন্তু আব্রহাম সে সাবধানবাণী বেমালুম ভুলে গিয়ে কটমটে চোখে জুরীদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আব্রাহাম। জেনিফার চাপা গলায় ডাকল।

কিন্তু হায়! জেনিফারের ডাক তার কানে গেল না। সে একইভাবে জুরীদের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাইবেলে উল্লেখ করা আছে, দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ। ডি সিলভা বলতে লাগলেন, সেসব প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাষ্ট্র ও জনগণ

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চায় না, তারা চায় ন্যায্য বিচার। আব্রাহাম উইলসন ঠান্ডা মাথায় রেমন্ড থর্পকে খুন করেছে, জনগণ সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ন্যায় বিচার প্রার্থনা করছে ধন্যবাদ।

এতক্ষণ ধরে জেনিফার সরকারী উকিল রবার্ট ডি সিলভার সওয়াল শুনছিল। মাঝে মাঝে তার শরীর কেঁপে উঠছিল। ডি সিলভা কোমর বেঁধেই এই লড়াইতে নেমেছেন। আব্রাহাম উইলসনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে উনি যে প্রকারান্তরে তার ওপর নিজের বহুদিনের পুরোনো ঘা শুকিয়ে নিতে চাইছেন সেটা বুঝতে দেরী হল না তার।

এবার জেনিফার সওয়াল করবে। উঠে দাঁড়াল সে মাননীয় ধর্মাবতার ও জুরীবৃন্দ আমরা সবাই জানি, আত্মরক্ষার অধিকার আমাদের প্রত্যেকের আছে। আব্রাহাম উইলসনকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যদি সে খুনটা না করত, তাহলে আজ তাকে আর এই আদালতে আপনারা দেখতে পেতেন না। কারণ সে নিজেই খুন হয়ে যেত। প্রত্যেকটি মানুষের জীবন রক্ষা করার অধিকার আছে, ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির সাথে আমিও এক মত। আব্রাহাম উইলসন নিজেকে বাঁচাতে গিয়েছিল। ফলে রেমন্ড থর্পের মৃত্যু হয়। রেমন্ড থর্প আব্রাহাম উইলসনকে খুন করার জন্য তেড়ে এসেছিল। এটা আমি প্রমাণ করতে পারি। এবার আমি সিং সিং জেলের সহকারী ওয়ার্ডেন হাওয়ার্ড প্যাটারসনকে আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি।

হাওয়ার্ড প্যাটারসন সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল। জেনিফার জেরা শুরু করল।

মি: প্যাটারসন, আপনাকে প্রথমদিকে এই আদালতে হাজির থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু আপনি আসেননি। শমন পেয়ে আপনি ছুটে এসেছেন। কেন এখানে আজ এসেছেন সেটা আদালতের সামনে বলুন।

–হ্যাঁ বলছি, প্যাটারসন বলল, আব্রাহাম উইলসনের মতো দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা যাতে জেলের মধ্যে ঠান্ডা থাকে, সেটা দেখা আমার কাজ। অথচ উইলসন এক নৃশংস খুনে। ঝামেলা আর অশান্তি ছাড়া ও কিছু জানে না।

মি. প্যাটারসন, ওকে কিন্তু ঝামেলা ও অশান্তির জন্য আদালতে আনা হয়নি। আপনার খেয়াল রাখা উচিত, ও যাবজ্জীবন সশ্রম করাদণ্ডে দণ্ডিত এক কয়েদি। অন্যায়ভারে যদি কোনো মানুষের ওপর খুনে অভিযোগ চাপানো হয়, তাহলে আপনি কি বিবেকের দংশনে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন না?

যদি অন্যায়ভাবে কারো বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। হাওয়ার্ড প্যাটারসন জবাব দিল।

–জেলের মধ্যে এর আগেও খুন খারাপি হয়েছে। আমি কি ঠিক বলছি মিঃ প্যাটারসন?

-হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বলেছেন আপনি, তবে কয়েক হাজার নরপশুদের একসঙ্গে রাখলে তাদের মধ্যে খুন করার স্পৃহা তো জাগতেই পারে। তাই না, বলুন?

-হ্যাঁ। আপনার জেলের ভেতর এমন ঘটনাও ঘটেছে যে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোনো কয়েদি খুন করতে বাধ্য হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করবেন না, মিঃ প্যাটারসন।

-হ্যাঁ, তা অবশ্য মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে এই জেলের ভেতর, মিস পার্কার।

–তাহলে এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিহত কয়েদী রেমন্ড থর্প আব্রাহাম উইলসনকে আক্রমণ করেছিল। আর তার হাত থেকে বাঁচার জন্য অন্য উপায় না পেয়ে আব্রাহাম উইলসন ওই কয়েদিকে খুন করেছে। খুব সহজভাবে বলা যায় আত্মরক্ষার অধিকার সব মানুষেরই আছে, আর তার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করা যায়। আব্রাহামও সেই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।

প্যাটারসন জেদী ছোটো ছেলের মতো উত্তর দিলেন–এটা কি করে সম্ভব?

জেনিফার রেগে গিয়ে জজ ওয়াল্ডম্যানকে বলল ধর্মাবতার, সাক্ষী আমাকে সাহায্য করছে না। দয়া করে আপনি ওকে বলুন উনি যেন আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেন।

জজ ওয়াল্ডম্যান অনুরোধের সুরে বললেন–উনি যেসব প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দিন। অযথা আদালতের সময় নষ্ট করবেন না।

-ঠিক আছে, ধর্মাবতার, আমি ওঁর সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি।

এবার জেনিফার প্যাটারসনের দিকে তাকিয়ে বলল–আপনার ওই বাক্সটা কোথায়? সেটা এনেছেন কি? যদি সঙ্গে থাকে তাহলে সেটা আদালতে পেশ করুন আপনি।

প্যাটারসন বললেন–এনেছি, তবে ওটা আমি এখুনিই পেশ করছি না, এই আদেশের আমি বিরুদ্ধাচরণ করছি।

জেনিফার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল–সে ব্যাপারটাতো আপনি নিজেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন প্রথমেই, তাহলে আবার ওটা দেখাতে আপত্তি করছেন কেন, মিঃ প্যাটারসন।

এবার বাধ্য হয়ে প্যাটারসন জেলের এক প্রহরীকে ইশারায় ডাকলেন। সে কাছে আসতে তাকে বাক্সটি আনতে বললেন। প্রহরীটি সঙ্গে সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করল। সে জেনিফারকে একটি কাঠের বাক্স এনে দিল।

বাক্সটা হাতে নিয়ে জেনিফার বলল–ধর্মাবতার আমি এই বাক্সটিকে সাক্ষ্য প্রমাণ এক্সিবিট-এ হিসেবে পেশ করছি।

রবার্ট ডি সিলভা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–এটা আবার কি? এতে কি আছে?

-একে যন্ত্রেরর বাক্স বলা হয়। সিং সিং জেলের কয়েদীরা এই নামকরণ করেছে। এর ভেতর প্রচুর হাতে তৈরী অস্ত্র আছে। এসব অস্ত্র সিং সিং জেলের কয়েদীরা নিজের হাতে তৈরী করেছে।

তিড়িং করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন রবার্ট ডি সিলভা। তিনি জোরালো স্বরে আপত্তি জানিয়ে বললেন–অবজেকশান। আমার মনে হয় আসামী পক্ষের উকিলের সাক্ষ্য গ্রহণের রীতিনীতি জানা নেই। এই যন্ত্রের বাক্সটি এমন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নয় যার মাধ্যমে মামলার কাজ ত্বরান্বিত হতে পারে।

মিস জেনিফার পার্কার একগুঁয়ের মতো বলল–এই বাক্সটিই মামলা পরিচালনার কাজে সাহায্য করবে। এটি প্রমাণ করবে যে...

–রাগে ডি সিলভার চোখ দুটি থেকে আগুন ঝরতে লাগল। তিনি নিজেকে সংযত করে বললেন–এই এক্সিবিট এই মামলায় মূল্যহীন। এটা কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না যা থেকে আসামী নির্দোষ প্রমাণিত হবে।

বিচারক মিঃ ওয়াল্ডম্যান মিঃ ডি সিলভাকে সমর্থন জানিয়ে বললেন–আপনার আপত্তির প্রাসঙ্গিকতা আছে, তাই আপনার আপত্তি বহাল রইল।

জেনিফার বুঝতে পারল বিচারকও ডি সিলভার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এমনকি জুরীবৃন্দেরও মত নেই যে সে এই ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করুক। তাই তারা সবাই মিলে জোট বেঁধে জেনিফারকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছেন। তবে একথাও সত্যি এই মামলার ক্ষেত্রে এই বাক্সটিই হবে অকাট্য প্রমাণ। এটিই তাকে এই মামলাতে জয়ী হতে সাহায্য করবে। এই বাক্সটি ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ আপাতত তার হাতে নেই। সে হেরে গেলে তার আসামীকেও হার স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ তার আসামী মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবে না।

জেনিফার পূর্ণোদ্যমে আবার বলতে শুরু করলধর্মাবতার, আমার স্থির বিশ্বাস এই মামলা পরিচালনার ব্যাপারে এই এক্সিবিট একটা মোক্ষম প্রমাণ। এর ভেতরের জিনিসগুলো দেখলে আমার কথার সত্যতা আপনি বুঝতে পারবেন।

বিচারক হাত তুলে মিস পার্কারকে থামিয়ে দিলেন। তিনি কণ্ঠস্বরে বিরক্তি এনে বললেন মিস পার্কার, আইন সম্পর্কে শিক্ষা বা জ্ঞান দেওয়ার মতো সময় বা ইচ্ছা এই আদালতের নেই। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির কথাও ফেলে দেবার নয়। আপনার উচিত আদালতে আসার আগে সাক্ষ্য গ্রহণের নিয়ম কানুন জেনে নেওয়া। যে লোকটিকে খুন করা হয়েছে সে সশস্ত্র বা নিরস্ত্র ছিল তা এই আদালতে নথীভুক্ত করা হয়নি। কাজেই এসব অস্ত্র এখানে গৌণ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

জেনিফার রাগ সংবরণ করতে না পেরে বলল–আমি দুঃখিত ধর্মাবতার, কেন যে আপনি এই প্রসঙ্গটাকে চাপা দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি বলছি, এই এক্সিবিটটি এই মামলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

বিচারক জেদের সঙ্গে বললেন–ব্যস, আপনি এবার থামুন মিস পার্কার। আপনি ইচ্ছে করলে একস্পেশন ফাইল করতে পারেন।

জেনিফার বলল–এখানে একস্পেশন ফাইল করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমার বক্তব্য এই যে আমার মক্কেলকে তার অধিকার প্রয়োগ করতে সহযোগিতা করুন।

মিস পার্কার, আপনি কিন্তু আদালত অবমাননা করছেন। এর দায় আপনার ওপর

–আমার বিরুদ্ধে আপনি যে কোনো চার্জ আনতে পারেন, আমার তাতে আপত্তি নেই। এই সাক্ষ্যটি পেশ করার মতো উপযুক্ত কারণ আছে, যা কি না ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মিঃ ডি সিলভার বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট।

জেনিফারের এই অতর্কিত আক্রমণে রবার্ট ডি সিলভা অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন–আপনি কি বলতে চাইছেন, মিস পার্কার?

–আমি বলতে চাইছি এই যে আপনি যে বক্তব্যটি এই আদালতে ব্যক্ত করেছেন তা আবার শুনলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। এবার জেনিফার ঘুরে দাঁড়লেন যেদিকে স্টেনোগ্রাফার বসে আছে সেদিকে। সে স্টেনোগ্রাফারের উদ্দেশ্যে বলল–যেখানে ডি সিলভা বলেছেন, কেন আব্রাহাম উইলসন খুন করতে প্রভাবিত হয়েছিল, তা আমরা কেউ জানি না..., এই জায়গা একবার পড়ে শোনান তো?

রবার্ট ডি সিলভা বললেন–ধর্মাবতার, আপনি এসব অনুমোদন করবেন না।

বিচারক রবার্ট ডি সিলভাকে থামিয়ে দিলেন। এরপর তিনি জেনিফারের উদ্দেশ্যে বললেন মিস পার্কার, আইন সম্পর্কে আদালতের সম্যক জ্ঞান আছে। তার জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। এই মামলার নিষ্পত্তি হলে আপনাকে আদালত অবমাননার অভিযোগে, অভিযুক্ত করা হবে। তবে এটা একটা খুনের মামলা তাই আপনার বক্তব্য আমি শুনতে রাজী আছি। এইবার তিনি স্টেনোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির বিবৃতিটা পড়ে শোনাতে অনুমতি দিলেন।

স্টেনোগ্রাফার পড়তে শুরু করল–কেন আব্রাহাম উইলসন ওই নিরীহ নিরস্ত্র কয়েদি রেমন্ড থর্পকে খুন করতে প্রভাবিত হয়েছিল তা আমরা কেউ জানি না...।

ব্যস এতেই চলবে, এই পর্যন্তই ঠিক আছে, ধন্যবাদ, জেনিফার আর পড়তে নিষেধ করল ওই স্টেনোগ্রাফারকে।

এবার ডি সিলভার উদ্দেশ্যে বলল–এই ছিল আপনার মূল বক্তব্য, তাই না মিঃ ডি সিলভা। এরপর বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলল ধর্মাবতার, আমার লার্নেড ফ্রেন্ডের বয়ান অনুযায়ী ধরে নিতে হবে যে নিহত কয়েদি রেমন্ড থর্প নিরস্ত্র ছিল। ওঁর এই বিবৃতিই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। ওঁর কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল যে সে কোনোভাবেই নিরস্ত্র ছিল না। তার হাতে ভয়ংকর কোনো মারণাস্ত্র ছিল, যার সাহায্যে ও যে কোনো লোককে খুনের ভয় দেখাতে পারে।

বিচারক ওয়াল্ডম্যান জেনিফারের এই মোক্ষম যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তিনি ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির দিকে তাকিয়ে বললেন মিস পার্কারের যুক্তি অবান্তর নয়। আপনি স্বয়ং ওঁকে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি মুখ খোলার মতো আর সাহস দেখালেন না।

বিচারক জেনিফারকে বললেন–আদালত এক্সিবিট-এ পেশ করার অনুমতি আপনাকে দিচ্ছে। আপনি এক্সিবিট-এ পেশ করতে পারেন।

বিচারককে ধন্যবাদ জানিয়ে জেনিফার জুরীদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল–মাননীয় জুরীবৃন্দ, এতদিন ধরে আপনাদের ভুল বোঝানো হয়েছিল। আপনারা সকলেই জানেন আমার মক্কেল আব্রাহাম উইলসন। তাকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আপনাদের বলা হয়েছে যে আব্রাহাম নৃশংসভাবে খুন করেছে সিং সিং জেলের আরেকজন কয়েদিকে, যার নাম রেমন্ড থর্প। ওই খুনের ছবিটি আপনাদের সামনে খুব সুস্পষ্ট ভাবে পরিবেশন করা হয়েছিল। আর আপনারাও তা বিশ্বাস করেছেন। কোনো কারণ ছাড়াই আব্রাহাম ওই খুনটি করে পরিকল্পিতভাবে। আচ্ছা আপনারা ভালো করে ভেবে দেখুন তো কোনো মানুষ বিনা কারণে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে কাউকে খুন করতে পারে? লোভ, ক্রোধ, কামনা মানুষকে খুন করার প্রবণতা যোগায়। এক্ষেত্রেও তেমন একটা উদ্দেশ্য বা কারণ নিশ্চয়ই ছিল। তাহল আত্মরক্ষা। একটু আগে সিং সিং জেলের সহকারী ওয়ার্ডেন সাক্ষ্য প্রদান কালে বলেছিলেন এর আগেও জেলের ভেতরে খুনোখুনির ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। এর থেকে কি নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না যে সিং সিং জেলের কয়েদিদের জিম্মায় মারাত্মক সব অস্ত্র আছে। এবং নিহত ওই কয়েদির হাতেও যে ওই রকম কোনো অস্ত্র থাকবে, এটা ভাবা আমাদের ভুল হবে না। ওই অস্ত্রের দ্বারাই সে এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত আসামী আব্রাহাম উইলসনকে আক্রমণ করেছে। এবং নিজেকে রক্ষা করার তাগিদ বোধেই আমার মক্কেল ওই কয়েদি রেমন্ড থর্পকে বাধ্য হয়েই খুন করেছে। যদি আপনারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন যে আব্রাহাম উইলসন বিনা প্ররোচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রেমন্ড থর্পকে খুন করেছে তাহলে আপনারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন। আমার হাতে এই যে বাক্সটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এর মধ্যে কতকগুলো মারাত্মক জিনিস আছে। সেগুলো আমি আপনাদের দেখাবো, সেগুলি দেখে আপনারা যদি কোনো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আসামীকে নির্দোষ বলে মনে করেন সেই সিদ্ধান্তও

আপনারা নিতে পারেন। এতটা বলে জেনিফার জুরীগণের মুখের দিকে তাকালো, তারা সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তার ওপর নজর রেখেছে।

বাক্সটার ঢাকা বন্ধ ছিল। সেটা ভীষণ ভারী, এটা এত ভারী যে এটা বহন করতে জেনিফারের খুব কষ্ট হচ্ছিল। সেসব তোয়াক্কা না করে এবং জুরি মহোদয়গণকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জেনিফার আবার বলতে শুরু করল।

–আপনারা একটা কথা ভুলবেন না, তাহল সিং সিং জেলের সহকারী ওয়ার্ডেন নিজে এই বাক্সটা এনেছেন। এর ভেতর যেসব অস্ত্র আছে তা ওই জেলের কয়েদিরা ব্যবহার করে থাকে। জেলের সুপার এইসব সংগ্রহ করেছেন তল্লাসী চালিয়ে।

বাক্সটা হাতে করে জেনিফার এগিয়ে এল জুরীদের দিকে। অতর্কিতে সে হোঁচট খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। তার হাতের বাক্সটিও হাত থেকে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ঢাকনা খুলে ভেতরের সব জিনিস বেরিয়ে এল। সেগুলি আদালত চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল।

এই অনভিপ্রেত ঘটনায় আদালতে উপস্থিত সবাই হতচকিত হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবাই আত্মস্থ হয়ে যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জুরীরা, দর্শকরা সবাই ছুটে এলেন এই অত্যাশ্চর্য দৃশ্যটি দেখার জন্য। এমন কি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকরাও বাদ গেলেন না। তারাও তাদের চক্ষুকর্ণ উন্মুক্ত করে সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন।

মেঝের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ত্রসম্ভারের মধ্যে কি নেই! আছে জেলের ভেতর থাকা কয়েদিদের নিজেদের হাতে তৈরী মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র। সেই সব অস্ত্র বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন মাপের, সংখ্যাও কম নয়। সে এক বিরাট তালিকা, যেমন হাতে তৈরী রাম দা, ছুরি, কাঁচি, ছররা বন্দুক, কুঠার, কুড়ুল। সব কটায় আবার কাঠের হাতল লাগানো আর ধারালো। এসবের সাহায্যে যে কোনো সময়ে যে কোনো মানুষকে খুন করা সম্ভব।

এতসব ভয়ংকর ধারালো অস্ত্র দেখে সবার চোখ ছানাবড়া। কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, আবার আদালতের ভেতর গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। বিচারক ওয়াল্ডম্যান অধৈর্য হয়ে তার বেঞ্চে বার বার হাতুড়ি ঠুকতে লাগলেন। তিনি ভিড় সরানোর চেষ্টা করলেন।

–একজন পেয়াদা জেনিফারকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এল। কিন্তু জেনিফারের কাছ থেকে বাধা পাওয়ায় সে চলে গেল। ততক্ষণে জেনিফার মেঝেতে উঠে বসেছে। সে একটি একটি করে অস্ত্রগুলো তুলে বিচারককে দেখাতে লাগল। তারপর তা মিলিতভাবে আবার বাক্সে রাখতে লাগল। সব কটি অস্ত্র তুলতে তুলতে মিনিট দশেক সময় লেগে গেল তার। এদিকে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি নিজের মনে রাগে গরজাতে লাগলেন।

এবার জেনিফার উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি পড়ল সাক্ষীর কাঠগড়ার দিকে। সে দেখতে পেল এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ প্যাটারসন, সে ডি সিলভাকে ইশারা করে বুঝিয়ে দিল ইচ্ছা করলে তিনিও মিঃ প্যাটারসনকে জেরা করতে পারেন।

ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা বহুদিন ধরে এই আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই বিষয়টি তিনি খুব ভালোভাবেই রপ্ত করেছেন। তাই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলেন যে এত কাণ্ডের পর আর জেরা করে কোনো লাভ হবে না। তাছাড়া এই মামলার ফল কি নির্ধারিত হবে তা তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছিলেন। জেনিফার তার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে ডি সিলভাকে ঘায়েল করে ফেলেছে। তার এই অস্ত্রের মাধ্যমে সে মামলাটিরও দফারফা করে ফেলেছে। এখন শত চেষ্টা করলেও তিনি সেই ক্ষতি পূরণ করতে পারবেন না। তাই তিনি নিরুপায় হয়ে বিচারককে বললেন– আমার জেরা করার আর প্রয়োজন নেই।

জেনিফার স্মিত হেসে আসামী আব্রাহাম উইলসনকে জেরা করার জন্য বিচারকের কাছে অনুমতি চাইল। বিচারক সম্মতি জানালে জেনিফার আসামীকে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে বলল।

.

আসামী আব্রাহাম উইলসন কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল। আবার সওয়াল-জবাব পর্ব শুরু হল।

–আপনার নাম?

আব্রাহাম উইলসন।

–মিঃ উইলসন, আপনি কি রেমন্ড থর্পকে খুন করেছেন?

হ্যাঁ, মাডাম।

–কেন করেছেন এবং তার উদ্দেশ্য কি কোন কথা গোপন না করে আদালতের সমক্ষে জানান।

–হুজুর ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিল, তাই ওকে আমি খুন করেছি।

জেনিফার বাক্সটি আবার খুলল। তার ভেতর থেকে সে দুটি জিনিস বের করল। একটি ভারী চিমটে ও একটি ধারালো রামদা। উইলসনের সামনে রামদাটা তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল সে–এটাই কি সেই রামদা যার সাহায্যে রেমন্ড থর্প আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল?

সরকারী উকিল মিঃ ডি সিলভা গর্জে উঠলেন–অবজেকশন মী লর্ড, কোন অস্ত্র নিহত কয়েদীর হাতে ছিল তা আসামী জানবে কি করে?

ডি সিলভার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে জেনিফার আবার বলতে লাগল–যে অস্ত্র দিয়ে আপনাকে রেমন্ড থর্প আক্রমণ করেছিল, সেটা কি এটা?

-হ্যাঁ ম্যাডাম।

–আর এই চিমটেটাকেও আপনি ওই নিহত কয়েদীর হাতে দেখতে পেয়েছিলেন?

–হ্যাঁ ম্যাডাম।

এর আগে কি আপনি রেমন্ড থর্পের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন?

–হ্যাঁ ম্যাডাম।

তাহলে কি ধরে নেবো, এই অস্ত্র দুটো হাতে নিয়ে আপনার দিকে ও ছুটে এসেছিল, আর তাই আপনি আত্মরক্ষার জন্য ওকে খুন করে বসলেন?

-হ্যাঁ ম্যাডাম, ঠিক তাই। জেনিফার বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলল–ধর্মাবতার আমার জেরা শেষ হয়ে গেছে। এখন ইচ্ছে করলে আমার লানেড ফ্রেন্ড মিঃ ডি সিলভা আসামীকে জেরা করতে পারেন।

বিচারক ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভাকে জেরা করার অনুমতি দিলেন। মিঃ ডি সিলভা এক পা এক পা করে এগিয়ে গেলেন কাঠগড়ার দিকে। তিনি আব্রাহাম উইলসনকে জিজ্ঞাসা করলেন–আচ্ছা, এটাই কি আপনার প্রথম খুন নাকি এর আগেও খুন করেছন?

-আমি অন্যায় করেছি, এখন তা শুধরাতে চাইছি।

–হ্যাঁ বা না এক কথায় উত্তর দিন।

–হ্যাঁ।

–আচ্ছা বলুন তো এ পর্যন্ত আপনি কতজনকে খুন করেছেন?

দুজনকে।

ব্যস, মাত্র দুজন? নিজেকে কি মনে করো? ভগবান নাকি? ইচ্ছে হলেই এক একজন মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলো! এত ক্ষমতা থাকাও তো আবার গর্বের বিষয়, তাই না?

আব্রাহাম উইলসন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। নিজেকে আর সামলাতে পারলো না। সে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ডি সিলভাকে নোংরা ভাষায় গালি দিল।

মি. ডি সিলভাও কম উত্তেজিত হয়ে পড়েন নি। তিনি দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করে বললেন–অনেক বীরত্ব দেখিয়েছে, এখন থামো। আচ্ছা রেমন্ড থর্পকে খুন করার সময় কি তুমি এতটাই উদ্ধত হয়ে উঠেছিলে?

–আপনি ভুল বলছেন, ও নিজেই আমাকে খুন করতে এসেছিল।

তখন ডি সিলভা সেই রামদা ও চিমটে নিয়ে কাঠগড়ার কাছাকাছি গিয়ে আব্রাহামের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। তাকে সেটি দেখিয়ে বললেন–এগুলো নিয়ে তোমায় খুন করতে এসেছিল! তুমি যতটা ভয় পেয়েছিলে ততটা মারাত্মক কিন্তু এই অস্ত্রগুলো নয়। এগুলো দিয়ে মারলে হয়তো মাথা বা শরীরের কোনো অংশ ফুলে যেতো। আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি এসবের আঘাতে তোমার প্রাণ সংশয় ঘটতো না। আচ্ছা, তোমার কি ধারণা এই চিমটে দিয়ে মানুষের কতটা ক্ষতি করা যায়?

–এই চিমটের সাহায্যে মানুষের অণ্ডকোষ চেপে ধরে তাকে মেরে ফেলা সম্ভব, আব্রাহাম উইলসন ঝাঝালো স্বরে উত্তর দিলেন।

.

জেরা পর্ব শেষ। এবার জুরীরা সিদ্ধান্ত নেবেন। আসামী দোষী না নির্দোষ তা ঘোষণা করবেন তারা। তাই জুরীরা আদালত কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে গেছেন পরামর্শ নিতে। সেও প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। রবার্ট ডি সিলভা ও তার সহযোগীরাও আদালত ছেড়ে বাইরে এখন। কেবল মাত্র জেনিফার পার্কার অনড় অটল হয়ে নিজের আসনটিতে একলা বসে আছে। সে মানসিক ও শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত। সে মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে। তাই চেয়ার ছেড়ে উঠবার মতো ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনোটাই এখন আর অবশিষ্ট নেই।

এখন আদালত কক্ষ একেবারে শূন্য। এমন সময় কেন বেইলি জেনিফার পার্কারের কাছে এলেন। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন–জেনিফার কিছু খাবে কি? কিছু না হলেও অন্তত এক কাপ কফি খাও।

জেনিফার শান্তস্বরে উত্তর দিলনা, এখন আর কিছু ভালো লাগছে না।

জেনিফার এই মামলাটা নিয়ে চিন্তায় মগ্ন। সে ভাবছিল যা হবার তা তো হয়ে গেছে। একজন মানুষকে রক্ষা করার জন্য তার যা করা কর্তব্য করেছে। এবার ভগবানই একমাত্র ভরসা। তিনি বাঁচালে তবেই আসামী বাঁচবে। তার জয় হবে। সে দুচোখ বন্ধ করে ভগবানের প্রার্থনা করতে লাগল। ভয় ক্রমশ তার মনের ভেতর চেপে বসেছে। সে

বেশ বুঝতে পারছে, জুরীদের সিদ্ধান্ত ঘোষণার ওপর তার ও আব্রাহাম উইলসনের জীবন নির্ভর করছে। তারা আব্রাহামের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেবেন। তাকেও দোষী সাব্যস্ত করবেন।

জুরীরা ফিরে এলেন। তাদের সবার মুখ কালো মেঘে ঢাকা। জেনিফার তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হল। তার হৃদস্পন্দন দ্রুত বেগে বইতে লাগল। তার সারা শরীর যেন হিম শীতল হয়ে গেছে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়েছে। সে তাদের মুখ দেখে বুঝতে পারছে যে তারা আসামীর অপরাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। তারই জন্য একজন নির্দোষ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হল। তার রাগে ক্ষোভে দুঃখে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। সে ভাবছে এই মামলা নেওয়া উচিত হয়নি। রাবার্ট ডি সিলভার মতো একজন পাকা অভিজ্ঞ উকিলের সঙ্গে লড়াই করা তার বোকামি হয়েছে। তাছাড়া এই মামলায় যে তার জয় হবে এই ধারণা হল কিভাবে? তার ইচ্ছে করছিল আব্রাহাম উইলসনের পক্ষে অন্য উকিল দিয়ে এই মামলাটা আবার নতুন করে সাজানোর। কিন্তু অতশত করার মতো সময় আর নেই জেনিফারের হাতে।

হঠাৎ জেনিফারের দৃষ্টি পড়ল কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা আব্রাহাম উইলসনের ওপর। সে এখনও নিশ্চল পাথর প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

এতক্ষণে জজ ওয়াল্ডম্যান মুখ খুললেন, তিনি জুরীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন আপনারা কি সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন?

-হ্যাঁ, ধর্মাবতার।

জজ ইশারা করলেন তার পেশকারকে। সে ছুটে গেল জুরী চারজনের দিকে। জুরীরা তার হাতে একটি কাগজ দিলেন। পেশকার তা নিয়ে জজের হাতে দিল।

এদিকে জেনিফারের দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তার মনে হচ্ছে এখুনিই বুঝি হৃৎপিন্ডটা স্তব্ধ হয়ে যাবে।

জজ ওয়াল্ডম্যান ওই কাগজটির ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর আদালত কক্ষে উপস্থিত সমস্ত মানুষদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। সব শেষে তার নজর গিয়ে পড়ল আসামী আব্রাহাম উইলসনের ওপর, তাকে দেখে তার মনে হল সে যেন একটা প্রাণহীন দেহে পরিণত হয়েছে। ইতিপূর্বে কে তার শাস্তি নির্ধারণ করে ফেলেছে।

বিচারক ওয়াল্ডম্যান আসামীর দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে ধীরে ধীরে বললেন–এতক্ষণ। ধরে জুরীগণ সমস্ত সাক্ষীদের বয়ান ও সাক্ষ্য প্রমাণগুলি বিচার বিশ্লেষণ করলেন। তারা সকলেই একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন। আমিও তাদের সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করছি। তাই। আমি ঘোষণা করছি যে আসামী আব্রাহাম উইলসন সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

জেনিফার জুরীগণের রায় শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। সে মনে মনে ভাবছে, ঠিক শুনেছে তো? উইলসনের অবস্থাও তথৈবচ। কয়েক মুহূর্তের জন্য আদালতের ভেতর পিন পড়লেও শোনা যাব এমন স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। তারপরেই দর্শকরা উল্লসিত হয়ে চিৎকার করে উঠল। উইলসন জেনিফারের দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসিতে প্রাণ ফিরে পাওয়ার আনন্দের পরশ আছে। ছুটে গেল জেনিফার উইলসনের কাছে। বিরাট আকৃতির উইলসন তাকে দেখে নিচু হল এবং বিশাল দুটি হাতে তাকে জড়িয়ে

ধরল। জেনিফার আর চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। শ্রাবণের ধারার মতো তার দুচোখ থেকে আনন্দাশ্রু বেরিয়ে এল। সেই মুহূর্তে সাংবাদিকরাও সেখানে এসে হাজির। তারা এমন একটি দৃশ্যকে নিজেদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত করার আশায় উন্মুখ হয়ে উঠল। তারা জেনিফারকে একের পর এক প্রশ্ন করে করে উত্যক্ত করে তুলল।

জেনিফার ওইসব সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তর দিল না। এইসব সাংবাদিকরা এখানে এসেছিল কিভাবে একজন নিরপরাধ মানুষকে অযথা হয়রানি করা হয়, কিভাবে মিথ্যে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তা দেখতে। উইলসনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলে তাহলে পরিস্থিতি কি রকম হত তা জেনিফারের কল্পনার অতীত। অবশ্য এখন সে আর ওসব ভাবতে পারছে না। সে দ্রুত হাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় ফাইলপত্র একটা ব্রীফকেসে গুছিয়ে নিল।

এমন সময় একটা পেয়াদা এসে খবর দিল- মিস পার্কার, জজ ওয়াল্ডম্যান আপনাকে ডাকছেন, আপনি এখুনিই ওঁর কামরায় যান। সঙ্গে সঙ্গে জেনিফারের মনে পড়ে গেল যে জজ তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনবেন বলেছিলেন। খুশী ও আনন্দের আতিশয্যে এতক্ষণ সে ওসব কথা ভুলে গিয়েছিল। তবে এখন আর সে ওই অভিযোগকে পরোয়া করে না। তার কাছে এই মুহূর্তে একটা বিষয়ই বিশেষভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে, তাহল, সে যে শেষপর্যন্ত আব্রাহাম উইলসনকে রক্ষা করতে পেরেছে এটাই।

সে এক মুহূর্তের জন্য ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির টেবিলের দিকে তাকাল। দেখতে পেল রবার্ট ডি সিলভা উত্তেজিতভাবে দরকারী কাগজপত্রগুলো ব্রীফকেসে ভরছেন। দুজনের চোখাচোখি হল। কিন্তু কেউ কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলল না।

জেনিফার পার্কার ধীর পায়ে জজ ওয়াল্ডম্যান-এর খাস কামরায় এসে উপস্থিত হল।

জজ ওয়াল্ডম্যান তাকে দেখে ভাবলেশহীনভাবে বলতে শুরু করলেন–অপমান আর ঔদ্ধত্য এ দুটো একটাও আমি এজলাসের ভেতর বরদাস্ত করবে না। তবে একথা শুধু আপনার ক্ষেত্রেই নয়, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

জেনিফার কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

আজ দুপুরে আপনি জেরা করার সময় আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। এমন কি নিজের এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেছেন। আমি বুঝতে পারছি, একটি মানুষের জীবন রক্ষার দায়িত্ব আপনার ওপর বর্তেছে। আপনার বক্তব্যের ওপর আসামী দোষী না নির্দোষী তা নির্ভর করছে। তাই এবারের মতো আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। আদালত অবমাননার অভিযোগে আমি আর আপনাকে অভিযুক্ত করবো না।

অনেক কষ্টে জেনিফারের মুখ থেকে বেরিয়ে এল শুধু একটি কথা-ধন্যবাদ ধর্মাবতার।

জজ ওয়াল্ডম্যান আবার বলতে লাগলেন–যে কোনো মামলার রায় দেবার পরে আমি বুঝতে পারি ন্যায়সঙ্গত বিচার করেছি কি না। কিন্তু আব্রাহাম উইলসনের ক্ষেত্রে আমি

এখনও স্থির করতে পারিনি কিছু। আমি সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। জানি না এক্ষেত্রে আমি যে রায় দিয়েছি সেটা সত্যিই ন্যায়বিচার হয়েছে কিনা।

জেনিফার পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে।

ব্যস, এই কথাগুলো জানানোর জন্য আমি আপনাকে ডেকেছিলাম, এবার আপনি আসতে পারেন।

.

সেদিন সব কটি সান্ধ্য পত্রিকায় জেনিফার, রবার্ট ডি সিলভা ও আব্রাহাম উইলসনের ছবি ছাপা হল। টেলিভিশনের প্রত্যেকটি নিউজ চ্যানেলগুলো জেনিফারের জয়লাভের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবাই তার কৃতিত্বের তারিফ করছিল। তাকে সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছিল। আজ জেনিফারও নিজের জয়লাভে ভীষণ খুশী। বিজয়িনীর গর্বে গর্বিত আজ সে, নিজের জয়লাভের খবর সে উপভোগ করছিল।

লাচেট রেস্তোরাঁ। সেখানে কেন বেইলির আমন্ত্রণে জেনিফার এসেছে ডিনার খেতে। মিঃ বেইলির উদ্দেশ্য ছিল জেনিফারের এই জয়লাভকে চিরস্মরণীয় করে রাখার। সেখানের প্রতিটি স্টাফ ইতিমধ্যেই জেনিফারের জয়লাভের খবর দৈনিক পত্রিকা ও টেলিভিশন মারফত পেয়ে গেছে। তারা জেনিফারকে চিনতে পারল। তারা নানাভাবে জেনিফারকে অভিনন্দিত করতে লাগল। তাদের এই আন্তরিকতার কথা জীবনে জেনিফার ভুলতে পারবে না।

কে একজন এক বোতল দামী সুস্বাদু ওয়াইন উপহার পাঠালো জেনিফারকে। জেনিফার তৃষ্ণার্ত ছিল। তাই পর পর তিন গ্লাস ওয়াইন ঢক ঢক করে গিলে ফেলল এক নিঃশ্বাসে।

এবার জেনিফার বলতে শুরু করল–কেন, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, আর ওই রাবট ডি সিলভা আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রু। ইচ্ছে করেই আক্রোশবশতঃ ডি সিলভার নামটা বিকৃতভাবে উচ্চারণ করল সে।

–কেন, এরকম মনে হওয়ার কারণ কি? কেন বলল।

উনি আমায় ঘেন্না করেন, ভীষণ ঘেন্না করেন। উনি আমাকে বার থেকে বের করে দেবেন বলেছিলেন। শেষ অব্দি কি হল? ওঁর আস্ফালন বিফলে গেল। উনি কিছুই করতে পারলেন না, কি বল কেন?

রাত তখন দুটো। জেনিফার সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে, ভালোভাবে হাঁটার ক্ষমতা সেই সময় লোপ পেয়েছে। কেন বেইলি তাকে ধরে নিয়ে এল তার অ্যাপার্টমেন্টে। পরদিন ঘুম ভাঙলো টেলিফোনের কর্কশ আওয়াজে। কোনরকমে চোখ দুটো খুলল সে। ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজে।

–জেনিফার শুয়ে শুয়েই রিসিভারটা কানে তুলে নিল, ও প্রান্ত থেকে কেনের গলা ভেসে এল–শীগগির চলে এসো জেনিফার। এখানে যে সব কাণ্ড কারখানা শুরু হয়েছে, আমার একার দ্বারা সামলানো সম্ভব নয়।

–ঠিক আছে, আমি ঘটাখানেক বাদে যাচ্ছি। ততক্ষণ তুমি সামলাও, কেন।

এক ঘণ্টা বাদে জেনিফার অফিসে গিয়ে পৌঁছল। সে দেখল দুটো টেলিফোনই একসঙ্গে বেজে চলেছে। তাকে দেখে কেন ব্যস্ত হয়ে বলল–ওঃ তুমি এসে গেছো! একের পর এক ফোন আসছে। আমার মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা হয়েছে, সবাই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, রেডিও, টিভি ছাড়াও বড় বড় আইন প্রতিষ্ঠানগুলি জেনিফারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক। দেশের প্রত্যেকটি গণমাধ্যমগুলি ইন ডেপথ। স্টোরি করার জন্য তার সাক্ষাৎকার নিতে চাইছে। রাতারাতি জেনিফার খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেল। এছাড়া আরও কয়েকটি জায়গা থেকে টেলিফোন আসছিল, যারা এক সময় জেনিফারকে উপেক্ষা করেছিল, চাকরী দেয়নি, সেইসব ল সংস্থাগুলিও তার সাক্ষাৎ প্রার্থী। তারা জানতে চাইছে কবে কখন জেনিফারের সঙ্গে তারা দেখা করবে।

.

এদিকে রবার্ট ডি সিলভার অবস্থা তখন আহত বাঘের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে। রাগে। ও হতাশায় তার চোখমুখ থমথম করছে। তিনি একজন সহকারীকে ডেকে পাঠালেন। তাকে ঝাঝালো গলায় আদেশ করলেন-জেনিফার পার্কারের নামে একটা কনফিডেনসিয়াল ফাইল প্রস্তুত করো। ওর যেখানে যত মক্কেল আছে তাদের নাম, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান কর। ও সব বিস্তারিতভাবে আমাকে জানাও।

সহকারীটি বিনম্র সুরে বলল হা স্যার।

.

বছর খানেক আগের ঘটনা। নিউইয়র্কের পূর্বাঞ্চলের অন্যতম মাফিয়া ডন ছিলেন অ্যান্টোনিও গ্র্যানেলি। তার জামাই হলেন মাইকেল মোরেটি। তিনি শ্বশুরের সবকটি ব্যবসার কর্তৃত্ব অর্জন করলেন। তিনিই সেই সময় মাফিয়া পরিবারের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেছিলেন। গ্র্যানেলির উকিল টমাস কোলফ্যাক্স মাইকেলকে একেবারেই পছন্দ করতেন

। তাই যখন মাইকেলকে র‍্যামোস ভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হল এবং গ্রেপ্তার করা হল, তখন টমাস কোলফ্যাক্স ভীষণ খুশী হয়েছিলেন। তার চোখেমুখে পরম তৃপ্তির হাসি দেখা দিয়েছিল। নিক মিটো, সালভাতের ফিওরে ও জোসেফ কেলেলা, এই তিনজন কুখ্যাত অপরাধীকে মাইকেল ওরফে মাইক নিজের দলভুক্ত করেছিলেন। এই ব্যাপারটিও টমাস কোলফ্যাক্স বরদাস্ত করতে পারেন নি। আসলে গ্র্যানেলি পরিবারে মাইকেলের আধিপত্য বিস্তারলাভ করুক এটা কখনই চাননি টমাস কোলফ্যাক্স। এদিকে মাইকেল মোরেটিও টমাস কোলফ্যাক্স-এর বিরুদ্ধাচরণ করতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। আবার । টমাসকে যতটা প্রাধান্য দেন ঠিক ততখানিই টমাস মাইকেলের কাছে গুরুত্বহীন।

র‍্যামোস ভাইদের খুন করার মামলা চলছিল। আর সেই মামলায় মাইকের প্রধান অনুচর ক্যামিলল স্টেলা রাজসাক্ষী হতে রাজী হয়েছিল, এ খবর শুনে টমাস কোলফ্যাক্স ভীষণ

উৎফুল্ন হয়েছিলেন। তিনি জানতেন ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সলভার মতো উঁদে উকিলের হাত থেকে মাইকের নিস্তার নেই। ডি সিলভার কাছে মাইকের বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তা এক একটি মারণাস্ত্র হয়ে মাইককে বিধবে। তার সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। রবার্ট ডি সিলভা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন ওইসব মোক্ষম সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে। তাই প্রতিপক্ষ হয়েও টমাস কোলফ্যাক্স কায়মনঃবাক্যে প্রার্থনা করেছিলেন, যেন তিনি এই মামলায় হেরে যান এবং রবার্ট ডি সিলভা বিজয়ী হন।

মামলার গতি প্রকৃতি ক্রমশ আইকেলকে ভাবিয়ে তুলছে। তিনি নিশ্চিত এই মামলা থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। তাকে হারতেই হবে এবং মৃত্যু তার শিরোধার্য। অনেক চিন্তা ভাবনা করে মাইক একটা উপায় বের করেছিলেন। রাত চারটে, তার বিশ্বস্ত সাগরেদ জোসেফ কেলেলাকে ফোন করেছিলেন তিনি।

কোনোরকম ভনিতা না করে মাইক সোজা সাপটা ভাষায় বললেন–আগামী সপ্তাহে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নির অফিসে কয়েকজন নবনিযুক্ত উকিল শপথ গ্রহণ করবেন। তারা সবাই রাবর্ট ডি সিলভার সহকারী হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। তাদের সবার নামধাম আমার চাই। তুমি পাত্তা লাগাও।

একসপ্তাহ পরে মাইকেল মোরেটি এলেন আদালতে। তিনি সরকারী উকিলের সেইসব নতুন সহকারীদের মুখ ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। অবশেষে চোখ গিয়ে পড়ল জেনিফার পার্কারের দিকে। তাকেই তাঁর কাজের উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল, লাঞ্চের সময় মাইকের এক বিশ্বস্ত অনুচর একটি মুখবন্ধ বড় খাম দিয়েছিল জেনিফারকে। তাকে এও

বলা হয়েছিল ওই খামটা কোথায় কাকে দিতে হবে। ওই লোকটির নির্দেশে জেনিফার পার্কার রাজসাক্ষী ক্যামিলো স্টেলার হাতে ওই খামটি পৌঁছে দিয়েছিল। ফলে ঘটল বিপত্তি। মাইকেল মোরেটির মামলা তো খারিজ হয়ে গেল, উপরন্তু জেনিফার পড়ল সমস্যায়।

এসব বছর খানেক আগের ঘটনা। কেউ আর এসব কথা মনে রাখেনি। কিন্তু আজ এক বছর পর আবার মাইকেলের স্মৃতিপটে জেনিফার পার্কারের মুখটা ভেসে উঠল। জেনিফারের কীর্তির পরিচয় মাইকেল টিভির দৌলতে জেনে গেছেন। এছাড়া তার ছবি ও সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে প্রতিটি সংবাদপত্রে। তাও মাইকেল লক্ষ্য করেছেন। আব্রাহাম উইলসন মামলায় ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভাকে পরাস্ত করে সে বিজয়ীনী হয়েছে এসব খবর মাইকেল জানতে পেরেছেন। এর সঙ্গে মাইকেল মোরেটির সেই মামলার প্রসঙ্গটিও উল্লিখিত হয়েছে। টেলিভিশনে জেনিফারের সাক্ষাৎকার শুনে ও তার ছবি দেখে মাইকেল মোরেটির খুব ভালো লেগেছে।

মাইকেলের পাশে বসে তার শ্বশুর অ্যান্টোনিও গ্র্যানেলি টেলিভিশন দেখছিলেন। তিনি একসময় বলে উঠলেন–এই মেয়েটিকেই তুমি তোমার কাজে ব্যবহার করেছিলে, তাই না মাইক?

মাইকেল উত্তরে বললেন হ্যাঁ, এর বুদ্ধি ও সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে ও আমার কাজে আসতে পারে।

.

আব্রাহাম উইলসনের রায় বেরোনোর পরের দিন জেনিফার একটি ফোন কল পেল। সে ফোনের রিসিভার তুলতেই শুনতে পেল অ্যাডাম ওয়ার্নারের কণ্ঠস্বর।

-হ্যালো, জেনি, আমি অ্যাডাম ওয়ার্নার বলছি। তোমায় অজস্র অভিনন্দন জানাচ্ছি।

-ধন্যবাদ, অ্যাডাম।

–আমার খুব ইচ্ছে তোমাকে ডিনার খাওয়ানোর, কবে আসতে পারবে বলো? তবে শুক্রবারের আগে তুমি ডেট ফেলল না। ওইদিন যদি তুমি আসতে পারো। আমি তোমার বাড়িতে যাব কি?

সঙ্গে সঙ্গে জেনিফারের চোখে ভেসে উঠল তার হত দরিদ্র ঘরটি। পুরোনো আমলের সেকেলে সব আসবাবপত্র। সবদিকে জরা জীর্ণতার ছাপ প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। এইরকম • পরিবেশের মধ্যে অ্যাডামকে আসতে বলতে জেনিফারের একদম ইচ্ছে করল না।

অ্যাডামের প্রস্তাব শুনে সে বলল–না, অ্যাডাম আমার অ্যাপার্টমেন্টে তোমাকে আসতে হবে না। আমি অন্য কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা করবো, ঠিক রাত আটটায়, বলেই জেনিফার রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

এমন সময় কেন বেইলি এসে ঘরে ঢুকল। জেনিফারকে খুশী খুশী দেখে বলল–কি উকিলসাহেবা, বড়ো কোনো মক্কেল পাকড়াও করেছে নাকি?

উচ্ছ্বসিত হয়ে জেনিফার কেনকে বলল–আমি একজনের নাম বলবো, তুমি তার সম্পর্কিত কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারবে, কেন?

কেনও ততোধিক মজা করে বলল–আমি কাগজ পেন নিয়ে প্রস্তুত আছি, নামটি বলে ফেলল।

জেনিফারের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সে কিছু একটা চিন্তা করল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর আমতা আমতা করে বলল–থাক কেন, তার আর দরকার হবে না।

কেন বেইলি পেন কাগজ সরিয়ে রেখে বলল–যো হুকুম, উকিল সাহেবা। কিন্তু তোমার কি হয়েছে জেনিফার? তুমি কি এত ভাবছো?

জেনিফার ইতস্তত করে বলল–আমি যার খোঁজখবর নিতে তোমায় বলছি তার নাম অ্যাডাম ওয়ার্নার।

কেন বলল–ওঁর সম্পর্কে কিছু জানতে হলে আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই তোমার। কাগজ পড়লেই তুমি সব জানতে পারবে।

তবুও তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই আমি, কেন।

–ওই ভদ্রলোকের নাম অ্যাডাম ওয়ার্নার, তা তো তুমি জানো। উনি হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে পাশ করেছেন। বছর পঁয়ত্রিশের যুবক। সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী পিতার সন্তান। তিনি

নিজেও পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিয়েছেন। নিডহ্যাম, পিয়ার্স অ্যান্ড ওয়ার্নার, ফিঞ্চ-এর অন্যতম অংশীদার।

জেনিফার কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে বড় বড় চোখ করে বলল তুমি এত খবর জানলে কিভাবে, কেন?

তুমি তো জানো আমার অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে। তাদের মারফৎ জানতে পেরেছি এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন, সেনেটর হবার আশায়। তিনি বেশ উচ্চাকাঙ্খী। তার সম্পর্কে এও শুনেছি যে ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ অর্জন করার জন্য তিনিও এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন।

জেনিফার অজান্তিকে বলল–সে ক্ষমতা ও যোগ্যতা অ্যাডামের আছে। প্রকাশ্যে বলল–ওঁর ব্যক্তিগত জীবন কি রকম, তা কি জানো?

মিঃ ওয়ার্নার বিবাহিত। নৌবাহিনীর প্রাক্তন সচিবের মেয়ে তার সহধর্মিণী। ওই ভদ্রমহিলার আরেকটি পরিচয় আছে, তিনি হলেন তার স্বামীর সিনিয়র পার্টনার স্টুয়ার্ট নিডহ্যামের ভাগ্নী। ।

অ্যাডাম বিবাহিত জেনে মনে মনে মুষড়ে পড়ল জেনিফার।

–তবে কৌতূহলবশতঃ একটা প্রশ্ন না করে করে আমি পারছি না জেনিফার। ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে জানার এত আগ্রহ কেন তোমার? কেন বলল।

না না তেমন কিছু নয়, নিছক কৌতূহল মাত্র।

.

কোন কথা না বলে কেন বেইলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এই অবসুরে জেনিফার অ্যাডামের কথা ভাবতে বসলো। অ্যাডাম জেনিফার সারা মন জুড়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অ্যাডাম কি নেহাত খাওয়াবে নাকি অন্য কোনো কারণ আছে এর পেছনে। তাছাড়া অভিনন্দন জানাতে চাইলে তো সে আগেই টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে। তার জন্য বাইরে দেখা করার দরকার তো ছিল না। উনি এত বোকা নন যে নিজের স্ত্রীর কথা বলার জন্য আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন। সে যাক গে, শুক্রবার রাত তো আগে আসুক, তারপর ভাবা যাবে। আমার মনে হয় এরপর আর কোনেদিন উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না।

সেদিন দুপুরে একটা ফোন এল। ফোনটা ছিল পিবডি অ্যান্ড পিবডি আইন প্রতিষ্ঠানের সিনিয়ার পার্টনারের।

তিনি বললেন–কদিন ধরেই আপনাকে ধরার জন্য চেষ্টা করছি। আপনাকেকাল দুপুরে লাঞ্চ খাওয়াবো, আপনার হাতে সময় আছে তো?

জেনিফার জানে আব্রাহাম উইলসনের মামলার খবর টিভি ও কাগজে বেরোতেই সবার মনে এইরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাকে সবাই খাতির যত্ন করতে চাইছে। তাই সকলের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তাকে ডিনার লাঞ্চ খাওয়াবার কথা।

জেনিফারকে নীরব দেখে মিঃ পিবডি সিনিয়ার পার্টনার আবার বললেন–কাল দুপুরে আপনি রেডি থাকবেন। মাই ক্লাব রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাব আপনাকে।

পরদিন দুপুরবেলা। সিনিয়ার পার্টনার মিঃ পিবডির সঙ্গে জেনিফার এল লাঞ্চ খেতে। খেতে খেতে নানা কথাবার্তার মাঝখানে মিঃ পিবডি বললেন আমাদের কোম্পানিতে একজন এ্যাটর্নির প্রয়োজন যদি আপনি ওই পদটি গ্রহণ করেন মিস পার্কার? প্রথমে আমরা পারিশ্রমিক হিসেবে আপনাকে পনেরো হাজার ডলার দেব।

পনেরো হাজার ডলার শুনেই তো জেনিফার আকাশ থেকে পড়ল। একবছর আগের একটা কথা তার মনে পড়ল। একটি চাকরীর আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে এ অফিস ও অফিস। তখন কেউ তাকে সাহায্য করেনি। তার এখন অনেক কথাই মনে পড়ল।

সিনিয়ার পার্টনার মিঃ পিবডি আবার বলতে শুরু করলেন–আপনার যা প্রতিভা তাতে কয়েক বছরের মধ্যে আপনি আমাদের কোম্পানীর একজন পার্টনার হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

বার্ষিক আয় পনেরো হাজার ডলার আর ভবিষ্যৎ পার্টনারশিপ হওয়ার অঙ্গীকার, এ যেন জেনিফার ভাবতেই পারছে না, সে কোনো মন্তব্য করতে পারলো না।

তার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে মিঃ পিবডি বললেন–তাহলে আগামী সোমবার থেকেই আপনি আসুন, মিস পার্কার।

না, সংক্ষেপে জবাব দিল জেনিফার।

–তাহলে আপনার ইচ্ছে মতো কোনো একদিন।

আমাকে ক্ষমা করুন মিঃ পিবডি, আপনার অফারটা আমি নিতে পারলে সত্যিই ভীষণ খুশী হতাম।

মিঃ পিবডি একটু চিন্তা করে বললেন–ঠিক আছে, আপনাকে আর একটু বেশি বাড়িয়ে দেব। পনেরোর পরিবর্তে বছরে কুড়ি বা পঁচিশ হাজার ডলারই আপনাকে দেওয়া হবে, মিস পার্কার। তবে আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করুন।

না, মিঃ পিবডি, এতে আমার আর বোঝাবুঝির কিছু নেই। আমি নিজের স্বাধীন ব্যবসা নিয়ে খুব ভালোই আছি।

ক্রমে ক্রমে জেনিফারের মক্কেলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবে তারা কেউই উচ্চবিত্ত নয়। তবুও তো তারা তার মক্কেল। এই অফিসের ছোট্ট পরিধির মধ্যে আর কুলোচ্ছে না।

একদিন সকালে কেন বেইলি এই বিষয়টা উত্থাপন করল। সেদিন তিনজন মক্কেল এসেছিল জেনিফারের কাছে। একজন জেনিফারের অফিস ঘরে বসে কথা বলছিল। অন্য দুজন বাইরে দাঁড়িয়েছিল। পাশের টেবিলে বসেছিল কেন বেইলি। সে হঠাৎ বলে উঠল এখানে আর কাজ করা সম্ভব নয়। শহরের অন্য কোনোখানে তোমাকে একটা অফিস করতে হবে। আর সেটা আমরা খুব সুন্দর করে সাজাবো।

জেনিফার স্বাভাবিক গলায় বলল–আমিও কিছুদিন ধরে এই কথাটা ভাবছি, কেন।

তবে আমার একটা অসুবিধা দেখা দেবে। তোমার কথা মনে পড়বে, তুমি চলে গেলে আমি তোমাকে ভীষণভাবে মিস্ করবো। কেন মাথা নিচু করে কোনো রকমে কথাগুলো বলল। ।

জেনিফার অবাক হয়ে বলল–তুমি এসব কি বলছো কেন, আমি তোমাকে ছাড়া কোথাও যাব না। আমি যেখানে যাব সেখানে তোমাকেও নিয়ে যাব।

জেনিফারের কথা শুনে কেন বেইলি হো হো করে হেসে উঠে বলল তুমি কি পাগল হয়েছ? তোমার সঙ্গে গেলে আমাকে এখানকার ব্যবসা তুলে দিতে হবে যে।

এক সপ্তাহ পরে কেন বেইলি ও জেনিফার একটা বাড়িতে ঘর ভাড়া নিল। জায়গাটা ফিফথ এ্যাভিনিউতে। আগের তুলনায় এই ঘরটি অনেক ভালো। তারা একসঙ্গে তিনটি ঘর নিল। দুটি নিজেদের বসার জন্য আর একটি সেক্রেটারীর জন্য। তার দুজনে পরামর্শ করে একজন মহিলা সেক্রেটারী নিযুক্ত করল। নাম তার সিনথিয়া এলম্যান, বয়সে জেনিফারের থেকে ছোট। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছে।

জেনিফার তাকে বলল–এখন কাজ কম হবে, কিন্তু পরে বাড়তে পারে।

এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? আমার কোনো অসুবিধা হবে না মিস পার্কার, বলল সিনথিয়া। তার গলার স্বর শুনেই জেনিফারের আর বুঝতে বাকি রইল না যে এই

মেয়েটি তাকে একজন আইডিয়াল লেডি ভাবছে। অবশ্য এটা ভাবার পেছনে দুটি কারণ আছে, সেটা হল তার কৃতিত্ব ও অভাবনীয় সাফল্য।

এমন সময় কেন বেইলি সেখানে এসে হাজির হল, সে বলল–এতবড় অফিসে বসে একা একা কাজ করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। চলো একটা থিয়েটার দেখে মন ও শরীরটাকে চাঙ্গা করে আসি। তারপর বাইরে কোথাও ডিনারটা সেরে আসবো।

আমি এখন ব্যস্ত আছি কথাটা বলতে গিয়েও জেনিফার বলতে পরল না। এত কাজের চাপে পড়ে সেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া কেন তার খুব ভালো বন্ধু, তাকে কষ্ট দিতে জেনিফারের মন সায় দিল না। তাই সে তার কাজ ফেলে বলল ঠিক আছে, চলল।

নাটকটা জেনিফারের মনকে ভালো করে দিল। নাটকের নাম অ্যাপলজ, নায়ক লরেন বাকাল দারুণ অভিনয় করেছেন। শো দেখে তারা সারডি রেস্তোরাঁতে ডিনার খেল।

আসছে শুক্রবার ব্যালে নাচ দেখতে যাবে? দুটো টিকিট পেয়েছি, পথ চলতে চলতে কেন বলল।

–না, আমি ওইদিন যেতে পারবো না, আমার অন্য কাজ আছে, কিছু মনে কোরো না কেন–জেনিফার তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

-কেন নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দিল–ঠিক আছে জেনিফার।

জেনিফার কিছুদিন ধরে কেনের মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। তার চাহনির মধ্যে কিসের একটা প্রতিচ্ছবি সে দেখতে পায়। সে কেনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না, তবুও তার মনে হয় কেন নিজেকে একাকী বোধ করে। তাই সর্বদা সচেষ্ট থাকে কেনকে নানাভাবে সাহায্য করতে। আর এতে জেনিফারও নিজে খুব আনন্দ পায়।

শেষ পর্যন্ত সেই শুক্রবারের রাতটি এল। সে রাতে মুখোমুখি বসে আছে জেনিফার ও অ্যাডাম ওয়ার্নার। হোটেল ফুটিস-এর নিভৃত এক কোণে।

জেনিফার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল–আমাকে অনেক মক্কেল পাইয়ে দিয়েছো তুমি অ্যাডাম। তার জন্য তোমার আমার কাছ থেকে ধন্যবাদ পাওনা আছে। কিন্তু তুমিই আমাকে না।সেই সুযোগ দাওনি। আমি অনেকবার তোমাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছিলাম।

আমি বুঝতে পারছি, আমি ইচ্ছে করে তোমার টেলিফোন ধরিনি। কারণ আমার মনে একটা সংশয় আছে।

জেনিফার বিস্মিত হয়ে বলল–সংশয়? আমার ফোন ধরলে বুঝি তুমি কোনো বিপদে পড়ার আশঙ্কা করছে অ্যাডাম?

অ্যাডাম বলল–আমি যে বিবাহিত তা তোমায় বলা হয়নি, জেনিফার।

জেনিফার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল–তাহলে আজ আবার এখানে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে এলে কেন?

কারণ তোমার সঙ্গ আমার ভালো লাগে তাই, শান্ত স্বাভাবিক স্বরে অ্যাডাম বলল। অ্যাডাম ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছে। শামুক যেমন ভয় পেলে নিজের খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ে তেমনি অ্যাডামও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছে, অ্যাডামের ভেতরকার এই প্রতিক্রিয়া জেনিফারের নজর এড়াল না।

তবুও জেনিফার কাঁপা কাঁপা গলায় বলল ঠিক আছে, তুমি বিয়ে করেছে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার স্ত্রীর বিষয়ে কিছু বলো।

অ্যাডামের মুখে স্মিত হাসি। তিনি হাসতে হাসতে বললেন–আমার স্ত্রীর বিষয়ে কি জানতে চাও তুমি?

–এই ধরো তোমার স্ত্রীর নাম, তোমাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে? কটি সন্তান এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবন কি রকম ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার স্ত্রীর নাম মেরিবেথ। আমাদের পনেরো বছর আগে বিয়ে হয়েছে। তবে আজও আমরা কোনো সন্তানের বাবা-মা হতে পারিনি।

জেনিফার আঁতকে উঠে বলল–সে কি? তোমার স্ত্রীর কি কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে?

না, সে সব কিছু নয়। আসলে আমরা কেউই সন্তান চাইনি। আমরা অনেক ছোট বয়সে বিয়ে করেছি। বিয়ের অনেক আগে থেকেই আমাদের দুজনের পরিচয় ছিল। আমরা দুজনে পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতাম। মাত্র আঠারো বছর বয়সে মেরি ওর বাবা-মা-কে হারায়। তারা এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। তাদের শোকে মেরি মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। মাঝেমধ্যে উন্মাদের মতো আচরণ করতে লাগল। নিজেকে ও ভীষণ একা মনে করতো। ওর ওই দুঃসময়ে আমি ওর খুব কাছাকাছি থাকতাম। ওকে সব সময় আগলে রাখতাম। আর সেই থেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসা জন্মালো। তার শেষ পরিণতি হল পরিণয়ের মধ্যে দিয়ে।

জেনিফার মনে মনে ভাবল–অ্যাডাম একজন নিপাট ভদ্রলোক। নিছক আবেগের বশেই মেরিকে বিয়ে করেছে।

অ্যাডাম আবার বলতে শুরু করলেন–আমার স্ত্রী চমৎকার মনের মহিলা। তাছাড়া আমাদের দাম্পত্য জীবন খুবই সুখের। আজও এতবছর পরেও আমাদের সম্পর্কে কোনো চিড় ধরেনি। সুন্দর সম্পর্ক বজায় আছে।

জেনিফার যতটা না প্রত্যাশা করেছিল তার বেশি অ্যাডাম তাকে বললেন। জেনিফারের বিবেক তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল যথেষ্ট হয়েছে, আর বেশি দূর এগোনো উচিত হবে না। যত দ্রুত সম্ভব অ্যাডামের সঙ্গ বর্জন করে। অ্যাডামকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করো। জেনিফারও বুঝতে পারছে এই মানুষটির ভালোবাসা যতটা সহজ এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ঠিক ততটাই কঠিন। পুরোপুরি পাগল না হলে অ্যাডামের মতো কোনো ভদ্রলোকের প্রেমে পড়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

জেনিফার নিজেকে হুঁশিয়ার করে বলল–অ্যাডাম, তোমাকে আমার ভালো লাগে। তবে বিবাহিত পুরুষদের সঙ্গে আমি কখনও মিশি না।

অ্যাডামের মুখে হাসির ঝিলিক, তার চোখে সততা ও উষ্ণতার বিচ্ছুরণ প্রতিফলিত হচ্ছে। অ্যাডাম বললেন–তুমি চিন্তা কোরো না, বৌয়ের অসাক্ষাতে আমি তোমাকে প্রেম নিবেদন করবো না। তোমার প্রতি আমি একটা টান অনুভব করি। তোমার জন্য আমি গর্বিত। তাই মাঝেমধ্যে তোমার সঙ্গ পেতে আমার ভালো লাগে।

রূঢ় একটা কথা তার বলতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। অনেক কষ্টে মুখে হাসি এনে সে বলল–তাহলে তো খুব ভালই হবে।

.

অ্যাডাম ওয়ার্নারের সঙ্গে দেখা করার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। একদিন জেনিফার গেল কেন বেইলির সঙ্গে নাইট শোয়ে নাটক দেখতে। হলে ঢুকতে যাবার সময় তারা প্রচণ্ড ভীড়ের মুখোমুখি হল। এমন সময় একজন ভদ্রমহিলার চিৎকার শোনা গেল। তিনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলছেন–ওই যে ওখানে শয়তানটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জেনিফারেরও চোখ পড়ল বাইরের দিকে। সেখানে একটা বড় লিমুজিন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়িটা থেকে মাইকেল মোরেটি ও একজন মহিলা নেমে এলেন। ততক্ষণে ভদ্রমহিলার দৃষ্টি অনুসরণ করে সমবেত মানুষজনও সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারাও এই দৃশ্যটা দেখলেন। জেনিফারের মনে হল এই মহিলাই বুঝি মাইকেল মোরেটির স্ত্রী।

কাঁচের দরজা খুলে ভীড় ঠেলে মোরেটি হলের ভেতর ঢুকে পড়লেন। অতর্কিতে জেনিফারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল তার। নাটকটি খুব ভালো ছিল। কিন্তু জেনিফার ঠিক মন বসাতে পারল না। সে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। তার মনে পড়ছিল মাইকেল মোরেটির দুর্ব্যবহারের কথা। কিভাবে তিনি তাকে বিপদে ফেলেছিলেন। সেই দুঃখদায়ক স্মৃতি তার। ভেতরটা তছনছ করে দিচ্ছিল। নাটকটির প্রথম অঙ্ক শেষ হল। সে কেনকে বলল কেন, আমার ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে। চলো আমরা উঠে যাই। তার কথায় সম্মতি জানিয়ে কেন তাকে নিয়ে হলের বাইরে বেরিয়ে এল।

পরদিন আবার অ্যাডামের ফোন এল। জেনিফার ভেবেছিল তিনি হয়তো তাকে আবার লাঞ্চ বা ডিনারে আমন্ত্রণ জানাবে। তাই সে রিসিভার তুলেই বলল–দুঃখিত অ্যাডাম, আমার হাতে এখন অনেক কাজ আছে।

টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে অ্যাডামের কণ্ঠস্বর জেনিফার শুনতে পেল-হ্যাঁ, আমি তা জানি। আমি কদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি সেটা জানাতেই আমি তোমাকে ফোন করেছি।

কথাটা শুনে জেনিফারের মন খারাপ হয়ে গেল। সে বেশ বুঝতে পারছে অ্যাডামের অভাব সে সহ্য করতে পারবে না।

জেনিফার জিজ্ঞাসা করলকদিনের জন্য তুমি বাইরে যাচ্ছ, অ্যাডাম?

বড়জোর পনেরো দিনের জন্য, ফিরে এসে তোমাকে ফোন করব, কেমন।

–তা তোমার গন্তব্যস্থল কোথায়?

–বেশিদূর নয়, এই সামনেই, আমাদের গ্রামে।

–ভাল, তোমার যাত্রা শুভ হোক, কথাটা শেষ করে জেনিফার রিসিভার নামিয়ে দিল। জেনিফারের মন চিন্তাচ্ছন্ন। সে ভাবতেই পারছে না আগামী পনেরো দিন অ্যাডামের সঙ্গে তার দেখা হবে না। নানারকম সব উদ্ভট অবাস্তব চিন্তা তার মাথায় ভীড় করল। সে যেন প্রত্যক্ষ করছে অ্যাডাম রায়ো ডি জেনেরিওর সাগর বেলায় সুন্দরী যুবতীদের, সঙ্গে গল্পে মশগুল। তারা স্বল্পবাস পরিধেয়। পরমুহূর্তেই অন্য একটা ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অ্যাডাম এক নগ্নিকা সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে সুইজারল্যান্ডের কোনোও এক বিলাসবহুল কামরায়।

পরক্ষণেই জেনিফার নিজেকে শাসন করল, আমি এসব কি ভাবছি, নিশ্চয়ই ব্যবসার কাজে অ্যাডামকে গ্রামে যেতে হচ্ছে। হয়তো বা সেখানে দিনরাত কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। আর আমি কিনা ওর সম্পর্কে এসব আজেবাজে চিন্তা করছি। এটা ভারী অন্যায় হচ্ছে। এতই যদি মন সন্দিহান হয় তাহলে কৌশলে তার কাছ থেকে জেনে নিতে দোষ তো ছিল না। উনি কোথায় যাচ্ছেন, কোথায় রাত কাটাবেন, সঙ্গে কে যাচ্ছে, এসব আর কি? তাহলে তো কৌতূহল মিটতো আবার সন্দেহটাকেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যেত।

সেই সময় কেন ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঢুকেই তাকে অবাক হতে হল, এক মুহূর্ত জেনিফারের দিকে তাকিয়ে থেকে তার প্রতিক্রিয়াটা বোঝার চেষ্টা করল। তারপর বলল কি হল জেনিফার, একা একা পাগলের মতো বকছো কেন? তোমার শরীর কি খারাপ?

জেনিফার লজ্জা পেল। সে বলল না, তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না, ক্লান্তি এসে আমার সারা শরীর মনকে আচ্ছন্ন করেছে, তাই...।

কেন সহানুভূতির সুরে বলল–বেশি রাত জেগে কাজ করার ফল, আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে, বুঝেছো।

জেনিফার নিজের মনে প্রশ্ন করল–অ্যাডামও কি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে আজ? এর সদুত্তর তার জানা নেই।

অ্যাডাম বাইরে গেছে

অ্যাডাম বাইরে গেছে, এক মাস হয়ে গেল। জেনিফার তার কোনো খবর পাচ্ছে না। জেনিফার মনে মনে ভীষণ ভেঙে পড়েছে। তার প্রতি দুস্তর একটা আকর্ষণ সে অনুভব করছে। হঠাৎ একদিন টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই জেনিফার ও প্রান্ত থেকে অ্যাডামের গলার স্বর শুনতে পেল। অ্যাডাম বলছেন–একটু আগে ফিরেছি, দুপুরে আমরা দুজনে লাঞ্চও খাব।

এতদিন বাদে অ্যাডামের গলা শুনে জেনিফারের শরীর রোমাঞ্চে শিউরে উঠল। কোনো রকমে সে উত্তর দিল–

-তাহলে কথা রইল প্লাজা হোটলের এক রুমে তুমি চলে আসবে।

–অবশ্যই।

জেনিফার জানে ওই ওক রুমে যত ব্যবসায়ী ও দালালদের আস্তানা। আগে কোনো যুবতী মেয়েরা ওখানে যেতে সাহস করত না।

জেনিফার অন্য দিনের তুলনায় একটু আগে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। সে এসে হাজির হল এক রুমে। অ্যাডাম এল একটু পরে। জেনিফার দেখল অ্যাডামের গায়ের রং তামাটে দেখাচ্ছে। তবে কি ওর কল্পনা অমূলক নয়? সত্যি সত্যি কি অ্যাডাম এতদিন সুন্দরী স্বল্পবাস যুবতীদের নিয়ে ফুর্তি করে বেরিয়েছে সমুদ্রের তীরে? কেননা জেনিফার

জানে একটানা বেশ কিছুদিন বালির ওপর শুয়ে থাকলে রোদের তাপে রং তামাটে হয়ে যায়। ভয়ে জেনিফারের মুখ শুকিয়ে গেল।

অ্যাডাম ওয়ার্নার দূর থেকেই জেনিফারকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে জেনিফারের মুখোমুখি বসলেন। জেনিফারের হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। তার হাতের উষ্ণ পরশ জেনিফারের ভেতরে একটা শিহরণ জাগালো। বিবাহিত পুরুষদের সংস্পর্শ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলার সাবধান বাণী সে এই মুহূর্তে ভুলে গেল। ক্রমশ সে দুর্বল হয়ে পড়ছে। সে বুঝতে পারছে তার ইচ্ছাশক্তি লোপ পেয়েছে। অন্য কিছুর আকর্ষণে সে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তার ইচ্ছে করছে অ্যাডামের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে। সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করার প্রবল স্পৃহা তার মনকে নাড়া দিচ্ছে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে সে আর অ্যাডাম দুজনে নগ্ন হয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে। কথাটা ভাবামাত্র তার চোখমুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে অ্যাডাম জেনিফারকে চমকে দিয়ে একটা সবুজ রঙের স্কার্ফ দিলেন। তিনি বললেন–এটা তোমার জন্য মিলান থেকে এনেছি। তোমার পছন্দ হয়েছে তো জেনিফার?

সবুজের ওপর সোনালী সুতোর কারুকাজ স্কার্ফটার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

জেনিফার ভাবল মিলান অর্থাৎ ইটালি। সে শুনেছে ওখানকার মেয়েরা পরীদের মতো অপরূপা হয়।

জেনিফার খুশীর সুরে বলল–বাঃ, চমৎকার দেখতে তো এটা। তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাডাম। শুনেছি ওই জায়গাটা নাকি খুব সুন্দর। ভ্রমণ পিপাসু মানুষকে নাকি ওই

জায়গাটা হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি অবশ্য কখনও মিলানে যাইনি, তবে ওখানকার মন্দির, মঠ আর গীর্জার অনেক ছবি আমি দেখেছি।

-হ্যাঁ, জায়গাটা ভারী সুন্দর। ওখানকার মঠ, মন্দির ও গীর্জাগুলোর শিল্প ও ভাস্কর্যের কোনো তুলনা নেই।

তখন অ্যাডামের সঙ্গ জেনিফারকে আবেশ বিহ্বল করে তুলেছিল। অ্যাডামের হাতের স্পর্শ ও দুচোখের মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি তাকে পাগল করে দিচ্ছিল। চারপাশের কিছুর প্রতি তার দৃকপাত ছিল না। হঠাৎ তারা আবিষ্কার করল যে পেটের খিদের থেকে আরেকটি খিদে রয়েছে তাদের শরীরের প্রতিটি কোণে। সে খিদেকে অগ্রাহ্য করা তাদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

জেনিফার মনে মনে বলল–ওর মোহ মুক্ত হওয়ার জন্য আমাকে একটি কাজ করতে হবে। তা হল ওর শরীরী আবেদনে সাড়া দেওয়া, সে অ্যাডামকে ফিস ফিস করে বলল চলো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই।

ওরা হোটেলের বিল মিটিয়ে বাইরে এল। সেখানে প্রচুর লোকের আনাগোনা চলছিল। সেই ভীড়ের মধ্যে জেনিফার গিয়ে দাঁড়াল। আর অ্যাডাম গেল হোটেলের কাউন্টারের দিকে। তিনি দুজনের জন্য ঘর বুক করলেন। রেজিস্টারে নিজের নাম নথীভুক্ত করলেন। এবার জেনিফারের কাছে ফিরে এলেন অ্যাডাম। তাপর দুজনে এলিভেটরে চাপলেন বুক করা ঘরের উদ্দেশ্যে।

তারা প্লাজা হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে উপস্থিত হল। সেই ঘরটি নানারকম আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। অনেক নীচের থেকে শহরের ব্যস্ত যানবাহনের আওয়াজ ওপরের এই ঘরে ভেসে আসছে। জেনিফারের মনে হল সে যেন ম্যাজিক দেখছে। আর পরবর্তী ঘটনাগুলো চোখের নিমেষে ম্যাজিকের মতো ঘটে গেল। অ্যাডাম নিজের হাতে একটি একটি করে জেনিফারের পোশাক খুলে দিল। সে একেবারে নগ্ন হয়ে গেল। তারপর তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন অ্যাডাম। তারপর তাদের দুজনের দেহ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। এই দৈহিক সঙ্গ লাভের জন্য দুজনেই উন্মুক্ত হয়েছিল এতদিন। অ্যাডামকে দেহদান করে জেনিফার যে সুখ পেয়েছে তা ও কোনোদিন ভুলতে পারবে না। তার মনের স্মৃতিপটে এই ঘরের ভেতরের মুহূর্তগুলো আজীবন গাঁথা থাকবে। মিলনকালে তার একটি কথাই মনে হচ্ছিল যে সে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল তাদের দেহমিলনের চরম আনন্দের সুখ ভোগ। জেনিফারের সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ল। সে অ্যাডামের পাশে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে অ্যাডামের রোমশ বুকে হাত বুলোত লাগল।

নীরবতা ভঙ্গ করে অ্যাডাম বললেন–মনে হচ্ছে আমি আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পেলাম।

অ্যাডামের কথা শুনে জেনিফার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

বিস্মিত চোখে অ্যাডাম একপলক দেখলেন জেনিফারকে, তারপর বললেন–এতে হাসির কি হল?

জেনিফার চোখে মুখে হাসির ভাব ফুটিয়ে বলল–আমি এতদিন ভাবতাম একবার–তোমার পাশে শুলেই আমি তোমার হাত থেকে মুক্তি পাবে।

জেনিফারের দিকে কাত হয়ে শুয়ে অ্যাডাম বললেন–এখন কি তোমার ভাবনাটা পাল্টে গিয়েছে?

একটু ইতস্তত করে জেনিফার বলল–এখন আমি ভাবছি, তোমার জন্যই হয়তো ঈশ্বর আমাকে তৈরি করেছেন। এখন আর তোমাকে ছাড়া আমি একমুহূর্ত থাকতে পারবো না।

জেনিফারের ইঙ্গিতটা বুঝতে অ্যাডামের একটু অসুবিধা হল না। তাই তিনি বললেন আগামী সোমবার আমার স্ত্রী মেরিবেথ ইউরোপ যাচ্ছে। সঙ্গে তার পিসীও যাচ্ছেন। ফিরবে সেই একমাস পরে, এই একটা মাস আমরা একে অপরের সঙ্গসুখ লাভ করবে।

.

জেনিফার আর অ্যাডাম ওয়ার্নার প্রতি রাতে মিলিত হয়ে চরম তৃপ্তি ভোগ করতে লাগল। মাঝে মধ্যে অ্যাডাম জেনিফারের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটাতে আসতেন। একদিন তিনি জেনিফারকে বললেন–এখানে আমি আর তোমাকে থাকতে দেবো না। আজ তুমি আমি কেউই অফিসে যাব না। তোমার থাকার মতো একটা বাড়ির সন্ধান করবো আজ সারাদিন ধরে।

তারা দুজনে সারাদিন ধরে বাড়ির খোঁজে একদি ওদিক ঘুরে বেড়াল। প্রচুর অ্যাপার্টমেন্ট দেখল। সবকটিই জেনিফারের অপছন্দ হল। শেষ পর্যন্ত দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল।

তখন তারা বেলমেন্ট টাওয়ার্সে একটা বাড়ির সন্ধান পেল। জায়গাটা ও বাড়িটি তাদের মনের মতো হল।

সেই বাড়িটিতে ঘরের সংখ্যা পাঁচটি। প্রতিটি ঘরই দামী দামী আসবাবপত্রে সাজানো।

অ্যাডাম সাগ্রহে জানতে চাইলেন কি পছন্দ হয়েছে তো?

জেনিফার খুশীর স্বরে জবাব দিল–খুব পছন্দ হয়েছে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে একটা বড়ো সমস্যা দেখা দিয়েছে, এতবড় বাড়ির ভাড়া দেওয়ার মতো আর্থিক পরিস্থিতি এখনও আমার তৈরি হয়নি।

অ্যাডাম বললেন–এটা আমরা লিজ নিয়েছি, কোম্পনীর নামে। ভি. আই. পি.-দের থাকার ব্যবস্থা এখানে করা হয়। আমি ওদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করে দেবো। আজ থেকে তুমি এখানে থাকবে।

অসম্ভব। তুমি তো জানো আমার বার্ষিক আয় কত? এত ভাড়া দেবার মতো ক্ষমতা আমার নেই।

–তুমি কিছু চিন্তা কেরো না, সেসব আমি দেখবো।

স্ত্রীর অগোচরে রোজ সন্ধ্যায় অ্যাডাম আসতেন জেনিফারের নতুন ফ্ল্যাটে। কাজকর্ম নিয়ে তারা দুজনে আলোচনা করতেন, মাঝে মধ্যে রানি বা দাবা খেলে সময় কাটাতে তারা।

জেনিফার নিজের হাতে দুজনের জন্য ডিনার তৈরি করতো। তারা দুজনে একসঙ্গে বসে ডিনার সারতো আর তার ফাঁকে ফাঁকে নানারকম গল্প চলতো।

এখন অ্যাডামের সঙ্গে জেনিফারের ঘনিষ্ঠতা আরও গম্ভীর হয়েছে। এখন দুজনে পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসেছে। তবে তারা আগের মতো নিঃসঙ্কোচে কোথাও বেড়াতে যেতে বা রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে পারে না। কোথা থেকে লজ্জা সংকোচ এসে তাদেরকে বাধা দেয়। অবশ্যই এর পেছনে কাজ করছে দুর্নাম রটনার ভয়। তাই তারা ইচ্ছে হলে শহরের বাইরে চলে যায়। সেখানে ছোটোখাটো কোনো রেস্তোরাঁয় ঢুকে প্রথম দিকে ক্রমে ক্রমে দেখা গেণ্ডামকে সে আরও গ্রহনের সব কথা ডিনার সারে।

সকাল থেকে রাত অবধি অ্যাডামের রবিবারটা কাটে জেনিফারের সঙ্গে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তারা দুজনে ব্রেকফাস্ট খায়। গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে তারা ঘরে বসেই প্রার্থনা করে। জেনিফার জানে অ্যাডামের সঙ্গে তার প্রেম প্রেম খেলা করা ভয়ংকর অন্যায়, এই খেলা বেশীদিন চলবে না, চলতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কিছুতেই অ্যাডামের মোহ থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না। অ্যাডামের সঙ্গসুখ যেন তাকে সারাক্ষণ আবিষ্ট করে রাখে। দেহদান করে যে এত তৃপ্তি ও সুখ পাওয়া যায় তা জেনিফার আগে জানতো না। অ্যাডাম যে তাকে এত আনন্দের অধিকারিনী করেছে তার জন্য জেনিফারকে অনেক মূল্য দিতে হবে কোনোও একদিন, তা জেনিফার নিশ্চিত করে জানে।

অ্যাডামের যত্নআত্তিতে জেনিফারের কোনো গাফিলতি নেই। সে শুনেছে অনেক প্রেমিক নাকি প্রেমিকার সঙ্গে রাত্রিযাপন কালে অতর্কিতে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। নয় হৃদরোগে

অথবা উচ্চ রক্ত চাপজনিত কারণে। তাই জেনিফার আপকালীন ব্যবস্থা হিসাবে অ্যাডামের গৃহ চিকিৎসকের নাম ঠিকানা, এমন কী টেলিফোন নম্বরও লিখে রেখেছে নিজের টেলিফোন গাইডে। অ্যাডামের স্ত্রী মেরিবেথের মতো সে অ্যাডামের প্রিয় খাবার রান্না করা থেকে জামাকাপড় কেচে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ একা হাতে করে। মেরিবেথের অভাব সে অ্যাডামকে বুঝতে দেয় না। অ্যাডাম ঘুমিয়ে পড়লে তারপর সে তার হাতে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে। তার মনে হয় এই আশ্রয়টি যেন তার দেহমনে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

প্রথম দিকে জেনিফারের ধারণা ছিল তাদের পরস্পরের প্রতি দৈহিক আসক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল তার ধারণা ভুল। তাদের দৈহিক আকর্ষণ কমা তো দুরের কথা বরং আরও বেড়েছে। অ্যাডামকে সে আরও গভীরভাবে ভালোবাসলো। তাকে ছাড়া তার একমুহূর্ত চলে না। অ্যাডামের কাছে তার জীবনের সব কথা অকপটে বলে গেল। তার এখন একটাই কাজ কেবল অ্যাডামের সেবাযত্ন করা। সে সবসময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে কোনোভাবেই যেন তাদের এই সুখের দিনগুলির অবসান না হয়। আর সবসময় অ্যাডাম যেন তাকে এইভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে।

কিন্তু ঈশ্বর জেনিফারের ওই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নি। তাদের ওই সুখসাগরে ভেসে যাওয়ার ইতি ঘটল। জেনিফার আর অ্যাডামের সুখ ও আনন্দের দিনের মেয়াদকাল ছিল মাত্র একমাস, কারণ একমাস বাদে অ্যাডামের স্ত্রী মেরিবেথ ইউরোপ থেকে ফিরে আসার আগের রাত। সে রাতে অ্যাডাম জেনিফারের ফ্ল্যাটে এলেন। শেষবারের মতো দুজনে একসঙ্গে ডিনার করলেন। তারপর দুজনে দৈহিক সুখের স্বাদ গ্রহণে মেতে উঠলেন। শেষে ক্লান্ত হয়ে অ্যাডাম একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

সে রাতে জেনিফার দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। সে অ্যাডামের বুকের ওপর শুয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিল। সুখের অনুভূতিতে ভরা গত কদিনের স্মৃতি ভাবতে লাগল সে।

পরদিন সকাল। অ্যাডাম ও জেনিফার ব্রেকফাস্ট খেতে মুখোমুখি বসেছে টেবিলে। খেতে খেতে অ্যাডাম বললেন–জেনিফার, তুমিই একমাত্র মেয়ে যাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছি।

মেরিবেথকে বিয়ে করার পরেই অ্যাডাম বুঝতে পেরেছিলেন তিনি কতবড় একটা ভুল করেছেন। একমাত্র আবেগ ও সহানুভূতির তাগিদেই ওই সময় এমন বোকার মতো কাজ করেছিলেন তিনি। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন মা-বাবাকে হারিয়ে মেরিবেথ এই বিশাল পৃথিবীর কোনো এক অন্ধ গলিতে একাকী ঘুরে বেড়াতো। তাই তাকে বিয়ে করে মহানুভবতার কাজ করেছেন। এর সঙ্গে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।

মেরিবেথকে তিনি সত্যিই ভালোবাসেন। মেরিবেথ যাতে আঘাত পায় এমন কোনো আচরণ তিনি করেন না। তবে জেনিফারকে যে তিনি ভালোবাসেন সেটাও অস্বীকার করতে পারেন না। এই ভাবনাটা তাকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছিল। শেষ অবধি তিনি স্থির করলেন, এই বিষয়ে মামাশ্বশুর স্টুয়ার্ট নিডহ্যামের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। স্টুয়ার্ট তাকে ভীষণ স্নেহ করেন। সুতরাং অ্যাডামের অবস্থা তিনি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

অ্যাডাম স্টুয়ার্টের অফিসে এসে হাজির হলেন। স্টুয়ার্ট তাকে দেখে উচ্চকণ্ঠে বললেন, ভালোই হয়েছে তুমি এসেছো অ্যাডাম, কিছুক্ষণ আগে নির্বাচন কমিটির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি টেলিফোনে। ওঁরা তোমাকে সেনেটর হবার উপযুক্ত মনে করছেন। তাই তোমাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে বলছেন, পার্টির থেকে তুমি সাহায্য পাবে।

অ্যাডাম হতচকিত হয়ে গেলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তা ভুলে গেলেন। মুহূর্তখানেক পরে আমতা আমতা করে বললেন–আমি ইয়ে–এ তো খুব আনন্দের কথা।

স্টুয়ার্ট সোৎসাহে বলতে লাগলেন–খুব সুষ্ঠু ও শান্তভাবে সবকিছু পরিচালনা করতে হবে আমাদের। সবার আগে একটা নির্বাচনী তহবিল খুলতে হবে। কোথা থেকে শুরু করবো তা আমি তোমায় বুঝিয়ে বলছি।

সেনেটর পদপ্রার্থী হিসেবে অ্যাডামকে ভোটে দাঁড় করাতে কি কি পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে আলোচনা করলেন তাঁর সঙ্গে স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম। প্রায় দু-ঘন্টা পর আলোচনা শেষ হতে অ্যাডাম বললেন–স্টুয়ার্ট একটা বিশেষ কারণে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি আমি।

স্টুয়ার্ট ব্যস্ত হয়ে বললেন–দুঃখিত, অ্যাডাম। আমার একজন মক্কেল এসেছে। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। হাতে একদম.সময় নেই। মামাশ্বশুরের কথা শুনে অ্যাডাম আন্দাজ করতে পারলেন হয়তো সমস্যাটা স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম অনুধাবন করতে পেরেছেন।

সেদিন দুপুরে এক ডেয়ারী রেস্তোরাঁয় অ্যাডাম ও জেনিফার লাঞ্চ খেতে এসেছেন। অ্যাডামের চোখমুখ উৎসাহ উদ্দীপনায় টগবগ করে ফুটছে। তিনি চেয়ারে বসতে বসতে

বললেন–একটা সুখবর আছে, জেনিফার। আমি সেনেটর পদের পার্থী হয়ে এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছি।

জেনিফার আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সে বলল–বাঃ! এতো দারুণ খবর! দেখবে একদিন সেনেটর হিসেবে তোমার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

অ্যাডাম বললেন–নিউইয়র্কের মতো জায়গায় ভোটে জেতার জন্য জোর লড়াই করতে হবে।

জেনিফার জানতো অ্যাডাম অসম সাহসী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েই তিনি যে কোনো লড়াইতে নামেন এবং জয়লাভও করেন। তার পূর্ব অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ। একবার জটিল একটা মামলা থেকে তাকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। তাই সে জোর দিয়ে বলল–ওসব তোমার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। তোমার জন্য আমার গর্ব হয়।

অ্যাডামের একটি হাত জেনিফারের হাতের মুঠোর মধ্যে।

অ্যাডাম অন্তরঙ্গ সুরে বললেন–দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখনই অত ভেবো না। আমাকে অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে।

জেনিফার আন্তরিকভাবে বলল–তোমায় আমি ভালোবাসি বলেই তো তোমার জন্য আমি গর্ববোধ করি।

নির্বাচনী প্রচার অভিযান নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন জেনিফারের সঙ্গে অ্যাডাম। শুভাকাঙ্খী হিসেবে জেনিফার চায় অ্যাডাম সেনেটর হোন। কিন্তু তাতে একটা সমস্যা দেখা দেবে। তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে। অ্যাডাম সেনেটর হলে নানা কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তখন জেনিফার তার সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হবে। সে নিজে অবিবাহিতা আর অ্যাডাম বিবাহিত। তাদের দুজনের গোপন প্রেম ও দৈহিক সম্পর্কের কথা লোকসমক্ষে প্রকাশিত হলে অ্যাডামের রাজনৈতিক জীবনে চরম বিপর্যয় ঘটবে। অ্যাডামের পক্ষে সেটা খুব শুভ হবে না। আবার তার স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দেবে। এইসব ভাবনাগুলো জেনিফারকে নিরাপত্তাহীন ও নিঃসঙ্গ করে দিতে চাইল। তবুও সে অ্যাডামকে উৎসাহিত করতে লাগল।

অ্যাডামের প্রেমে পড়ার পর অনিদ্রা আর দুঃস্বপ্নের বোগ তাকে মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু আবার সেই রোগ এসে হানা দিল তার চোখে। সে সারারাত জেগেই কাটাতে লাগল।

.

একদিন জেনিফার একটি অদ্ভুত খবর পেল। একজন বিধবার সম্পত্তি ষড়যন্ত্র করে দখল নিচ্ছে তার মেয়ে জামাই। সেই খবরটি জেনিফারকে আকৃষ্ট করল। সে মন দিয়ে পুরো খবরটি পড়ল, খবরটি হল এই রকম–হেলেন কুপার নামে এক মধ্য বয়স্কা বিধবা ভদ্রমহিলা তার একমাত্র কন্যা সন্তানকে নিয়ে একটি বাড়িতে বাস করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর গচ্ছিত চল্লিশ লাখ ডলার হেলেন পান। তিনি সেই টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছিলেন। হেলেন যে বাড়িতে থাকতেন সেখানকার সুপারিনটেন্ডের প্রেমে পড়ে তার মেয়ে এবং পরে ওদের বিয়ে হয়। বিয়ের, মাস ছয়েক পরে হেলেনের মেয়ে ও জামাই

তার সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। তারা আদালতে গিয়ে আবেদন পেশ করে এই মর্মে যে শ্রীমতী কুপারের মধ্যে মানসিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। তাই তাকে সরকারীভাবে অক্ষম ঘোষণা করা হোক এবং যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাদের করা হোক। আবেদনের সঙ্গে শ্রীমতী কুপারের মেয়ে জামাই শহরের তিনজন সেরা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের রিপোর্টও দাখিল করেছিলেন আদালতে। তারা জানিয়েছে ওই তিনজন ডাক্তার শ্রীমতী কুপারের মানসিক বৈকল্য সম্পর্কে একমত হয়েছেন। তাদের তিনজনের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে আদালত শ্রীমতী কুপারকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। আর তার সমস্ত সম্পত্তি তার মেয়ে জামাইকে হস্তান্তর করলেন।

রিপোর্টটা পড়া শেষ করে জেনিফার কেন বেইলিকে বলল–কেন, আমার মনে হচ্ছে এটা সাজানো কেস।

কেন বলল–আমিও তাই ভাবছি। তবে তুমি এখানে কিছু করতে পারবে না।

এটা সত্যি যে শ্রীমতী কুপার জেনিফারের মক্কেল নন। তাঁর মেয়েজামাই যদি তাকে কৌশলে পাগলা গারদে পাঠিয়ে থাকে তাহলে তারা জেনিফারের মধ্যস্থতা পছন্দ করবে না। তাছাড়া সেরা তিনজন মানসিক চিকিৎসক তাকে মানসিক রোগী বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেক্ষেত্রে শ্রীমতী কুপারের করণীয় কিছু নেই। তবুও জেনিফার একগুয়ের মতো বলল–কেন, আমি শ্রীমতী কুপারের পাশে দাঁড়াবো, তার সঙ্গে আজই দেখা করবো।

হিদাস অ্যাসাইলামে গিয়ে জেনিফার সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করল। এই পাগলা গারদটি ওয়েস্টবেস্টারের বিশাল জঙ্গলের ধারে অবস্থিত। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একটি মাত্র দ্বার। তার দুপাশে দুজন রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে।

সুপারেন্টেনডেন্ট বিনয়ের সঙ্গে বললেন–হেলেন কুপারের সঙ্গে কারো দেখা করার অনুমতি নেই। তবে আপনার ব্যাপারটা আলাদা। কিন্তু আপনি যে এখানে এসেছেন তা খাতায় লেখা হবে না গোপন থাকবে। যদি আপনি রাজী থাকেন তাহলে ওঁকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারি।

-ধন্যবাদ।

রোগা পাতলা গড়নের মহিলা শ্রীমতী হেলেন কুপার। বয়স ষাটের কাছাকাছি। এই বয়সেও তার দেহে সৌন্দর্যের বান ডাকছে। তার চোখের তারা দুটি ঘন নীল। তার চোখমুখ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করছে। জেনিফারকে দেখে তিনি ভীষণ খুশী।

–আপনার পরিচয় আমার জানা নেই, আপনার এখানে আসার কারণও আমার অজ্ঞাত, তবুও কেন জানি না আপনাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে–হেলেন কুপার হাসিমুখে জেনিফারকে বললেন।

জেনিফার বলল–আমি একজন এ্যাটর্নি। একজনের পাঠানো একটা রিপোর্ট পড়ে জানতে পারলাম আপনি এখানে আছেন, অবশ্য তাকে আমি চিনি না।

হেলেন কুপার বললেন–একাজ অ্যালবার্ট ছাড়া আর কারও নয়।

–অ্যালবার্ট কে?

–গত পঁচিশ বছর সে আমার বাটলার ছিল। আমার মেয়ে ডরোথি। সে বিয়ে করার পর তাকে তাড়িয়ে দেয়। আপনার বয়স কম তাই আমাদের চারপাশে দিনের পর দিন কি পরিবর্তন হচ্ছে তার খোঁজ আপনি জানেন না। মানুষের মনের মধ্যে দয়া মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধা করুণা এসব কিছুই আর তিলমাত্র নেই। তার পরিবর্তে এসে ঠাঁই পেয়েছে লোভ ইর্ষা। তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

–আপনি কি আপনার মেয়ের মধ্যে এসব কিছু দেখতে পেয়েছেন? জেনিফার জানতে চাইল।

না, ডরোথির কোনো দোষ নেই। আসল শয়তান হল ওর স্বামী। আমার মেয়েকে সুশ্রী বলা চলে না। হাবার্ট ওকে বিয়ে করেছে কেবল টাকার লোভে। তাই যখন সে জানতে পারল সমস্ত বিয়ষসম্পত্তির মালিকানা আমার নামে তখন সে এটা ভালো মনে মেনে নিতে পারেনি।

–আপনার জামাইয়ের এই মনোভাব আপনি জানলেন কি করে?

–সে নিজের মুখে বলেছে। কোনো যুক্তির ধার ধারে না। আমার মৃত্যু পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে চাইল না, তার ইচ্ছে আমি জীবিত থাকতেই ডরোথির নামে সব সম্পত্তি লিখে

দিই। তাহলেই তো ও কিস্তিমাৎ করতে পারবে। আমি জামাইকে একেবারে বিশ্বাস করি না।

শ্রীমতী কুপার, আপনি কি সত্যি সত্যি মানসিক দিক থেকে অসুস্থ? আড় চোখে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী কুপার বললেন–কখনই না। তবে ডাক্তারদের মতে আমি সিজোফ্রেনিয়া আর পারানাইয়ার রোগী।

জেনিফার নিশ্চিত যে শ্রীমতী কুপার কোনভাবেই মানসিক রোগে ভুগছেন না।

–আপনাকে কি আপনার মেয়েজামাই জানিয়েছে যে এ ব্যাপারে তারা তিনজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই আপনাকে মানসিকভাবে সুস্থ নন বলে রায় দিয়েছেন।

শ্রীমতী হেলেন কুপারের চোখমুখ বিষাদের ছায়ায় ঢেকে গেল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন–আমায় বিষয় সম্পত্তির মোট মূল্য চল্লিশ লাখ ডলার। ওই টাকার শতকরা একভাগ দিয়ে বিশ্বের যে কোনো ডাক্তারকে কেনা যায় মিস পার্কার। তাছাড়া এখন আমার জামাই ওইসব বিষয়সম্পত্তির মালিক। তার হাত থেকে আমি কিছুতেই মুক্তি পাব না।

–আমি আপনার জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করবোবলেই জেনিফার সেখান থেকে বিদায় নিল।

প্লাজা টাওয়ার্স। নিউইয়র্কের অন্যতম সেরা বিলাসবহুল অঞ্চল। এখানে সব ধনী ব্যক্তিদের বসবাস। বিশাল এলাকা জুড়ে এই টাওয়ার্সটি তৈরি করা হয়েছে। শ্রীমতী কুপারের মেয়ে জামাই এই অঞ্চলের বাসিন্দা। জেনিফার তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সে নির্দিষ্ট বাড়িতে এসে পৌঁছল। সদর দরজার নেমপ্লেটে লেখা মিঃ অ্যান্ড মিসেস হাবার্ট হর্থন।

জেনিফার ভেতরে ঢুকল দরজা ঠেলে। সে দেখল মেয়ে সম্পর্কে শ্রীমতী কুপার একটিও মিথ্যে কথা বলেননি। রোগা, লম্বা, ট্যারা দেখতে ডরোথিকে। ডরোথির স্বামীকে হঠাৎ কেউ দেখলে ভাববে উনি বুঝি ওর বাবা। ডরোথির থেকে বয়সে অনেক বড় তিনি। চোখমুখ ও চেহারায় শয়তানের বাসা বাঁধা যেন।

-কি ব্যাপার বলুন তো, কেন এসেছেন এখানে–কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে হাবার্টের মুখ থেকে বিশ্রী আওয়াজ বেরোল।

জেনিফার ডরোথির দিকে তাকিয়ে বলল–আপনার মায়ের ব্যাপারে কিছু কথা ছিল।

ডরোথি বলল ঠিক আছে বলুন।

–ওঁর ভেতর পাগলামির লক্ষণ কখন দেখতে পেয়েছিলেন?

–আমাদের বিয়ের পর থেকে। আমার শাশুড়ি অর্থাৎ ডরোথির মা আমাকে সহ্য করতে পারেন না। তাছাড়া ডাক্তাররাও সে কথা বলেছেন।

ভুল বলেছেন, কেউই ঠিক রিপোর্ট দেননি। আমি ডাক্তারদের রিপোর্টগুলো দেখেছি। জেনিফার বলল।

হাবার্ট চীৎকার করে উঠল। ঠিক রিপোর্ট দেননি, একথার অর্থ কি?

–আসলে আপনি ও আপনার স্ত্রী ওঁর আচরণ সম্পর্কে ডাক্তারদের যা বলেছেন তার ওপর নির্ভর করে ওঁরা রিপোর্ট তৈরি করেছেন। যে সব লক্ষণ দেখা দিলে পাগল বলে প্রতিপন্ন করা যায় সেইসব লক্ষণ শ্রীমতী কুপারের মধ্যে কোনোদিন ছিল না, এখনও নেই। তাই বলছিলাম ওঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা ভুল, ঠিক নয়।

হাবার্ট বলল–আপনার কথাই যে ঠিক তার কি মানে আছে। আমরা তো জানি বহুদিন আগেই আমার শাশুড়ির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর আদালতও তা ঘোষণা করেছে।

জেনিফার বলল–হ্যাঁ, আদালতের রায়ও আমি পড়েছি, সেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিছুদিন অন্তর অন্তর আপনার শাশুড়িকে পরীক্ষা করাতে হবে।

হাবার্ট এবার দমে গেলেন। তিনি স্বাভাবিকভাব বললেন–আপনার বক্তব্য অনুযায়ী, আমার শাশুড়িকে ভালো ভাবে চিকিৎসা করালে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন? তাহলে তাকে আর পাগলা গারদে রাখার দরকার হবে না?

জেনিফার বলল–এই তো খুব সহজেই বুঝে ফেলেছেন। ওঁকে যাতে পাগলা গারদ। থেকে বের করে আনা যায় তার ব্যবস্থা আমি করবো। এবার জেনিফার ডরোথিকে লক্ষ্য করে বলল–আপনার মার যাবতীয় রোগের বিবরণ আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি। তার

থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোনোদিনই মানসিক রোগের শিকার হননি। তিনি দেহ ও মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ।

হাবার্ট বললেন–আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু সবাই জানে উনি একজন বৃদ্ধ উন্মাদ।

–আপনি কি আপনার শাশুড়িকে বলেছিলেন তার সব বিষয় সম্পত্তি আপনাকে দিয়ে দিতে? হঠাৎ প্রশ্নটা করায় হাবার্ট চমকে উঠেলেন। তবুও তিনি বললেন–এসব জেনে । আপনার কী লাভ।

কয়েক মুহূর্ত হাবার্টের দিকে তাকিয়ে জেনিফার বলল–আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। ধন্যবাদ, বলেই জেনিফার দরজার দিকে পা বাড়াল।

হাবার্ট এক লাফে জেনিফারের সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল। তারপর আহত বাঘের মতো গর্জন করে বললেন–বুঝতে পেরেছি, টাকার অঙ্কটা আপনার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আপনাকে এক হাজার ডলার দিচ্ছি। চুপচাপ এখান থেকে চলে যাবেন নাক গলাবেন না।

–দুঃখিত, আপনার সঙ্গে কোনোরকম সমঝোতায় আসতে চাই না আমি।

আপনার কি ধারণা এর জন্য আমার শাশুড়ি আপনাকে আরও বেশি টাকা দেবেন?

জেনিফার হাবার্টের চোখে চোখ রেখে কর্কশ স্বরে বলল–আমি আপনার মতো অর্থপিশাচ নই।.

আদালতে নতুন করে মামলা দায়ের করলে জেনিফার। সে আবেদন পেশ করল শ্রীমতী হেলেন কুপার সত্যিই মানসিক রোগের শিকার কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার। আদালত তার আবেদন মঞ্জুর করল। সরকারী মানসিক চিকিৎসকদের দিয়ে শ্রীমতী কুপারের পরীক্ষা করা হল। তাকে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা করলেন। আদালতের নির্দেশে হিদার্স অ্যাসাইলাম থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হল এবং আগের রায় খারজি করে তাকে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হল।

.

নিউ জার্সির খামারবাড়ি। সেখানে অ্যান্টোনিও গ্র্যানেলি ও মাইকেল মোরেটি একসঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলেন। খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন মাইকেল। সেদিনের প্রভাতী সংস্করণে প্রকশিত একটি প্রতিবেদনের ওপর তার চোখ আটকে গেল। তিনি আগ্রহান্বিত হয়ে প্রতিবেদনটি পড়লেন–শ্রীমতী হেলেন কুপার নামে এক ধনী বিধবাকে তাঁর মেয়ে জামাইয়ের ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার করেছে জেনিফার পার্কার নামী একজন এ্যাটর্নী। শ্রীমতী কুপারকে তার মেয়ে জামাইরা পাগল প্রতিপন্ন করে তার যাবতীয় সম্পত্তি কুক্ষিগত করেছে। তাদের বিরুদ্ধে জেনিফার আদালতে মামলা করে প্রমাণ করেছে যে শ্রীমতী কুপার সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ। তারপর আদালতের সাহায্যে শ্রীমতী কুপারের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে দিয়েছে।

পড়া শেষ করে মাইকেল শ্বশুরকে বললেন–মেয়েটির ক্ষমতা আছে বটে।

অ্যান্টোনিও গ্র্যানেলি প্রশ্ন করলেন–কোন মেয়েটি?

মাইকেল কাগজে জেনিফারের ছবি দেখিয়ে বললেন–এই যে জেনিফার পার্কার। আমি ভাবছি আমাদের কিছু কিছু কাজ ওকে দিয়ে করাবো।

অ্যান্টোনিও গ্র্যানেলি আঁতকে উঠলেন না! না! একদম নয়, ওসব মেয়ে উকিল দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না।

টনি, ওর প্রতিভা আছে।

তা মানি, কিন্তু দেখবে, আমাদের পরিবারের গোপন তথ্য যেন বাইরে ফঁস না হয়ে যায়।

–আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

.

সেদিন দুপুরবেলা। জেনিফার নিজের অফিসে বসে একমনে একটা মামালার ব্রীফ পড়ছে, এমন সময় তার টেলিফোনটা বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওপ্রান্ত থেকে অচেনা পুরুষের কণ্ঠস্বর জেনিফার শুনতে পেল।

-আমি মাইকেল মোরেটি বলছি। আপনার সঙ্গে দেখা হবে কি? বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মাইকেল মোরেটি? নামটা শুনেই তার সারা শরীরে শিহরণ জাগল। অতীতের এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তার মনে পড়ে গেল।

–বলুন, আপনার কি প্রয়োজন মিঃ মোরেটি।

–সেটা টেলিফোনে বলা যাবে না, মিস পার্কার। তবে এটা জেনে রাখুন আমার প্রয়োজন মিটলে আপনি আপনার যোগ্য পারিশ্রমিক পেয়ে যাবেন।

জেনিফার ভেতরে ভেতরে রাগে জ্বলছিল তবুও সেটা প্রকাশ না করে বলল–মিঃ মোরেটি, আপনার প্রয়োজন মেটাতে আমি বাধ্য নই। তাছাড়া আমার পারিশ্রমিকের ব্যাপারটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। কথাটা শেষ করেই সে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

জেনিফার যে লাইন কেটে দিয়েছে সেটা মোরেটি প্রথমে বুঝতে পারেন নি। যখন বুঝতে পারলেন তখন অনেকটা সময় চলে গেছে। মেয়েদের যে এত তেজ থাকতে পারে তা আগে তিনি জানতেন না। জেনিফারের ব্যবহার তাকে রুষ্ট করেনি বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। জেনিফার জানে না এইভাবে তার মুখের ওপর তাকে প্রত্যাখ্যান করার ফল কতটা মারাত্মক হতে পারে। তাঁর ক্ষমতাও যে কত অসীম তা হয়তো জেনিফার জানে না। তা নাহলে এই ভুলটা সে করতো না। যদিও কোনোদিন সময় সুযোগ আসে তাহলে জেনিফারের সব তেজ দম্ভ ভেঙ্গে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন তিনি।

.

স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম অ্যাডামকে বললেন–নির্বাচনী তহবিলের জন্য টাকা সংগ্রহের প্রথম পদক্ষেপ হবে শহরের বড় বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলি, সেইসব সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে পার্টি দিতে হবে। তাদের ডিনারে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তারপর তাদের কাছ থেকে টাকা চাইব। এমনকি টিভিতেও সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যাডাম, তুমি শুনতে পাচ্ছো?

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডাম ওয়ার্নার ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন তার মামাশ্বশুরকে। বললেন–হ্যাঁ, শুনছি স্টুয়ার্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অ্যাডামের মন পড়েছিল জেনিফারের দিকে, তার আশা নির্বাচনী প্রচার অভিযানে তার সঙ্গী রূপে জেনিফারও অংশগ্রহণ করুক। জয়লাভের আনন্দ তার সঙ্গে শেয়ার করার বাসনা তিনি প্রতিমুহূর্তে করছিলেন। জেনিফারের প্রসঙ্গটা স্টুয়ার্ট নিডহ্যামের কাছে উত্থাপন করতে গিয়েও তিনি বহু চেষ্টা করেও পারেননি। বরং ফল হয়েছে উল্টো। প্রতিবারই স্টুয়ার্ট অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন। মনে হয় তিনি যেন আগে থেকে বুঝতে পেরে সাবধান হয়ে যেতেন।

এইরকম অবস্থায় অ্যাডাম নিজেকে অসহায় বোধ করেন। অ্যাডাম জানেন তার স্ত্রী মেরি-বেথ ও জেনিফার সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ। তাদের দুজনের কেউ একে অন্যের তুল্য নয়।

জেনিফার আমার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। আমার সবকিছুতেই ওর সুখ। অন্যদিকে মেরিবেথ নিজের জগৎ নিয়েই বেশি খুশি থাকতে ভালোবাসে। অ্যাডাম মনে

মনে দুজন নারীর মূল্যায়ণ করতে লাগলেন। জেনিফার সূক্ষ্ম রসবোধে আপ্লুত। আর মেরিবেথ রসকষহীন। মেরিবেথ সঙ্গে থাকলে মনে হয় আমার বয়স অনেক বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় জেনিফারের পাশে থাকলে আমি যুবকের মতো মনোবল পাই। মেরিবেথ আমার ওপর নির্ভরশীল আর জেনিফার আত্মনির্ভরশীল।

আমার প্রেমিকা জেনিফারের সঙ্গে আমার যেমন বহুলাংশে মিল আছে তেমনি আমার স্ত্রী মেরিবেথের সঙ্গে অমিলও আছে প্রচুর। এত অমিল থাকা সত্ত্বেও আমি মেরিবেথকে ছেড়ে যেতে কখনই পারবো না।

শ্রীমতী হেলেন কুপারের মামলাটা মিটে গেছে বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে। তিনি পাগলাগারদ থেকে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। এরপর থেকে জেনিফারের হাতে একের পর এক মামলা আসছে। এবং প্রত্যেকটিতেই তিনি সফল হচ্ছেন। এবার বনি গ্যারেট নামে এক যুবতী মেয়ের একটি জটিল মামলার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ল। বনি গ্যারেট একবছর আগে রাস্তা পেরোতে গিয়ে একটি ট্রাকের নীচে পড়ে যায়, ফলে সে মারাত্মক ভাবে জখম হয়। হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ডাক্তাররা তার দুটি হাত ও পা কেটে বাদ দেন। সম্পূর্ণ পঙ্গু ও অসহায় হয়ে তাকে জীবন কাটাতে হয়। সে যে ট্রাকের নীচে পড়েছিল তার মালিকের বিরুদ্ধে সে মামলা দায়ের করে। তার উকিল তার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করেছিলেন। কিন্তু বিচারকের রায়ে সে তার ক্ষতিপূরণ পায়নি। বিচারক তার দাবী বাতিল করে দেন। এবার সেই মামলাটা ফাদার রায়ানোর মাধ্যমে জেনিফারের হাতে আসে। জেনিফার নতুন করে মামলাটি শুরু করে এবং সফলও হন। ট্রাকের মালিক ক্ষতিপূরণ বাবদ বনিকে ষাট লক্ষ ডলার দেন।

এই মামলায় জয় হবার পরের দিনের সবকটি দৈনিক সংবাদপত্রের শিরোনামে শুধু একটিই নাম জেনিফার পার্কার। ওই মামলার সমস্ত বিবরণ ও জেনিফারের ভূয়সী প্রশংসা ওই কাগজগুলিতে ছাপা হয়েছিল। সেদিনও সে অফিসে গেল। টেবিলের ওপর ফুলদানীতে সে দেখতে পেল চার ডজন টকটকে লাল গোলাপের হাসি। তার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। সে ভাবল অ্যাডাম এত কাজের মাঝেও তাকে ভোলেনি। তাকে ফুল পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

গোলাপ ফুলের গুচ্ছের মাঝখানে রাখা একটি সাদা কার্ড সে দেখতে পেল। সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল এটি অ্যাডাম পাঠাননি। এই কার্ডের প্রেরক মাইকেল মোরেটি। নামটি দেখেই তার শরীর মন রাগে ঘেন্নায় জ্বলে উঠল। জেনিফারকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কিভাবে এর জবাব দেবে জেনিফার ভাবছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার সেক্রেটারী সিনথিয়া ইন্টারকমে জানাল অ্যাডাম টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

রিসিভার তুলে নিয়ে জেনিফার বলল হ্যালো, ডার্লিং।

অভিনন্দন তোমার জয়লাভের জন্য। তুমি যেভাবে একের পর এক জটিল মামলাগুলির সমাধান করছে তাতে খ্যাতির শীর্ষে উঠতে তোমার বেশিদিন লাগবে না।

–আমার সৌভাগ্য।

না না, তোমার সৌভাগ্য নয়, সৌভাগ্য তোমার মক্কেলদের।

জেনিফার কোনো মন্তব্য করল না।

অ্যাডাম আবার বললেন–আজ বিকেলে একটু বেরোতে পারবে, ডার্লিং?

জেনিফার উৎসাহিত হয়ে বলল হ্যাঁ, পিরবো। কখন কোথায় যেতে হবে?

–ম্যারিওতে, বিকেল ছটায়।

ঠিক আছে। রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। এরপর সে সিনথিয়াকে ডাকল এবং ওই গোলাপ ফুলের গুচ্ছগুলো তাকে দিয়ে দিল।

ম্যারিও রেস্তোরাঁতে ছটা বাজার আগেই এসে অপেক্ষা করছেন অ্যাডাম। জেনিফার এসে পা রাখল ওই রেস্তোরাঁতে। সে দেখল অ্যাডাম কোণের একটা টেবিলে বসে আছেন। সে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল, অ্যাডামের প্রস্তাব যতই নির্মম হোক না কেন সে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করবে। অ্যাডামের চোখমুখও খুব শুকনো দেখাচ্ছে। হয়তো তিনিও মানসিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত। জেনিফার অ্যাডামের মুখোমুখি বসল। তার হাত নিজের হাতে নিয়ে অ্যাডাম বললেন–জেনিফার, মেরিবেথ আমাকে ডিভোর্স দিতে চাইছে।

জেনিফার চমকে উঠল। সে বোকার মতো অ্যাডামের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ওঁর বক্তব্য কিছুই বুঝল না।

জেনিফার জানে না ঘটনার সূচনা হয়েছিল আগের দিন একটি ডিনার পার্টিতে। নির্বাচনী তহবিল গড়াকে কেন্দ্র করে একটি ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই পার্টিতে

সস্ত্রীক অ্যাডামও উপস্থিত ছিলেন, ডিনার শেষে তিনি একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তারপর তারা যথাসময়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু ফেরার পথে মেরিবেথ গম্ভীর মুখে চুপচাপ ছিল।

জয়লাভের আশু সম্ভাবনায় অ্যাডাম পরিতৃপ্ত, তাই তিনি স্ত্রীর ভাবান্তর লক্ষ্য করেননি। অতএব শুতে যাবার আগে তিনি বললেন–আজকের সন্ধ্যাটা দারুণ কাটলো, তাই না মেরি?

মেরিবেথের সংক্ষিপ্ত উত্তর–হ্যাঁ।

কয়েক মুহূর্ত অ্যাডামের দিকে তাকিয়ে মেরিবেথ গম্ভীর গলায় বলেছিল–তোমার ও জেনিফারের সম্পর্কে আমার কিছু বলার ছিল।

সরাসরি আঘাতটা যে নিজের স্ত্রী করতে পারবে এইভাবে তা অ্যাডামের ভাবনার অতীত ছিল। একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন তিনি, ভাবছিলেন ওই সম্পর্কের কথা বেমালুম অস্বীকার করবেন। আবার মেরিবেথ বলল–কয়েকদিন আগেই কথাটা আমার কানে আসে। কি করবো ভেবে পচ্ছিলাম বলে এতদিন নীরবে সব সহ্য করেছি। কিন্তু এখন আর সহ্য করতে পারছি না। আমি স্থির করেছি, আমি তোমার সুখের পথে আর কাটা হব না।

অ্যাডাম বলার চেষ্টা করলেন–মেরিবেথ, আমি তোমার কথা কিছুই...।

মেরিবেথ তাকে বাধা দিয়ে বলল–আমি জানি আমাদের সম্পর্ক মোটেই ভালো নয়। হয়তো আমারই দোষ। স্ত্রী হিসেবে যা দেবার আমি তোমাকে তা দিতে পারিনি। কিন্তু আমি তোমাকে এখনও ভীষণ ভালোবাসি, তোমাকে আঘাত আমি করতে পারবো না। এক উজ্জ্বল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তোমার সামনে পড়ে আছে। আমি সেটা নষ্ট করতে চাই না। আমি তোমায় সুখী করতে পারি না। যদি জেনিফার পার্কারের সংস্পর্শে এসে তুমি সুখী হও তাতে আমি বাধা দেব না।

অ্যাডাম নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি চমকে উঠে বললেন–কি বলছো মেরি? যা ঘটেছে তাতে তো তোমার কোনো দোষ নেই, আমি...।

-প্লিজ অ্যাডাম, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আর। আমি যা সিদ্ধান্ত নেবার নিয়েছি।

অ্যাডাম আমতা আমতা করে বললেন কিন্তু কিন্তু, তোমার কি হবে, মেরি?

মেরিবেথ মুখ টিপে হেসে বলল–আমার জন্য চিন্তা কোরো না অ্যাডাম, আমি ভালই। থাকবো।

আমায় কিছু বলতে দাও, মেরি।

-তোমার কিছু বলার নেই। যা বলার আমিই বলে দিয়েছি। তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে তোমার জীবনটাকেই অতীষ্ঠ করে তুলবো শুধু, এতে তোমার বা আমার কোনো লাভই হবে না। নিশ্চয়ই আমার থেকে জেনিফারের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি বেশি আছে।

তাই সে তোমার মন প্রাণ জুড়ে বসে আছে। সবসময় তুমি ওর কথা ভাবো। কথাগুলো বলতে বলতে মেরিবেথ অ্যাডামের দিকে এগিয়ে এল। আবেগাপ্লুত হয়ে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। তার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল কতদিন বাদে তোমায় এত কাছে পেলাম বলোতো অ্যাডাম? তুমি আমায় ভালোবাসো না আমি জানি। তাই নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু একবার–এই শেষবার আমাকে একটু জড়িয়ে ধরবে, প্লীজ? আগের মতো আদর করবে? শুধু একবার তোমায় কাছে পেতে চাই আগের মতো।

–সত্যিই মেরি তোমার, তুলনা নেই।

ধন্যবাদ অ্যাডাম। মেরিবেথ হেসে বলল–আমি আজ থেকে তোমার সেরা বন্ধু হলাম। আমি চিরকাল তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখবো।

আগের রাতের মেরিবেথের ওই মারাত্মক সিদ্ধান্ত ঘোষণার কথা আবার মনে পড়ে গেল অ্যাডাম ওয়ার্নারের। তার বুকের ভেতরটা ঝড়ের তাণ্ডবে মুচড়ে যেতে লাগল।

জেনিফারকে অ্যাডাম বললেন–মেরিবেথই ডিভোর্সের পরিকল্পনা করেছিল। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে কি বলা উচিত তা জেনিফার ভেবে পাচ্ছে না। জেনিফারের ভাবনার সঙ্গে এর কোনো সংগতি নেই।

অ্যাডাম আবার বললেন আমাদের দুজনের কথা ভেবে ও এই সিদ্ধান্তে এসেছে। আর ও নিশ্চয়ই এতে সুখীই হবে।

–কথাটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আমার।

–জানি, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, আমরা বিয়ের পর থেকেই ভাইবোনের মতো রাত কাটিয়েছি। কথাটা তোমায় আগে বলিনি। এখনও বলতে সংকোচ হচ্ছে, তবু বলছি, মেরিবেথের মধ্যে সেক্সের অভাব।

জেনিফার আশ্চর্য হয়ে বলল–তাই নাকি?

-হ্যাঁ, ও তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছে।

মেরিবেথ, তার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে জেনিফার বেশ বিচলিত হয়ে পরল। সে বলল–ওঁর সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় অ্যাডাম। তার সামনে আমাকে অপ্রস্তুতে পড়তে হবে। তবে তুমি যদি বলো তাহলে আমি দেখা করতে রাজী আছি।

এবার চলো ফেরা যাক। তোমাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

না, তোমাকে যেতে হবে না, আজ আমি একাই যাব।

.

অ্যাডাম ওয়ার্নারের বাড়ির পাশ দিয়ে হাডসন নদী বয়ে গেছে। কয়েক একর জমির ওপর তার বাড়িটি অবস্থিত। পরদিন সকালে জেনিফার এসে হাজির হল সেখানে। সে নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিল। নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে সে গাড়ি থেকে নামলো। সে দরজার গায়ে লাগানো কলিং বেল টিপলো।

কিছু সেকেন্ড কেটে গেল। চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এক সুন্দরী মহিলা দরজা খুলে দিল। এই বয়সেও তার চেহারা অসম্ভব আকর্ষণীয়। সুন্দরীর পরনে উলের স্কার্ট ও সিল্কের ব্লাউজ এবং গলায় মুক্তোর মালা। লম্বা বাদামী চুল। জেনিফার অনুভব করল কেমন যেন সেকেলে রুচি ও ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী এই মহিলাটি।

সুন্দরী মহিলা সলজ্জ হেসে বলল–আমি মেরিবেথ, ভেতরে এসো। তারপর জেনিফারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। ১. জেনিফার তার পেছন পেছন বাড়ির ভেতরে ঢুকল। বিশাল বিশাল সব ঘর। সেগুলি দামী ও দুর্লভ প্রাচীন শিল্প সামগ্রী ও সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে সাজানো। তারা ড্রইং রুমে এসে বসল। একজন বাটলার রুপোর টি সেটে চা এনে দিল।

চা খেতে খেতে মেরিবেথ বলতে শুরু করলো–অ্যাডামকে নিশ্চয়ই তুমি খুব ভালোবাসো।

জেনিফার লজ্জিত হয়ে বলল–মিসেস ওয়ার্নার, আমাদের তেমন কোনো প্ল্যান নেই।

অন্তরঙ্গতার সুরে মেরিবেথ বলল–তা আমার জানার দরকার নেই। আমরা প্রেম করে বিয়ে করেছি। কিন্তু বিয়েটা সুখের হয়নি। তা অবশ্য তোমাকে অ্যাডাম বলেছে। কিন্তু আজও আমরা উভয়ে উভয়কে আগের মতোই ভালোবাসি। প্রথম দেখাতেই আমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। ছোট থেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। যেখানে গিয়েছি সেখানেই আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা যেত। যা খেতাম দুজনে ভাগ করে খেতাম। মানুষ তো আর সব সময় এক থাকে না। তাই আমাদের সম্পর্কের মধ্যেও চিড় ধরল।

মেরিবেথের দিকে তাকিয়ে জেনিফার বলল–আমি আপনার কাছে কতটা কৃতজ্ঞতা ভাষায় বোঝাতে পারবো না। আমি ভেবেছিলাম আমাদের এই সাক্ষাৎকার হয়তো কুৎসিত তর্কযুদ্ধে পরিণত হবে। আপনি আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করছেন। তাই অ্যাডামকে সমর্থন না করে পারছি না আমি সত্যিই আপনার কোনো তুলনা হয় না।

মেরিবেথ বলল–ধন্যবাদ। তবে আমি এখনই ডিভোর্স নিচ্ছি না। অ্যাডামের স্বার্থের কথা চিন্তা করে নির্বাচন অবধি আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

মেরিবেথের মুখে নির্বাচনের কথা শুনে জেনিফার চমকে উঠল। সে এই ব্যাপারটা নিয়ে অত চিন্তা-ভাবনা করেনি।

–সবাই ধরে নিয়েছে অ্যাডাম সেনেটর হবে, এই সময় ডিভোর্স করলে ব্যাপারটা আর কারও অজানা থাকবে না। এর ফলে ওর ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকছে। আর তো মাত্র ছটা মাস। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু তোমার এতে আপত্তি নেই তো?

না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে এক মত। দেখবেন অ্যাডাম সেনেটর হিসেবে খুব নাম করবেন।

মেরিবেথ বলল–আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছি অ্যাডাম ওয়ার্নার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত।

এরপর জেনিফার আগামী দিনগুলির কথা নতুন করে ভাবতে বসলো। আর কিছুদিন পরে সে অ্যাডামের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা পড়বে। অ্যাডাম সেনেটর হয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে যাবে। তাকেও সেখানে চলে যেতে হবে। তখন সে আর নিউইয়র্কের স্বাধীন উকিল থাকবে না, হয়তো অ্যাডামের ইচ্ছেতে তাকে প্র্যাকটিস ছেড়ে দিতে হবে।

মেরিবেথকে বিদায় জানিয়ে জেনিফার ফিরে এল নিজের ফ্ল্যাটে। তার কয়েক সেকেন্ড পড়ে অ্যাডামের ফোন এল। জেনিফার হ্যালো বলতেই অ্যাডাম জানতে চাইল- মেরিবেথকে কেমন লাগল জেনি?

চমৎকার, অ্যাডাম।

–মেরিবেথও তোমার সম্পর্কে ওই একই কথা বলেছে। আচ্ছা আমাদের বিয়েটা টাইমস স্কোয়ারে হলে কেমন হবে, বলো তো?

-খুব ভালো হবে, তবে আমাদের আরও ছটা মাস অপেক্ষা করতে হবে, ডার্লিং।

–কিন্তু, কেন বলো তো?

–নির্বাচন শেষ হোক, তুমি জয়যুক্ত হও, সেনেটর পদ লাভ করো, তারপর না হয় করা যাবে। তোমার ডিভোর্সের খরবটা জানাজানি হলে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার চরিত্রে কালি ছেটাবে, এতে তোমার ক্ষতি হতে পারে। আমি হতে দিতে পারি না। তাই ছমাস অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

.

এদিকে অ্যাডাম ওয়ার্নার ও জেনিফার পার্কার অবাধে মেলামেশা করতে শুরু করেছেন। তবে তারা একটু সতর্ক হয়েছেন। অ্যাডামের নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়েছে, প্রতিটি গণমাধ্যমের সাহায্যে অ্যাডাম ইতিমধ্যেই দেশের জনমানসের খাতির ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। তাই তাদের, ঘনিষ্ঠতা লোকসমক্ষে এসে পড়লে ঝঞ্ঝাট বাড়বে বই কমবে না।

একরাতে জেনিফারের ফ্ল্যাটে দুজনে বসে বসে ফায়ারপ্লেসে আগুনের উষ্ণ তাপ উপভোগ করছেন। এমন সময় অ্যাডাম বলল–প্রেসিডেন্টের বউ হতে তোমার কেমন লাগবে, জেনি?

–ভীষণ ভালো লাগবে।

–আমি ভোটে জিতলে তোমাকেও আমার সঙ্গে ওয়াশিংটনে গিয়ে থাকতে হবে জেনি, নাকি নিউইয়র্ক থেকে তোমার আইন ব্যবসা চালিয়ে যাবে?

–আমি শুধু তোমাকে চাই, আর কিছুতে আমার লোভ নেই অ্যাডাম।

জেনিফারের ঘন তামাটে চুলে বিলি কাটতে কাটতে অ্যাডাম বললেন, আমার জন্য তোমাকে ওকালতি ছাড়তে হবে না। তবে তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমারও ভালো লাগবে না জেনি।

তারা অনেক রাত অবধি গল্প করলেন, শেষে একসময় দুজনে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

এদিকে জেনিফারের পসার আকাশচুম্বী হয়ে উঠল। তার মক্কেলদের নামের তালিকায়। কে নেই? বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চেয়ারম্যান, সেনেটর, ফিল্মস্টার, খেলোয়াড়, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সবাই এসে তার অফিসে ভীড় করেন। তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন আর রাজনৈতিক দলের নেতাদের থেকে শুরু করে চোর, ডাকাত, পকেটমার, ধাপ্পাবাজ, বেশ্যা কেউ বাদ গেল না। জেনিফার যেমন জলের মতো টাকা আয় করতে লাগল তেমনি, তার অফিসের কর্মচারীরাও মোটা টাকার বেতন ও বোনাস পাওয়া থেকে বঞ্চিত হল না। এর পাশাপাশি আছে নানারকম দামী উপহারের সম্ভার।

বিভিন্ন নামী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাকে মামলা লড়তে হয়। এর ফলে দেশ বিদেশের সেরা আইনজ্ঞদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে।আর এঁদের মধ্যে অনেকেই তাদের স্বীয় দেশে এক একজন আইনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। জেনিফার নিজের প্রতিভা বলে এঁদের অনেককেই পরাস্ত করতে পেরেছে। এবার আইনের উচ্চতর শিক্ষণ লাভের জন্য সে আমেরিকার কলেজ অফ ট্রায়াল ল ইয়ার্সে ভর্তি হল।

খবরটা পেয়ে অ্যাডাম চমকে উঠলেন, জেনিফারকে ফোনে বললেন–তোমার ক্ষমতার বাহবা না দিয়ে পারছি না। যেখানে দেশের শীর্ষস্থানীয় উকিলরা অনেক কসরত করে ভর্তি হন, আর সেখানে কিনা তুমি ভর্তি হয়েছে?

–সেদিক থেকে মেয়ে উকিল হিসেবে আমি একটা নজির সৃষ্টি করতে পেরেছি, কী বলল।

মামলার জন্য তাকে ম্যানহাটানে যেতে হয়। সেখানে তাকে প্রবল প্রতিপক্ষ ডি সিলভার মুখোমুখি হতে হত। যতই জেনিফারের কৃতিত্বের পারদ বাড়ছিল ততই রবার্ট সিলভার জমে থাকা পুরনো রাগও বাড়ছিল। একদিন একটি মামলার আসামী পক্ষের উকিল হয়েছিল জেনিফার আর সরকারী উকিল রবার্ট ডি সিলভা ছিলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী। জেনিফার সওয়াল করার সময় রবার্ট ডি সিলভার বিরুদ্ধে এমন একটি যুক্তি দেখিয়েছিল যা শুনে বিচারক পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

ওই মামলায় রবার্ট ডি সিলভা সাক্ষী হিসেবে বারো জন বিশেষজ্ঞকে এনেছিলেন। তারা সবাই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু জেনিফারের হাতে কোন বিশেষজ্ঞ ছিল না। সওয়াল করতে উঠে সে জুরীদের উদ্দেশ্যে বলল–আকাশের বুকে যেসব তারা বা নক্ষত্র আছে তাদের দূরত্ব মাপতে বা স্পেসশিপ তৈরি করতে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় আমরা সাধারণ মানুষদের ডাকি। তাদের মতামত নিই, কিন্তু তাদের কেউই বিশেষজ্ঞ নন। আমি জানি খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক ঈশ্বরের সন্তান যীশু, তিনিও এই কাজ করেছিলেন। তার এই যুক্তি খন্ডন করার সাধ্য রবার্ট ডি সিলভার ছিল না। শেষপর্যন্ত সেই মামলায় জেনিফারেরই জয় হল।

.

প্রতিবারই জেনিফার লক্ষ্য করেছে মামলা জেতার পর তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চার ডজন তাজা গোলাপ ফুল পাঠান মাইকেল মোরেটি। ক্রোধে অন্ধ হয়ে সে কার্ডটাকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে এবং সেক্রেটারী সিনথিয়াকে ডেকে নির্দেশ দিত ওই ফুলগুলো ফেলে দিতে। মাইকেলের এই বেয়াদপি সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতো না। শেষে বিরক্ত হয়ে মাইকেলকে কড়া ও তিক্ত ভাষায় একটা চিঠি লিখে পাঠাল। তাতে উল্লেখ ছিল–তিনি যেন আর কখনও তাকে গোলাপ ফুল না দেন। মাইকেল মোরেটি চিঠিটি পড়ে কি বুঝেছিলেন তা তিনি নিজেই জানেন। কিন্তু মামলায় জেতার পর জেনিফারকে গোলাপ ফুল ও অভিনন্দন বার্তা পাঠানো বন্ধ করেননি।

.

কিছুদিন বাদে ফাদার রায়ান একজন মক্কেল পাঠালেন জেনিফারের কাছে। এই মক্কেলটির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক ডাকাতির অভিযোগ আনা হয়েছে। তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নাম তার পল রিচার্ডস। এক বর্ষার দিনে একটি ব্যাঙ্কে ঢুকে দেড় লাখ ডলার লুঠ করে সে পালিয়ে গিয়েছিল একটি সবুজ রঙের সিভানে চেপে। তার পরনে ছিল লম্বা কালো বর্ষাতি। কলার তুলে মুখটাকে ঢেকে রেখেছিল। লম্বা বর্ষাতির আড়ালে একটি বন্দুক লুকিয়ে রাখতে তার একটুও অসুবিধা হয়নি। তাই সে এই ঘোর বর্ষার দিনটি ডাকাতি করার জন্য বেছে নিয়েছিল।

ব্যাঙ্কে ঢুকে বন্দুক দেখিয়ে সে ক্যাশিয়ারকে নির্দেশ দিয়েছিল সব টাকা কড়ি তার হাতে তুলে দেবার। ক্যাশিয়ারও ভয়ে নীরবে পল রিচার্ডসের নির্দেশ মেনেছিল। সেইসময় যারা

ওই ব্যাঙ্কে উপস্থিত ছিলেন তারা বলেছেন ওই গাড়ির নম্বর প্লেটের ওপর এত কাদা মাখানো ছিল যে তাদের পক্ষে ওই নম্বর পড়া সম্ভব হয়নি।

ওই ডাকাতির তদন্তের ভার পড়েছিল এফ বি আই-এর ওপরে। এফ বি আই কম্পিউটারের সাহায্যে জানতে পেরেছে ওই ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে পল রিচার্ডসের দ্বারা। বার বার ওই নামটি কম্পিউটারের পর্দায় ফুটে উঠছিল। এখন সে জেল হাজতে বন্দী। আছে।

ফাদার রায়ানের অনুরোধে মামলাটি হাতে নিল জেনিফার। সে পল রিচার্ডসের সঙ্গে কথা বলার জন্য জেলে এসে হাজির হল।

জেনিফার লক্ষ্য করল, লোকটির বয়স পঞ্চাশের ওপর, চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে, তার মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিল সত্যিই কি এই লোকটি ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছে?

পল জেনিফারকে দেখেই বলল বিশ্বাস করুন, আমি ব্যাঙ্ক ডাকাতি করিনি। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি।

জেনিফার এখন আর দিব্যি বা শপথে প্রভাবিত হয় না। সব মক্কেলই নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য এইরকম দিব্যি বা শপথ করে থাকে। তাই সে বলল–আগে আমার কথা শোনেন, যে মক্কেল মিথ্যে সাক্ষী দেয়, তার মামলা আমি নিই না।

বিশ্বাস করুন, করুণ স্বরে আবার পল রিচার্ডস বলল।

–তবে এফ বি আই তোমাকে গ্রেপ্তার করল কেন?

একবার ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে আমি ধরা পড়েছিলাম। সেও দশ বছর আগের কথা।

–সেবার কি তুমি রেনকোট পরে ও ছোটো বন্দুক নিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকেছিলে?

–আজ্ঞে হ্যাঁ

–এবারের ডাকাতি তুমি করোনি বলছো?

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

–তাহলে কে করলো?

–অন্য কেউ হবে, আমি বলতে পারবো না।

এই মামলার প্রাথমিক শুনানী পড়েছে জজ ফ্রেড স্টিভেন্স-এর এজলাসে। ইনি ভয়ংকর কড়া মেজাজের মানুষ। এঁর মন কঠিন ধাতুতে গড়া। এঁর বিচারে যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে তিনি সেই আসামীকে বহুদূরের এক দ্বীপে স্থানান্তরিত করবেন যেখান থেকে কেউ জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারে না। এছাড়া তিনি ইসলামদের মতো চুরির অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর দু হাত কেটে ফেলার বিধানকেও সমর্থন করেন। এসবই জেনিফারের অজানা নয়। এই ধরনের বিচারকের কাছে নিজের মক্কেলের নির্দোষিতা প্রমাণ করা ভীষণ শক্ত কাজ। তাই পল রিচার্ডসের মামলা ওঁর এজলাসে

পড়েছে শুনে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। শেষে কোনো উপায় না পেয়ে কেন বেইলির সাহায্য নিল।

কেন এলে তার কাছে জজ স্টিভেন্স সম্পর্কে গোপন তথ্য জানতে চাইল জেনিফার। কেন বেইলি শুনে চমকে উঠল। সে তাকে নিরস্ত করতে চাইল। কিন্তু জেনিফার জেদী মেয়ের মতো বলল–যেভাবেই হোক আমাকে এই মামলাটা লড়তে হবে।

এবার আর রবার্ট ডি সিলভা নয়। এবার ব্যাঙ্ক ডাকাতির ওই মামলার দায়িত্ব ভার নিয়েছেন সরকারী উকিল কার্টার গ্লিফোর্ড। কার্টার গ্লিফোর্ডের বয়স হয়েছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি। একদিন তিনি জেনিফারকে বললেন কি মিস পার্কার, মামলা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে?

জেনিফার শান্তভাবে বলল–আমি আমার মক্কেলকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবো মাত্র মিঃ গ্লিফোর্ড।

মিঃ গ্লিফোর্ড মুচকি হেসে বললেন, এবার তাহলে আপনার হার নিশ্চিত। তা নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হবে।

.

জজ ফ্রেড স্টিভেন্সের এজলাসে মামলা শুরু হল–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম পল রিচার্ডস।

জজ বললেন–আসামী হাজির? পেশকার বলল হাঁ হুজুর।

দুপক্ষের উকিলরা এসেছেন?

–হ্যাঁ ধর্মাবতার।

সরকারী তরফের উকিল কার্টার গ্লিফোর্ড এবং আসামী তরফের উকিল জেনিফার পার্কার উঠে দাঁড়ালেন। তারা যে যার পরিচয় দিলেন।

জেনিফারের দিকে তাকিয়ে বিচারক বললেন–আপনার প্রতিভা ও সুনামের কথা আমি শুনেছি, মিস পার্কার। একটা কথা জেনে রাখুন, আমি অযথা আদালতের সময় নষ্ট করতে দেব না। সওয়াল আর শুনানী শেষ হলেই আমি বিচারের দিন ধার্য করবো। আপনি কি জুরীদের মতামত নিতে আগ্রহী?

না, ধর্মাবতার। আমার মতে সওয়াল আর জেরা এই মামলার পক্ষে যথেষ্ট। জজ ফ্রেড স্টিভেন্স অবাক হয়ে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে বললেন–সে কি?

হ্যাঁ, ধর্মাবতার, আমার মতে আমার মক্কেলকে ফাঁসানোর মতো যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ সরকারী উকিলের হাতে নেই।

কার্টার গ্লিফোর্ড বাধা দিয়ে বললেন–ধর্মাবতার, যে অপরাধে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই একই অপরাধের জন্য তাকে এর আগেও একবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সাজাও পেয়েছিল সে। সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের ভেতর থেকে কম্পিউটার আসামীকে খুঁজে বের করেছে। তার বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করা হয়েছে তা খারিজ করার অভিপ্রায় সরকারের নেই।

বিচারক জেনিফারকে প্রশ্ন করলেন–আপনার কিছু বলার আছে, মিস পার্কার?

আছে ধর্মাবতার, এফ বি আই ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ডাকাতি হওয়া কোনো টাকাকড়ির হদিস পায়নি। তাছাড়া এমন কোনো সাক্ষী নেই যিনি ডাকাতির অভিযোগে পল রিচার্ডসকে সনাক্ত করতে পারেন। অথচ মাননীয় সরকারী অ্যাটর্নি নিজের কল্পনার ওপর নির্ভর করে আমার মক্কেলকে ওই অপরাধের জন্য দায়ী করছেন।

জজ জেনিফারের কাছে জানতে চাইলেন–কিন্তু কম্পিউটার যে তথ্য দিয়েছে তার কি কোনো মূল্য নেই আপনার কাছে?

জেনিফার বলল–ধর্মাবতার, ওইখানেই তো জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

জজ গম্ভীর গলায় বললেন–তা তো স্বীকার করতেই হবে। মানুষ সাক্ষীকে জেরা করা সহজ কিন্তু যন্ত্রের ক্ষেত্রে সেটা খুবই শক্ত ব্যাপার।

বিনয়ে গদগদ হয়ে কার্টার গ্লিফোর্ড বললেন–আপনি ঠিক বলেছেন ধর্মাবতার।

–এফ বি আই কি ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করে, আই বি এম-এর ৩৭০/১৬৮ কী?

জেনিফার বলে উঠল–ঠিক বলেছেন, ধর্মাবতার, এর মতো সূক্ষ্ম ও অভ্রান্ত কম্পিউটার অত্যন্ত দুর্লভ।

জজ আবার বললেন–তাহলে আপনি কি ওই কম্পিউটারের রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান, মিস পার্কার।

এতখানি ধৃষ্টতা দেখানোর মতো সাহস আমার নেই ধর্মাবতার। এমন একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এই আদালতে উপস্থিত আছেন যিনি ৩৭০/১৬৮ কম্পিউটার প্রস্তুত করেন। যে কম্পিউটার থেকে আমার মক্কেলের নামের রিপোর্ট পাওয়া গেছে তার প্রোগ্রামার উনি।

–তিনি কে?

পেছনের সারিতে বসে থাকা একজন লম্বা রোগা ভদ্রলোক বিচারকের সামনে এসে দাঁড়াতেই জেনিফার তার পরিচয় দিলেন–এঁর নাম এডওয়ার্ড মনরো, একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। আমি ওঁকে অনুরোধ করেছি সম্ভব্য অভিযুক্ত আরও কয়েকজনের নাম কম্পিউটারের কাছ থেকে জেনে নিতে। সেই রিপোর্ট থেকে আমি দশজন লোককে বেছে নিয়েছি, যাদের সঙ্গে আমার মক্কেলের হুবহু মিল আছে। সনাক্তকরণের সুবিধার জন্য মিঃ মনরো বয়স, উচ্চতা, চোখের মনির রং, জন্মস্থান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব, দিয়েছেন। তিনি আমার মক্কেলের নাম পেয়েছেন ওই সব তথ্যের ওপর নির্ভর করে।

এসবের মাধ্যমে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, মিস পার্কার।

আমি বোঝাতে চাইছি এই যে কম্পিউটার ওই দশ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির মধ্যে–: একজনকে ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে সনাক্ত করেছে। ...)

–একথা সত্যি? বিচারক মিঃ মনরোকে জিজ্ঞাসা করলেন।

–হ্যাঁ, ধর্মাবতার, বলে এডওয়ার্ড মনরো তার ব্রীফকেস খুললেন। তার ভেতর থেকে একটি রিপোর্ট বের করে জজের সামনে রাখলেন।

রিপোর্টটায় চোখ বোলানোর সঙ্গে সঙ্গে জজ রাগে হুংকার দিয়ে উঠলেন আমার সঙ্গে কি আপনি রসিকতা করছেন, মিঃ মনরো।

–আজ্ঞে না, ধর্মাবতার, মিঃ মনরো ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন।

–আপনার কম্পিউটার তো আমাকেও সন্দেহভাজনের তালিকায় রেখেছে, জজ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তাহলে কি আমিও ব্যাঙ্ক ডাকাতদের একজন?

জেনিফার পরিস্থিতিটা সামলাবার জন্য বলতে শুরু করল–ধর্মাবতার, আমরা সবাই জানি কম্পিউটার একটি যন্ত্র। এটি যুক্তি বা বুদ্ধির ধার ধারে না। আপনার আর আমার মক্কেলের বয়স, উচ্চতা, জন্মস্থান এক। এমন কি আপনারা দুজনেই সবুজ রঙের সিভান গাড়ি চড়েন। মাননীয় সরকারী উকিলের হাতে এটাই একমাত্র প্রমাণ। আমার বক্তব্য হল এই, দশ বছর আগে পল রিচার্ডর্স ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে ও ধরা পড়ে। সে খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের সব লোক জানতে পারে। তাই যে কোনো লোক তার অপরাধের ধরন, অনুকরণ করে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতেই পারে। আর মাঝখান থেকে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল পল রিচার্ডস নিজে। এতেই বোঝা যাচ্ছে, আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে সরকারী উকিলের যুক্তি কতটা ভিত্তিহীন।

কার্টার গ্লিফোর্ড নীরবে জেনিফারের সব অপমান হজম করে নিলেন।

জজ স্টিভেন্স কম্পিউটার রিপোর্টে আরেকবার চোখ বোলালেন। তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি বললেন–আচ্ছা মিস পার্কার, মনে করুন আমার থেকে বয়সে ছোট, রোগা ও নীল রঙের গাড়ি চড়ে এমন কেউ এই আদালতে উপস্থিত আছেন, তাহলে আপনি কিভাবে সমাধান করতেন?

ধর্মাবতার, আপনাকে তো আমি আগেই জানিয়েছি, কম্পিউটার আমাকে আরও দশজন সম্ভাব্য সন্দেহজনক ব্যক্তির নাম ও তাদের বিবরণ দিয়েছে। আপনার বর্ণনা অনুযায়ী একজন আছেন এখানে, আমি তাকেও সন্দেহভাজনদের একজন ধরে নেব। এইরকম একজন হলেন রবার্ট ডি সিলভা।

জেনিফার নিজের অফিসে বসে আছে। তার হাতে ধরা একটি খবরের কাগজ। এমন সময় সেক্রেটারী সিনথিয়া পল রিচার্ডসের আগমন বার্তা জানাল।

–ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও, সিনথিয়া।

কালো রেনকোট পরিহিত পল রিচার্ডস একটু পরেই ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল। সে বলল–আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম, মিস পার্কার।

মিঃ রিচার্ডস, দেখলেন তো ন্যায়ের জয় সর্বত্র।

–হ্যাঁ, দেখলাম। আমি কিছুদিনের জন্য শহর ছেড়ে বাইরে যাচ্ছি, বলেই জেনিফারের হাতে লাল ফিতেয় বাঁধা একটা লজেন্সের বাক্স দিল সে। আপনার জন্য এই ছোট্ট উপহারটি এনেছি।

জেনিফার বলল–ধন্যবাদ পল।

মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে পল রিচার্ড বিদায় নিল।

বাক্সটা খুলতেই জেনিফারের চোখের সামনে ভেসে উঠল দশ হাজার ডলার, ওই বাক্সটার ভেতর থরে থরে সাজানো। সে তো অবাক।

.

একদিন বিকেলে মাইকেল মোরেটি একটা কালো রঙের ক্যাডিলাক লিমুজিন চড়ে আদালতে এলেন। গাড়ি থেকে তিনি নামলেন না। ফুটপাতের ধার ঘেঁষে গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে ভেতরে বসে রইলেন। ঠিক সেই সময় জেনিফার আদালত থেকে বের হয়ে গাড়িটার কাছাকাছি আসতেই মাইকেল মোরেটি গাড়ি থেকে নেমে তার পথ আটকে দিলেন। জেনিফারকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি বললেন–আপনার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করছি, মিস পার্কার।

জেনিফার রাগে ফুঁসে উঠে বলল–আমার পথ আটকাবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? আমার সামনে থেকে সরে যান।

আহা, রাগ করছেন কেন? আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলব। দশ মিনিটের বেশি সময় নেব না। আপনাকে ধৈর্য ধরে ঠান্ডা মাথায় শুনতে হবে। অবশ্য তার বিনিময়ে আপনি পারিশ্রমিক পাবেন। আমার গাড়িতে উঠে পড়ুন, আপনার অফিসে পৌঁছে দেব। আর সেই ফাঁকে আমার কথা বলা হয়ে যাবে।

জেনিফার কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে ভাবল দেখাই যাক না লোকটার কি মতলব। তাই সে বলল ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে যাব আমি, কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব আমি চাই।

মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললেন–বলুন কি প্রশ্ন?

-খামের ভেতর মরা ক্যানারী পাখী ঢুকিয়ে আমার হাত দিয়ে ক্যামিলো স্টেলাকে পাচার করার অভিসন্ধি কে করেছিল?

মাইকেল মোরেটি স্বীকার করলেন–আমি।

রাগে জেনিফারের মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল, একবার তার মনে হয়েছিল মাইকেলকে খুন করে ফেলে। কিন্তু তা পারবে না বুঝতে পেরে চুপচাপ গাড়িতে উঠে বসল। তারপর ড্রাইভার মোরেটির নির্দেশে জেনিফারের অফিসের দিকে গাড়ি ছোটালো।

মাইকেল মোরেটি এতক্ষণে জেনিফারকে বললেন–আপনার জন্য আমি গর্ব অনুভব করি।

–আপনি নিশ্চয়ই আমাকে একথা শোনানোর জন্য গাড়িতে তোলেন নি?

না তা তো নয়ই, এর পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে।

–সেটা কি?

অতীতে আপনার যে ক্ষতি আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দিন আমাকে। আমি সম্ভ্রান্ত অনেক মক্কেল পাঠাতে পারি। তারা অনেক টাকা পারিশ্রমিক দেবে। আর এতে আপনি প্রচুর টাকার মালিক হতে পারবেন।

মিঃ মোরেটি, আর কোনো কথা নয়, যথেষ্ট হয়েছে, জেনিফার যে মোরেটির ওপর মোটেই সন্তুষ্ট নয় তা হাবভাবে বুঝিয়ে দিল।

আমি আপনার উপকার করতে চাইছি আর আপনি আগের মতই রাগ দেখাচ্ছেন।

আপনার উপকার আমার দরকার নেই, প্লীজ। কোনও মক্কেল আমার কাছে পাঠাবেন না।

-কেন?

–কেননা আমি মাফিয়াদের সেবা করতে রাজী নই।

ট্রাফিকের লাল বাতি দেখে মোরেটির লিমুজিন দাঁড়িয়ে পড়ল। এই সুযোগে জেনিফার গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। তারপর বলল–আমার অফিস সামনেই, আমি এইটুকু পথ হেঁটেই যেতে পারবো। লিফট দেবার জন্য ধন্যবাদ।

-আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?

আর কোনোদিন দেখা না হওয়াই ভালো, মিঃ মোরেটি। বলেই জেনিফার বড় বড় পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মাইকেল মোরেটি ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ তিনি নিজের মনেই হেসে উঠলেন। অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে জেনিফারকে ইচ্ছে মতো ভোগ করতে পারবেন এই সরল সত্যটা তিনি উপলব্ধি করলেন।

.

জেনিফারের মক্কেলের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তাদের মধ্যে রিক আর্লেন ছিলেন একজন। তিনি আবার রকস্টার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি হঠাৎ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জেনিফারকে। তাই সে প্লেনে চাপল অক্টোবর মাসে একদিন। সে এসে হাজির হল মন্টি কার্লোতে। এখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাগম ঘটেছে ওই অনুষ্ঠানে। ইউরোপের রাজা, মহারাজা আর একধিক সুইস ব্যাঙ্কের মালিক থেকে শুরু করে পেলের মতো নামী ফুটবল তারকাও আছে তাদের মধ্যে। সেই অনুষ্ঠানে রিক আর্লেন রক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। জেনিফারের দেশ থেকে মন্টি কালোর দূরত্ব প্রায় তিন হাজার মাইল। এতদূরে একজনের আমন্ত্রণে এসে জেনিফার কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছিল, হাতে অনেকগুলো মামলা রয়েছে। মক্কেলদের তার ওপর অনেক আশা। তবুও আল্পস পর্বতমালার নীচে এইরকম একটি বিলাস ব্যাসনের হাতছানি এবং পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যের আকর্ষণই তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। অনুষ্ঠানের শেষে খাওয়াদাওয়ার এলাহী ব্যাপারও ছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে জেনিফার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভূমধ্য সাগরের তীরে একটি বিশাল ভিলা রিক আর্লেন ভাড়া নিয়েছিলেন। জেনিফারের অসুস্থতার খবর

শুনে তিনি তাকে সেই ভিলাতে নিয়ে এলেন। জেনিফারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে রিক একজন ডাক্তার ডেকে আনলেন।

ডঃ অ্যান্ড্রে মন্টিউক্স এলেন জেনিফারকে দেখতে। আশির কোঠা পেরিয়ে গেছেন তিনি। তার সঙ্গে একটি কালো ব্যাগ। তিনি জেনিফারের খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার ইশারায় রিক আর্লেন ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

ডাক্তার এবার জেনিফারকে জিজ্ঞাসা করল–আপনার কি হয়েছে?

মনে হচ্ছে আমার বিউবনিক প্লেগ হয়েছে।

–জিভ দেখি।

জেনিফার জিভ দেখাল। এরপর ডাক্তার শরীরের তাপ পরীক্ষা করলেন ও নাড়ির গতি পরীক্ষা করলেন।

ডাক্তার কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। সবশেষে বললেন–আপনাকে আরও ভালোভাবে দেখতে হবে, আগামীকাল আমার চেম্বারে আসুন।

জেনিফার স্বাভাবিক সুরে বলল–ঠিক আছে।

পরদিন সকাল। জেনিফার ও রিক আর্লেন গেলেন মন্টি কার্লোতে ডঃ মন্টিউক্সের চেম্বারে। ডাক্তার জেনিফারের সবরকম প্যাথোলজি টেস্টের পরামর্শ দিলেন। বললেন–আগে ল্যাবরেটরীর রিপোর্টগুলো হাতে আসুক তারপর যা বলার বলব।

–কবে রিপোর্ট পাব?

দু-তিনদিন বাদে। এখন শুধু বেডরেস্ট। যদি শরীর ভীষণ খারাপ লাগে তাহলে এই বড়ি দুটো করে খাবেন, বলে ডাক্তার তার হাতে এক শিশি বড়ি দিলেন।

ধন্যবাদ, বলে জেনিফার ডাক্তারের দিকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল দরকার মনে করলে আপনি এই নম্বরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

তারা ডাক্তারের চেম্বার থেকে বিদায় নেবার পর ডঃ মন্টিউক্স ওই কাগজটায় নিউইয়র্কের একটা টেলিফোন নম্বর লেখা দেখতে পেলেন।

কিন্তু ডাক্তার বললেও আরও দু-তিনদিন এখানে থাকা জেনিফারের পক্ষে সম্ভব নয়। সে সোজা নিউইয়র্কে চলে গিয়েছিল। তবে সেদিন আর অফিসে গেল না সে।

বিকেলের দিকে অ্যাডামের টেলিফোন এল। তার গলার স্বরে উৎকণ্ঠা। সে আচমকা কোথায় চলে গিয়েছিল তা অ্যাডাম জানতে চাইছেন।

–দুঃখিত ডার্লিং। মন্টি কার্লোতে যেতে হয়েছিল একজন মক্কেলের সঙ্গে দেখা করতে। তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছি, তাই তোমাকে জানানো হয়নি।

–তোমার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তুমি ভালো আছো তো?

জেনিফার ইচ্ছে করেই অসুস্থতার কথা চেপে গেল। মুখে বলল–হ্যাঁ, ভালো আছি।

তোমার নির্বাচনী প্রস্তুতি কেমন চলছে?

–ভালো। তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে? ওয়াশিংটনে একবার যেতে পারবে কি?

–না, তুমি যাও, আমার হাতে অনেক কাজ আছে। উইকএন্ডে আবার দেখা হবে।

–তাই হবে, তবে আজ রাত এগারোটায় টিভি দেখতে ভুলো না। সি বি এস-এর খবরের সময় আমার প্রোগাম আছে দেখো।

–হুঁ, অবশ্যই দেখবো।

রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। তার শরীর অবসন্ন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

পরদিন সকাল থেকেই সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ব্রেকফাস্ট খেতে বসেও সে খেতে পারলো না। তার মনে হচ্ছে সে যেন কতদিন না খেয়ে আছে। সে দুর্বলতা বোধ করছে।

বেলা এগারোটায় ডঃ অ্যান্ড্রে মন্টিউক্স টেলিফোন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন–জেনিফার, এখন কেমন বোধ করছেন?

জেনিফার জবাব দিল–একই রকম।

ডঃ আন্দ্রে বললেন–একটা সুসংবাদ আছে মিস পার্কার, আপনি মা হতে চলেছেন।

জেনিফার বোকার মতো টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধাতস্থ হয়ে বলল–ঠিক বলছেন আপনি?

–ডাক্তাররা মিথ্যে বলে না। আমার মনে হয় এটাই আপনার প্রথম সন্তান?

–হ্যাঁ।

–তাহলে আপনি তাড়াতাড়ি একজন গাইনির পরামর্শ নিন।

ধন্যবাদ, ডঃ মন্টিউক্স। বলে জেনিফার রিসিভার নামিয়ে রাখল। মাথার ভেতর সব গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে তার। সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা ভাবনা করার মতো ক্ষমতা তার হারিয়ে গেছে।

তার হঠাৎ মনে হল, তার গর্ভের এই সন্তানের জনক অ্যাডাম ওয়ার্নার। কথাটা ভেবে আনন্দে লাফিয়ে উঠতে চাইল সে। তার মনে হচ্ছে অ্যাডাম ওয়ার্নারের দেওয়া এটাই সবথেকে মূল্যবান উপহার।

খবরটা এইমুহূর্তে অ্যাডামকে জানাতে হবে। সে একটুও দেরী না করে অ্যাডামের অফিসে ফোন করল। কিন্তু তার সেক্রেটারী জানাল তিনি অফিসে নেই। তার আর তর সইছে না। সে অ্যাডামের বাড়ীতে ফোন করতেই তার স্ত্রী মেরিবেথ টেলিফোন ধরলেন।

জেনিফার বলল–আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত। আসলে অ্যাডামের সঙ্গে আমার দরকার ছিল। ওর সঙ্গে একটা জরুরী ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই।

মেরিবেথ আন্তরিকতার সুরে বলল–তুমি ফোন করায় আমি খুব খুশি হয়েছি। অ্যাডাম বাইরে গেছেন। কয়েকটি জনসভায় উনি বক্তৃতা দেবেন। তবে রাত্রে বাড়ি ফিরবেন। তুমিও সাতটার সময় এখানে চলে এসো। তোমার ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল।

সম্মতি জানিয়ে জেনিফার রিসিভার রেখে দিল।

.

হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে জেনিফারের একটা কথাই বার বার মনে পড়ছিল–অ্যাডাম বলতেন আমি এমন দুটি সন্তান চাই যারা তোমার মতো দেখতে হবে। সে অনুভব করার চেষ্টা করছিল তার পেটের ভেতর অন্য একটি অস্তিত্বের আবির্ভাব। কিন্তু সেটা তো এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সে মনে মে হেসে ফেলল। অ্যাডামের সন্তান তার পেটের ভেতর বড় হচ্ছে। ওঃ সে এক দারুণ ব্যাপার ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার দেহ মনে একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল।

ভাবতে ভাবতে জেনিফার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাকটিকে সে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ হর্ণের তীব্র আওয়াজ কানে যেতেই সে সম্বিত ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি ট্রাকটিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। তার ভাগ্য সহায় ছিল তা নাহলে এতক্ষণে তার ভবলীলা সাঙ্গ হত। সে এতবড় দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পেল।

শেষ পর্যন্ত জেনিফার অ্যাডামের বাড়ি এসে পৌঁছল। তখন সন্ধ্যা সমাগত। গোধূলির ম্লান আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত। তুষারপাত হচ্ছে, তুষারের সাদা গুড়ো গাছের ওপর জমেছে। আগে থেকেই মেরিবেথ সদর দরজায় দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে একটা লম্বা ঢিলে ব্রোকেডের গাউন। জেনিফার গাড়ি থেকে নেমে এল। মেরিবেথ তাকে দেখে এগিয়ে এল। হাসিমুখে জেনিফারকে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর হাত ধরে তাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। তারা দুজনে লাইব্রেরীতে এসে বসল।

মেরিবেথ বলল–অ্যাডাম এখনও ফেরেননি, এসো আমরা গল্প করি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব উত্তেজনার মধ্যে আছো, কিছু কি হয়েছে?

জেনিফার মেরিবেথের চোখের দিকে তাকাল। তার মনে হল এই চোখকে বিশ্বাস করা যায়। কয়েকমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে তার মা হওয়ার সম্ভাবনার কথা. মেরিবেথকে বলেই ফেলল সে। সে আরও বলল–এই সন্তানের পিতৃত্বের জন্য দায়ী অ্যাডাম নিজে।

মেরিবেথ আশ্বস্ত হবার হাসি হেসে বলল–সে তো খুব ভালো খবর, এতটা আশা করা যায়নি।

–আপনি কবে অ্যাডামকে ডিভোর্স দিচ্ছেন, জেনিফার বলল।

–ডিভোর্স? আমি কেন অ্যাডামকে ডিভোর্স দিতে যাব, মেরিবেথ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

জেনিফার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলল–কেন দেবেন না? আমি জানি আপনার সঙ্গে অ্যাডামের কোনো দৈহিক সম্পর্ক নেই।

মেরিবেথ চাপা হাসি হেসে বলল–কি বোকা তুমি! অ্যাডামকে এত সহজেই বিশ্বাস করতে পারলে?

জেনিফার বলল–আমরা দুজন দুজনকে ভীষণ ভালোবাসি। আমরা বিয়ে করার জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত।

মেরিবেথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল। তার নীল দুটি চোখে একরাশ ঘৃণা ঝড়ে পড়ছে।

–আমি ওকে ডিভোর্স দিলে ও তোমাকে বিয়ে করবে, আর নির্বাচনে জিততে পারবে না। কিন্তু আমি এই নির্বাচন ওঁকে হারতে দেবো না। অ্যাডাম নির্বাচন জিতে সেনেটর হবেন, তারপর আমরা দুজনে হোয়াইট হাউসে সুখে দিন কাটাবো। ওর জীবনে তোমার মতো মেয়ের কালো ছায়া আগেও ছিল না এখনও থাকতে আমি দেব না। ওকে যখন আমি বলবো, ওর সন্তান আমার গর্ভে, তখন উনি তোমার দিকে মুখ ফিরে তাকাবে না। তার অনেক দিনের সাধ আমি পূরণ করবো। আমিই তাকে সন্তানের বাবা ডাক শোনাবো।

মেরিবেথের কথাগুলো কানের পর্দা ভেদ করে জেনিফারের হৃদয়ে গিয়ে প্রবেশ করে। তার হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার মাথার ভেতরটা দপদপ করে জ্বলতে লাগল। তবুও অনেক কষ্ট সে মেরিবেথকে প্রশ্ন করল–আপনি কি অ্যাডামকে বলেছেন ওর সন্তান আপনার পেটে লালিত হচ্ছে?

-না, তবে আজ রাতে ডিনার সেরে শুতে যাবার সময় বলবো।

জেনিফার আর সহ্য করতে পারলো না। সে বোমার মতো ফেটে পড়তে চাইল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না।

মেরিবেথ মুখ টিপে হেসে বলল–ব্যাপারটা কত সোজা না, আমি অ্যাডামের বিবাহিতা স্ত্রী আর তুমি তার রক্ষিতা।

জেনিফার কানদুটো দুহাতে চেপে ধরে টলতে টলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার মনে হল আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে সে নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে গিয়ে বসলো।

.

ভোটের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। এর মধ্যে অ্যাডাম কয়েকবার টেলিফোন করে জেনিফারের কুশল সংবাদ নিয়েছেন এবং নিজেরটা জানিয়েছেন। কিন্তু ভোট যুদ্ধের কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে বেশিক্ষণ কথা বলার মতো সময় পাননি।

মেরিবেথের পেটে বাচ্চা আসার ব্যাপারটা জেনিফারের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। হয়লে কায়দা করে অ্যাডামকে তার পাশে শুতে বাধ্য করেছেন মেরিবেথ। তবুও অ্যাডামের খি থেকে না শুনলে সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না।

অ্যাডাম সেনেটর হিসাবে নির্বাচিত হলে জেনিফার তাকে আর পাবে না। আর এদিকে মেরিবেথও তাকে ডিভোর্স দেবেন না। স্ত্রী মেরিবেথকে ওয়াশিংটন ডিসি-তে নিয়ে যেতে বাধ্য হবেন অ্যাডাম। নিজের স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে গর্ভবতী রক্ষিতাকে বিয়ে করছে জানলে লোকে ছি ছি করবে। তাহলে অ্যাডামের রাজনৈতিক উচ্চাশার পতন ঘটবে। আর যদি অ্যাডাম ভোটে হারেন তাহলে আগের মতো ওকালতি ব্যবসায় ফিরে আসবেন। তখন স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে আর বাধা থাকবে না এবং জেনিফারকে বিয়ে করে তার মাতৃত্বকে স্বীকার করতেও অসুবিধা থাকবে না।

নির্দিষ্ট দিনে ভোটদান পর্ব হল। কিন্তু সকাল থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হল। জেনিফার ভোট দিতে গেল। অ্যাডামকে ভোট দিল জেনিফার। তারপর বুথ থেকে বেরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল। এইভাবে অফিসে না গিয়ে সারা বিকেল কাটিয়ে দিল। সে জানে অ্যাডাম ওয়ার্নার নির্বাচনে জিতলে সে ভোটের রায় তার বিপক্ষে যাবে। সে স্পষ্টতই জানে তার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হবে ওই ভোটের রায়ের পর।

একসময় জেনিফার ফ্ল্যাটে ফিরে এল। সে টি ভি খুলল। তার উদ্দেশ্য নির্বাচনী ফলাফল ও সমীক্ষা দেখে নিজের ভাগ্য বিচার করা। কিন্তু সে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। শেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙাল যখন তখন ভোর হয়েছে। তখনও টিভি চলছে। এডইন নিউম্যান নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করছেন।

জেনিফার সোফায় উঠে বসল। সে শুনতে পেল এডইন নিউম্যান বলছেন–এইমুহূর্তে নির্বাচনের শেষ ফলাফল বিশ্ববাসী জানতে পারবেন। নিউইয়র্কের অ্যাডাম ওয়ার্নার এবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে সেনেটর পদ লাভ করেছেন। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সেনেটর জন ট্রাইব্রীজকে হারিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। অ্যাডাম ওয়ার্নার জন ট্রাইব্রীজের থেকে এক শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন।

জেনিফার মনে মনে ভাবল আশার প্রদীপ নিভে গেল। এই মামলায় সে পুরোপুরি হেরে গেল।

.

সেদিন জেনিফার অনেক বেলা করে অফিসে গেল। অফিসে পা দিয়েই সে সিনথিয়ার মুখে শুনতে পেল অ্যাডাম ফোন করেছেন।

ঠিক আছে সিনথিয়া, বলে জেনিফার নিজের কামরায় গিয়ে টেলিফোন তুলল। বলল–অভিনন্দন জানাচ্ছি, অ্যাডাম।

ধন্যবাদ, কি ব্যাপার, তুমি তো আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। সেই সকাল থেকে তোমাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করছি, জেনি। আজ কি তুমি লাঞ্চের সময় বেরোতে পারবে?

-পারবো।

তিন সপ্তাহ পর তাদের দেখা হল। জেনিফার এক দৃষ্টিতে অ্যাডামকে পর্যবেক্ষণ করছে। অ্যাডামকে ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে জয়ের আনন্দে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হওয়ার কথা! জেনিফারের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগল। তবে কি মেরিবেথ তার মা হওয়ার কথা অ্যাডামকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই কি ওঁকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে। সামনে গরম গরম খাবার পড়ে রয়েছে কেউ ছুঁয়েও দেখল না। তারা শুধু নির্বাচনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগল।

কিন্তু মনের আসল কথা গোপন রেখে এইভাবে তো বেশীক্ষণ কাটানো যায় না। তাই অস্থির হয়ে উঠলেন অ্যাডাম, তিনি ভাবছেন কিভাবে জেনিফারকে কথাটা বলবেন। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন–জেনি, মেরিবেথ আমার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে।

জেনিফার অ্যাডামের মুখের ওই উক্তি শুনে হতবাক হয়ে গেল।

অ্যাডাম একটু ইতস্ততঃ করে আবার বলতে শুরু করলেন–আমি সত্যিই দুঃখিত, ডার্লিং, ব্যাপারটা যে কিভাবে ঘটে গেল।

থাক তোমাকে আর কৈফিয়ত দিতে হবে না।

–আমি ভীষণ বোকা না, উচ্চাকাঙ্খর লোভে মেরির কথা আমি বিশ্বাস করেছি। ওর কথামতো ভোটের আগে ডিভোর্স নিইনি, কিন্তু এখন তো সে পথও বন্ধ। জাতীয় কমিটির চেয়ারপার্সনরা আমাকে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাতে চান। তাছাড়া মেরিও মা হতে চলেছে, তাই এখন ওকে ডিভোর্স করলে আমার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। যেদিন ব্যাপারটা জানতে পেরেছি সেদিন থেকে আমি বিনিদ্র রজনী

কাটিয়েছি। তোমায় বলতে সংকোচ হচ্ছে, তবুও বলতে আমি বাধ্য, আমরা কি আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারি না, জেনি?

না, অ্যাডাম, সেটা আর সম্ভব নয়। সব শেষ হয়ে গেছে। আমার জন্য তুমি তোমার স্ত্রী ও সন্তানের জীবন নষ্ট করতে পারো না। ওদের বাঁচাতেই হবে তোমাকে।

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল জেনিফার। এখানে থাকলে যেন তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। তবুও অ্যাডামের প্রতি সে শেষ মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিল–আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা কোরো না অ্যাডাম।

বেদনা ভরা দুটি চোখ মেলে অ্যাডাম তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সেই দৃশ্য সহ্য করার মতো জেনিফারের মনের অবস্থা ছিল না। তাই সে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

.

এরপর অ্যাডাম বহুবার জেনিফারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু জেনিফার অভিমান করে ফোন ধরেনি।

গর্ভযন্ত্রণা যে কি ভয়ানক হয় তা জেনিফার আজ প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছে। সে আর এখন একা নয়। তার জঠরে আরেকটি প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে সেই ধ্বনি বাইরে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠবে। সে স্থির

করল গর্ভের ওই সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেবে না। তাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করবে।

জেনিফার ভাবছে কোথায় গর্ভপাত করানো যায়, ভেবে ভেবে সে কোনো কুলকিনারা পেল না। নিউইয়র্কের বাইরে যাবে না এই শহরেই করবে? কিন্তু এই শহরে করলে একটা সমস্যা থেকে যায়। তাহল টিভি খবরের কাগজের দৌলতে তাকে অনেকেই চিনেছে। এখানে করলে সে ধরা পড়ে যাবে। আর বাইরে করলে সে সম্ভবনা থাকে না। আসল কথা হল যে ভাবেই হোক অ্যাডাম ওয়ার্নারের ভাবী সন্তানকে এই পৃথিবীতে আসতে দেবে না।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সে একসময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

.

শেষ পর্যন্ত কোনো পথ না পেয়ে জেনিফার কেন বেইলিকে ডেকে পাঠান। সে আসতে তার কাছে নিজের সমস্যার কথা অকপটে স্বীকার করল। সে কোনো রকম ভনিতা না করে বলল–কেন, তোমার চেনাজানা কোনো ডাক্তার আছে, আমি গর্ভপাত করব?

বুকের মধ্যে গভীর বেদনা কেন অনুভব করল। আবার পরক্ষণেই তার ভীষণ রাগ হল। তবুও ভেতরের সেই প্রতিক্রিয়া কেনের চোখে মুখে প্রতিফলিত হয়নি। সে মুখে বলল–কোথায় করাতে চাও?

–এমন কোন জায়গায় যেখানে আমার কোনো পরিচিত লোক নেই। এই যেমন ধরো নিউইয়র্কের বাইরের কোনো শহরে।

মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে কেন বলল–তাহলে নর্থ ক্যারোলিনায় যেতে পারো। জায়গাটা খুব কাছেই।

জেনিফার অনুনয়ের সুরে বলল–তুমি একটু ব্যবস্থা করে দাও না কেন?

... বাঃ চমৎকার! আমি...। কেন অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল।

.

এরপর তিনদিন আর কেনের পাত্তা পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিনের দিন সে এসে হাজির জেনিফারের অফিসে, আচমকা ভূতের মতো চেহারায় তাকে দেখে জেনিফার চমকে উঠল। তার মুখে তিন চারদিনের না কামানো গোঁফ দাড়ি, দুচোখের নীচে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে।

জেনিফার শঙ্কিত স্বরে জানতে চাইল, কেন, তোমার কি শরীর খারাপ?

না, আমি ভালই আছি। কেন এক টুকরো কাগজ জেনিফারের হাতে দিল। জেনিফার দেখল তাতে লেখা–ডঃ লিন্ডেন, মেমমারিয়াল হাসপাতাল, শার্লোট, নর্থ ক্যারোলিনা।

-ধন্যবাদ, কেন।

কবে যাচ্ছ? এই উইক এন্ডেই যাব ভাবছি।

–আমি কি যাব?

না থাক, দরকার হবে না, আমি একাই যেতে পারবো।

যদি ফেরার সময় অসুবিধা হয়, তবে সাহায্য করতে পারি।

–ও ঠিক হয়ে যাবে।

–যদিও জানি এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবুও বলব, তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত?

নিশ্চয়ই, কেন।

জেনিফার খুব ভালোভাবেই জানে অ্যাডামের সন্তান মানে নিজের সন্তান। নিজের কাছে রেখে মানুষ করার চাইতে আর কিছু চাওয়ার তার থাকতে পারে না। তাহলেও সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবলে এটাকে পাগলামি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তাই ওই সন্তানকে কাছে রেখে সে কিছুতেই মানুষ করতে পারবে না। তার হৃদয় অব্যক্ত যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে।

শার্লোটের কিছুটা দূরে, শহরতলী এলাকা। এখানেই একটি দোতলা বাড়ি মেমোরিয়াল হাসপাতালের পরিচয় বহন করছে। জেনিফার একাই এসেছিল এখানে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই রিসেপশন, সেখানে একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা বসে আছেন। জেনিফার সেদিকে

এগিয়ে গেল। তাকে দেখে ওই ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন–বলুন, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি।

জেনিফার নিজের পরিচয় দিয়ে বলল–ডঃ লিন্ডেনের সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন–বুঝতে পরেছি, ডঃ লিন্ডেন আপনার অপেক্ষা করছেন ওঁর চেম্বারে।

একজন কম বয়েসী নার্সের সঙ্গে জেনিফার এসে হাজির হল বিশাল একটি ঘরে। এই ঘরটিতে রোগীদের পরীক্ষা করা হয়। নার্সটির নির্দেশে সে জামাকাপড় খুলে একটি গাউন পরে নিল। সে মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছে তার নিজের সন্তানের রক্তে ওই সাদা অ্যাপ্রনটা লাল হয়ে গেছে।

একটু পরে এক ভদ্রলোক এলেন। তার মাথাজোড়া টাক, নাদুস নুদুস চেহারা এবং মুখটায় যেন পাচার মুখ বসানো হয়েছে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন–আমি ডঃ লিন্ডেন। আপনি বুঝি মিসেস পার্কার?

জেনিফার মুখে কিছু বলল না, শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ডঃ লিন্ডেন একটা কাগজের কাপ নিলেন। তারপর বেসিন থেকে জল তাতে ভরলেন, সেটা জেনিফারকে খেতে বললেন।

তখন জেনিফারের প্রতিবাদ করার মত সাহস ছিল না। সে সেটুকু নীরবে খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ পর ডঃ লিন্ডেন বললেন–গর্ভপাত করাতে চান?

-হ্যাঁ।

এ ব্যাপারে আপনার স্বামীর মত আছে তো?

জেনিফার আমতা আমতা করে বলল–হ্যাঁ, আমরা–আমরা দুজনেই এতে রাজী আছি। গম্ভীরভাবে ডঃ লিন্ডেন বললেন, আপনার স্বাস্থ্য তো ভালোই দেখছি।

-হ্যাঁ, আমি বেশ সুস্থ।

–গর্ভপাতের ব্যাপারে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। আরেকবার ভালো করে ভেবে দেখুন। বাচ্চাটাকে একবার নষ্ট করে ফেললে আমি আর বাঁচাতে পারবো না। সে যাদু আমার জানা নেই।

–না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

–বেশ, তাহলে আপনি ওই টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ুন। আমি পরীক্ষা করবো আপনাকে। জেনিফার টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল, ডঃ লিন্ডেন তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

পরীক্ষা শেষ করে মিঃ লিন্ডেন বললেন–ঠিক আছে, আপনি জামাকাপড় পড়ে নিন, মিসেস পার্কার। কাল আপনার অপারেশন হবে, এখানে আজ রাতটা থাকতে পারেন। যদি আপনার অসুবিধা না থাকে।

জেনিফার ধীরে ধীরে বলল–কেন ডঃ লিন্ডেন, আজ করা যায় না?

না আজ করা সম্ভব নয়। আপনার আগে আরও দুজন রোগী আছে। আপনার ভয়। নেই বেশি সময় লাগবে না।

অগত্যা জেনিফারকে রাজি হতেই হল।

.

পরের দিন সকাল। জেনিফার সাদা গাউন পরে সেই বিশাল টেবিলটার ওপর শুয়ে আছে। ডঃ লিন্ডেন কখন আসে তার প্রতীক্ষা করছে। দেয়ালে ঝোলানো একটা পুরোনো ঘড়ি। তার পেন্ডুলাম টিক টিক করে শব্দ তুলছে। জেনিফারের মনে হচ্ছে কে যেন তার মাথার মধ্যে ওই পেন্ডুলামের মত শব্দ করে বলছে, ছোট্ট অ্যাডাম, আমার ছেলে, আমার ছেলে।

জেনিফার কিছুতেই তার গর্ভস্থ সন্তানের কথা ভুলতে পারছে না। ওই পেন্ডুলামের শব্দটা তার অসহ্য লাগছে। সে দুহাত দিয়ে কান দুটো চেপে রাখলো। সে উপলব্ধি করলো তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে, তার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ডঃ লিন্ডেন এলেন। তিনি ইঞ্জেকেশানের সিরিঞ্জ হাতে জেনিফারে দিকে এগিয়ে গেলেন। জেনিফার আর্তনাদ করে উঠল–ওটা কি?

–ঘাবড়াবেন না মিসেস পার্কার। এটা ডিসেলে ও সেনার কান। আপনি আরাম পাবেন। মনে হচ্ছে এটাই প্রথমবার।

–হ্যাঁ।

ইঞ্জেকশানটা পুশ করার পর জেনিফারের ঝিমুনি ভাব এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে চেতনা প্রায় হারিয়ে ফেলল। অর্ধচেতন অবস্থায় সে টের পেল তাকে স্ট্রেচারে করে অন্য একটি ঘরে নিয়ে এসেছে। সে গর্ভের সন্তানের দুরবস্থার কথা ভেবে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল।

ডঃ লিন্ডেন তার হাতে মৃদু চাপড় মেরে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন–ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, একটুও ব্যথা লাগবে না।

একজন নার্স একটা মুখোশ তার নাকের ওপর ধরে জোরে শ্বাস নিতে বলল। কয়েকজন। জেনিফারের পা দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দিল, তার গাউনটা টেনে ওপরে তুলে দিল তারা।

বিদায়, ছোট্ট অ্যাডাম সোনা। গর্ভের সন্তানের উদ্দেশ্যে পরম মমতায় জেনিফার কথাগুলো উচ্চারণ করল। পরক্ষণেই সে অনুভব করল একটা ইস্পাতের ছুরি তার দু

হাঁটুর মাঝখান দিয়ে তলপেটে ঢুকে যাচ্ছে। সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে এই ছুরির আঘাতে অ্যাডামের সন্তানের মৃত্যু হবে।

এমন সময় জেনিফার চীৎকার করে বলল–বন্ধ করো, বন্ধ করো অপরেশান। মাথা উঁচু করে জেনিফার দেখার চেষ্টা করল। সাদা মুখোশ পরা অনেকগুলো মুখ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। উঠে বসতে গিয়েও সে পারল না। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। তার সারা দেহ অসার হয়ে আসছে, একটা উগ্র গন্ধ তাকে কিছুতেই জেগে থাকতে দিচ্ছে না। সে ঘুমের দেশে পাড়ি দিল।

হাসপাতালের একটা বিছানায়

জ্ঞান ফিরতে তার অনেকটা সময় লেগেছিল। চোখ খুলতেই সে দেখল হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে আছে। বাইরে ঘন অন্ধকার। তার শরীর এত ব্যথা যে সে এপাশ ওপাশ পর্যন্ত করতে পারছে না। কতক্ষণ সে অচেতন হয়ে পড়েছিল তা মালুম করতে পারল না। এবার তার সন্তানের কথা মনে পড়ল। সে ভাবল সে তো দিব্যি বেঁচে বর্তে আছে, তার সন্তানও কি বেঁচে আছে?

বিছানার লাগোয়া কলিংবেল। জেনিফার হাত বাড়িয়ে সেটা জোরে জোরে টিপতে লাগল। সেই আওয়াজ শুনে একজন নার্স ছুটে এল। সে ঘরের ভেতরে না ঢুকে বাইরে থেকে উঁকি মেরে চলে গেল। জেনিফার ক্রমাগত বাজিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর ডঃ লিন্ডেন ঝড়ের বেগে ঘরে এসে ঢুকলেন। ডঃ লিন্ডেন তার হাতটা কলিংবেল থেকে সরিয়ে দিলেন।

ডঃ লিন্ডেন কাছে এসে বললেন–এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, মিসেস পার্কার?

জেনিফার কান্না ভেজা গলায় বলল–আমার বাচ্চা কোথায়? সে কি বেঁচে আছে?

-আপনার বাচ্চা বেঁচে আছে আর সুস্থ দেহে। আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, আপনার ছেলে হবে মিসেস পার্কার। ওকে আপনি অ্যাডাম বলে ডাকছিলেন।

.

১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। এই সময় তুষারপাত হয়। শীতের অবসান হয়। এটাই কাজ থেকে অবসর নেবার উপযুক্ত সময়। তারও শরীর মন কিছুদিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করছে।

একদিন জেনিফার তার অফিসের কর্মচারীদের বলল–আমি আগামী পাঁচ মাসের জন্য ছুটিতে যাচ্ছি। তোমরা আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা কোরো না। পাবে না।

সহকারী ট্রেড হ্যারিস জানতে চাইল–আপনি কবে যাচ্ছেন?

–এই সপ্তাহের শেষে যাচ্ছি। পরবর্তী মামলাগুলো কিভাবে লড়তে হবে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল তার সহকারীদের জেনিফার।

অফিস ছুটির পর জেনিফার বাদে সবাই যে যার বাড়ি চলে গেল। কেন বেইলি এসে ঢুকল জেনিফারের ঘরে। সে কেনকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানালো।

–তুমি কি মনস্থির করে ফেলেছে, জেনি?

–হ্যাঁ কেন।

কেন উত্তেজিত হয়ে বলল–যে তোমার এই সর্বনাশ করেছে তাকে আমি ঘেন্না করি।

সব ঠিক হয়ে যাবে, কেন। এ নিয়ে তুমি অযথা মাথা গরম কোরো না।

–ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? তোমার এই শিশু একদিন বড় হবে, তার মনে নানা প্রশ্ন জাগবে, তোমার সন্তানও জানতে চাইবে তার পিতৃপরিচয় কি?

–সে সবের সামাল আমি দেব।

–ঠিক আছে, প্রয়োজন মনে করলে আমাকে খবর দিতে দ্বিধা কোরো না, চিরকাল আমাকে তোমার পাশে পাবে, কেন বলল।

দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে জেনিফার বলল–অজস্র ধন্যবাদ। তুমি যে আমার জন্য এত চিন্তা করো জেনে খুব খুশী হলাম।

.

অ্যাডামের প্রতি জেনিফারের ভালোবাসা আজও অটুট রয়েছে, অ্যাডামও যে তাকে ভালোবাসে তাতে ওর কোনো সন্দেহ নেই। ওর স্ত্রী মেরিবেথের সন্তান একদিন বড় হবে, ততদিনে অ্যাডাম নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন। এদিকে জেনিফারের নিজের ছেলেও বড় হয়ে উঠবে, সে যদি জানতে চায় ওর বাবা কে, তাহলে সে কিছুতেই বলতে পারবে না। অ্যাডামের সন্তান সে গর্ভে ধারণ করেছে সে কথা জানাজানি হলে তার রাজনৈতিক জীবনের আকাশে কালো মেঘে ছেয়ে যাবে।

জেনিফার শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে ম্যানহাটানে গ্রামের স্নিগ্ধ পরিবেশে একটি বাড়ি কিনলো। বাড়িটি বহুদিনের পুরোনো। প্রচুর টাকা খরচ করে বাড়িটির সংস্কার করল। আধুনিক রুচিসম্পন্ন আসবাব দিয়ে বাড়িটিকে সাজালো সে। ছেলের জন্য

আলাদা একটা ঘর রাখল, সেই ঘরটিকে প্রচুর দামী খেলনা দিয়ে সাজালো। সেইসব খেলনা সে জোগাড় করেছে বহু বাজার ঘুরে ঘুরে। বাড়ি কেনার কথা একমাত্র কেন বেইলিকে জানাল সে। সে কেনকে একদিন আমন্ত্রণ জানালো। কেন এসে বাড়ির ভেতরের চাকচিক্য দেখে অবাক হল।

ততদিনে জেনিফারের তলপেট বেশ স্ফীত হয়েছে। তাই তাকে এখন মেটারনিটি গাউন পরতে হয়। সেই তলপেটের দিকে তাকিয়ে ইশারায় বলল–আর কত দেরী?

জেনিফার বলল–আরও দুমাস।

যদিও এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তবুও জিজ্ঞেস করছি এই বাচ্চার বাবা কি করে? কেন কৌতূহল দমন করতে না পেরে বলল।

জেনিফার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল–এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর ঘাটাঘাটি না করাই ভালো।

দুঃখিত, আর জিজ্ঞেস করবো না।

ডঃ হার্ভে একজন ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ। তার কাছেই জেনিফার চিকিৎসা করায়। তিনি সন্তানের জন্মের সম্ভাব্য সময় আগে থেকেই বলে দিয়েছেন। যথা সময়ে জেনিফারের প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল। সে নিজে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে এল। আটঘন্টা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল।

জেনিফার ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। হঠাৎ শিশুর কান্না তার কানে গেল। সে চোখ খোলার আগেই ডঃ হার্ভে বললেন–মিসেস পার্কার, আপনার ছেলের মুখ দেখুন।

জেনিফার চোখ খুলে তাকাল, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে পরম তৃপ্তিতে হাসল।

জেনিফার তার ছেলের নাম রেখেছে যোশুয়া অ্যাডাম পার্কার। ভূমিষ্ট হওয়ার সময় ওর ওজন হয়েছিল সাড়ে আট পাউন্ড। অ্যাডামের মতো দেখতে হয়েছে। ছেলের মুখের দিকে তাকালে জেনিফারের অ্যাডামের কথা মনে পড়ে যায়। এই মুহূর্তে মেরিবেথের সন্তানও ভূমিষ্ট হয়েছে। আর অ্যাডামও ছেলেকে দেখে আনন্দে আত্মহারা। জেনিফার ছেলেকে পেয়ে যেমন আনন্দিত তেমনি অ্যাডামকে হারিয়ে শোকাভিভূত।

কেন বেইলি জেনিফারের সন্তানের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কিছু একটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলো। জেনিফারের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। এই বুঝি কেন সন্তানের বাবার নাম জানতে চাইবেন। কিন্তু যখন কেন বলল–আরে, এতো একেবারে মায়ের মুখ বসানো! তখন তার মন থেকে ভয় দূর হয়ে গেল।

কেন অনেকক্ষণ তার ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করল। জেনিফারের বুক তখন ব্যথায় টন টন করছে, এই শিশু কোনদিন বুঝতে পারবে না পিতৃস্নেহ কাকে বলে? সে কোনোদিন তার বাবার আদর যত্ন পাবে না।

দেখতে দেখতে চার মাস কেটে গেল। আর চার সপ্তাহ পরে জেনিফারকে কাজে যোগ দিতে হবে। এখন একজন সৎ বিশ্বাসী কাজের লোকের দরকার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর

একজন মহিলাকে পাওয়া গেল। নাম মিসেস ম্যাকে। জাতিতে স্কটিশ। তাকে কাজে বহাল করা হল।

মিসেস ম্যাকে কাজে যোগদান করার পর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত। জেনিফার আবার। অফিসে যেতে শুরু করল।

অফিসের প্রত্যেকটি কর্মচারী জেনিফারকে অভিনন্দন জানালো। তার ফিরে আসার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কেন শ্যাম্পেন আনালো।

.

ছেলেকে নিয়ে শুরু হল জেনিফারের নতুন জীবন। সে এখন জীবনী শক্তিতে ভরপুর। নতুন উদ্যমে ঘরের সব কাজ করতে লাগল। তার পাশাপাশি ছেলের যত্নের ত্রুটি রাখে না। এখন থেকে উইকএন্ডে অফিসের কাজ করে না। সে সেইসব দিনগুলি ছেলেকে নিয়ে কাটায়। তার ছেলের এখনও কোনো বোধশক্তি হয়নি। তাসত্ত্বেও সে বই পড়ে গল্প শোনায় ছেলেকে। তার বিশ্বাস, তার সব কথা বোঝে ওই পুঁচকে ছেলেটি।

–অ্যাডাম ওয়ার্নার সেনেটর হওয়ার পর আইনব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিল। পুরোপুরিভাবে এখন তিনি আমেরিকার রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তিনি

প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করবেন, এমন একটা কানাঘুষো শোনা যায়। অ্যাডামের কৃতিত্বের খবর শুনে জেনিফার মনে মনে মোটেই খুশী হয় না।

১৯৭৪ সাল। যোশুয়ার আজ একবছরের জন্মদিন। জেনিফার নিজের হাতে জন্মদিনের কেক বানিয়েছে।

জনা দশেক কচিকাঁচাদের নিয়ে যোশুয়ার জন্মদিন পালিত হল। বড়দের মধ্যে একমাত্র কেনেথ বেইলি নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার বাড়ি ফিরে গেল।

জেনিফার ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে–ধীরে ধীরে তার ছেলে বড়ো হবে, হয়ে উঠবে পূর্ণ যুবক। নিজের পৃথিবী গড়ে তুলতে সে নিশ্চয়ই তার মাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

একদিন যে অ্যাডামকে তার ছেলের কথা বলতে হবে, সেই নিদারুণ সত্যটা জেনিফার অনুভব করল।

দু বছরের যোশুয়া জল রং দিয়ে বাড়ির সবকটা ঘরের দেওয়ালে আঁকিঝুঁকি কাটল। তা দেখে পরিচারিকা মিসেস ম্যাক ছুটে এল। রেগে গিয়ে তাকে চড় মারতে উদ্যত হল।

জেনিফার বাধা দিয়ে বলল–ও ছেলেমানুষ। ওর প্রতিভাকে ফুটতে সাহায্য করুন।

–আস্কারা দিয়ে ছেলেটার ভবিষ্যৎ বরবাদ করে দিলে। মিসেস ম্যাক গজগজ করতে করতে চলে গেল।

.

কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা। মাইকেল মোরেটি তার শ্বশুর অ্যান্টেনিও গ্র্যানেলির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন। সেখানে পারিবারিক আইন উপদেষ্টা টমাস কোলফ্যাক্সও উপস্থিত ছিলেন। মোরেটিকে টমাস বিশেষ পছন্দ করেন না। তাই মোরেটি যে কোনো প্রস্তাব দিলে তিনি তা যুক্তিতর্ক দিয়ে উড়িয়ে দেন।

কোলফ্যাক্স বিদায় নিলে মোরেটি বলল–কোলফ্যাক্সের বয়স হয়েছে। ওকে বিদায় দিন। অন্য উকিল নিন।

–উনি খুব ভালো লোক। তার শ্বশুর বললেন, অনেক ঝামেলা থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। তা তুমি কারো কথা ভেবেছো কি?

-হ্যাঁ, জেনিফার পার্কারকে।

–মেয়েমানুষকে কখনও কারবারের মধ্যে রাখতে নেই, অ্যান্টেনিও গ্ল্যানেলি বললেন, ঝামেলা বাড়বে বৈ কমবে না।

–ওর আইন ব্যবসায় খুব নাম যশ আছে।

–ঠিক আছে।

জেনিফারকে লাস ভেগাসে একদিনের জন্য আসতে হল, এক মক্কেলের কাজের ব্যাপারে। সেখানে সে মাইকেল মোরেটির পাল্লায় পড়ে গেল। মোরেটি তাকে ডিনার

খাওয়ালেন। দুজনে একসঙ্গে নাচল। জেনিফার লক্ষ্য করল, তার চোখে জৈবিক কামনার আগুন ধকধক করে জ্বলছে। অ্যাডামের পাশে এই লোকটাকে বন্যজন্তু ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

রাত চারটে নাগাদ মোরেটি জেনিফারকে হোটেলে পৌঁছে দিল।

–আজ যাচ্ছি, বিদায় নেবার মুহূর্তে মোরেটি বললেন, আবার আমাদের দেখা হবে। আজকের এই রাতের কথা আমি জীবনে কোনোদিন ভুলব না।

জেনিফার কিছু বুঝতে পারল না। তবে অদ্ভুত একটা আতঙ্ক তাকে গ্রাস করল।

আড়াই বছরের শিশু যোশুয়া খুব দুষ্ট হয়ে উঠেছে। মিসেস ম্যাকের সেলাইকল, বাড়ির দুটো রঙিন টিভিসেট, জেনিফারের হাত ঘড়ি সব ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। কিন্তু তিন বছরে পা দিতেই যোশুয়ার মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। সে আর ভাঙচুর করে না। খেলাধুলা করতে ভালোবাসে সে, পাহাড়ে চড়তে আর সাইকেল চালাতেও সে ভালোবাসে।

জেনিফার ছেলেকে স্থানীয় একটা নার্সারি স্কুলে ভর্তি করে দিল। ওর মুখের ধরন, ভুরু কুঁচকে তাকানো, সব কিছুতেই অ্যাডামের প্রকাশ লক্ষ্য করে জেনিফার। অ্যাডাম কোথায় আছে, কী করছে, কেমন আছে, এসব ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই তার। পুরোনো ঘা টা এখনও শুকোয়নি। খবরের কাগজ থেকে জেনেছে, অ্যাডামের একটি মেয়ে হয়েছে সামান্থা।

জেনিফার তার কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনকে একাকার করে দেয় না। এই দুয়ের মাঝে সেতুর মতো দাঁড়িয়ে আছে কেনেথ। সে যযাশুয়ার জন্য খেলনা নিয়ে আসে, দুজনে খেলা করে, ওরা যেন দুই বন্ধু। জেনিফার মনে মনে তৃপ্তি লাভ করে।

রবিবার। কেনেথ এসেছে জেনিফারের বাড়িতে। তারা বাগানে হাঁটছিল। যোশুয়াকে একটা গাছে উঠে বসে থাকতে দেখে কেনেথ বলল–ওর এখন কী প্রয়োজন বলতে পারো?

–না।

–ওর দরকার একজন বাবা। কেনেথ বলল, আসল বাবা তো একটা লোচ্চা...

-কেনেথ। জেনিফার অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ভবিষ্যতে এই প্রসঙ্গ আর তুলো না।

দুঃখিত। সত্যি, অতীতকে নিয়ে ঘাটঘাটি করে কী লাভ। কেনেথ বলতে থাকে। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার ভবিষ্যতের কথা। এভাবে একক জীবনযাপন করা তোমার পক্ষে। কি ঠিক হচ্ছে?

–কেনেথ, আমার পাশে আমার ছেলে যোশুয়া আছে।

–ওর কথা বলছি না। কেনেথ তার হাতে চুমু দিল। দুঃখিত, জেনিফার আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।

.

জ্যাক স্ক্যানলনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে চার বছরের একটা বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে এবং মুক্তিপণ দাবী করেছে। বিচারের পূর্বমুহূর্তে তার কাছে তার উকিলের নাম জানতে চাওয়া হল। সে নির্দ্বিধায় জেনিফার পার্কারের নাম বলে দিল। ফলে জামিনে মুক্তি পেয়েছিল জ্যাকসন।

জেনিফার জ্যাকসনের সঙ্গে দেখা করে সত্যি ব্যাপারটা জানতে চাইল।

জ্যাকসন বলল, সে নির্দোষ, শুধু হৃদয়াবেগের বশে সে ওই বাচ্চাটিকে তুলে এনেছিল। এমন কী সে মুক্তিপণও দাবী করেনি। পুলিশ তার নামে মিথ্যে বলেছে। আসলে তার স্ত্রী সন্তান প্রসবকালে মারা গিয়েছিল, তারপর সে আর বিয়ে-থা করেনি। সেদিন রাস্তার ধারে ওই বাচ্চা-মেয়েটিকে দেখে মৃত স্ত্রীর কথা তার মনে পড়ে যায়। এ যেন ছোট্টো এক ইভলিন। ইভালিন হয়তো পুনর্জন্ম লাভ করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। গুরুতর অপরাধ জেনেও সে মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল।

বলতে বলতে জ্যাকসনের দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। জেনিফার ওর কথাগুলো সত্যি বলে ধরে নিল। সে ওর পক্ষে মামলা করতে রাজী হল।

জেনিফার বুঝতে পেরেছিল যে, সন্তানহারা বাবা একটি ছোটো মেয়ের চেহারায় তার মৃত স্ত্রী আর সন্তানের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে আর সেই আবেগের বশেই সে এই অপরাধ করেছে। এই যুক্তিকে যদি সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে বিচারকের মনে সহানুভূতির উদ্রেক হতে পারে। তাহলে আসামীর শাস্তির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে।

এই মামলায় সরকারী উকিল ছিলেন আর্ল অসবোর্ন, তাঁর সহকারী হিসেবে ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা।

জেনিফার তার মক্কেলের অপরাধের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা আসল কাহিনীটা শোনাল। এবং জামিনের জন্য আবেদন জানাল। হয়তো তার জামিন হয়ে যেত, কিন্তু বাদ সাধল রবার্ট ডি সিলভা।

তিনি একটা পুরোনো ফটো বিচারকের কাছে পেশ করলেন। সম্ভবত পুলিশের দপ্তর থেকে জোগাড় করেছেন।

তিনি বললেন–এই ফটোটা জ্যাকসন নামে এক কুখ্যাত অপরাধীর। চোদ্দো বছর বয়সে সে প্রথম অপরাধ করেছিল। ওরা বাবা ছিলেন একজন বিখ্যাত ডাক্তার, বাবার ডিসপেনসারি থেকে ওষুধ চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল। চার বছর সে শিশু সংশোধনাগারে ছিল। মেয়াদ শেষ হলে ছাড়া পায়। তার এক মাস বাদেই এক ডাকাতির অভিযোগে পুলিশ ওকে আবার গ্রেপ্তার করে।

রবার্ট ডি সিলভার সওয়াল থেকে জানা গেল, সেই কুখ্যাত অপরাধী ফ্রাঙ্ক জ্যাকসনই, বর্তমানের জ্যাকসন স্ক্যানলন। যে এই মুহূর্তে শিশু অপহরণের অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সে একজন পাকা অভিনেতা-ভীষণ মিথ্যেবাদী। সে জীবনে বিয়ে করেনি। পাঁচ বছর আগে একটি তিনবছরের মেয়েকে চুরি করেছিল। পুলিশ এক জঙ্গলের মধ্যে থেকে সেই বাচ্চা মেয়েটির মৃতদেহ পেয়েছিল। ডাক্তারি পরীক্ষা করে

দেখা গেছে, হত্যার আগে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। জ্যাকসন ওর ওপর তার বিকৃত কাম চরিতার্থ করেছিল।

জেনিফার ফটোটা হাতে নিল। দেখল, অবাক হল। এ তো তার মক্কেল জ্যাকসন স্ক্যানলনেরই। রবার্ট ডি সিলভা আদালতে যা কিছু বললেন, সবই তাহলে সত্যি। তার বুঝতে বাকি রইল না, জ্যাকসন তার মন রাখার উদ্দেশ্যে মিথ্যে গল্প তাকে শুনিয়েছে। জেনিফার স্পষ্ট ভাষায় বিচারককে জানিয়ে দিল যে, সে আর ওই মক্কেলের হয়ে মামলা লড়বে না।

অতএব, জ্যাকসনের জামিন খারিজ হয়ে গেল এবং তার বিরুদ্ধে নতুন করে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হল।

সেদিন সন্ধ্যায় ওয়ালডর্ফ-অ্যান্টোরিয়া রেস্তোরাঁয় জেনিফারের ডিনারের নেমতন্ন ছিল। জজ লরেন্স ওয়াল্ডম্যান তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

খাওয়া দাওয়ার ফাঁকে মাঝে মধ্যেই জেনিফার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। জ্যাকসন স্ক্যানলন তাকে যে মিথ্যে কথা বলে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল, সেকথাই বারবার মনে পড়ছে।

মিস পার্কার, হঠাৎ রেস্তোরাঁর ম্যানেজার এসে বলল, আপনার একটা ফোন আছে।

জেনিফার উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল–জেনিফার পার্কার বলছি।

–হারামজাদি, খানকি মাগী, কুত্তির বাচ্চা। অশ্রাব্য গালিগালাজ ছুটে আসছে ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে। আমি জ্যাকসন, জ্যাকসন স্ক্যানলন। আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে চাইছিস, তাই তো।

–চুপ করো। জেনিফার রাগে তখন ফুঁসছে। তোমার মতো মিথ্যে কথা আমি বলি না। তোমাকে ধরার দায় পুলিশের, আমার নয়।

চোপ শালি। কথা দিয়েছিলি মনে নেই, আমার হয়ে সওয়াল করবি। আর আদালতে গিয়ে ভোল পাল্টে ফেললি! তোকে আমি হাতে-হাতে এর উচিত শিক্ষা দেব।

ফোন কেটে গেছে। জেনিফার ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তাহলে জ্যাকসন এখনও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি যে এখানে আছি ও জানল কী করে? নিশ্চয়ই পিছু নিয়েছিল।

সে লরেন্স ওয়াল্ডম্যানকে সব কথা বলল। তিনি শুনেই আঁতকে উঠলেন। তিনি তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বললেন। কিন্তু জেনিফার রাজী হল না।

বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। জেনিফার সদর দরজায় হাত রাখল, দরজা খুলে গেল। কী এক অজানা আতঙ্কে মন তখন ছেয়ে গেছে তার। আলো জ্বালাল, চমকে উঠল। পোষা কুকুরটা নিথর হয়ে পড়ে আছে। ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে তার গলা কাটা হয়েছে বোঝা গেল।

সে ছেলে ও পরিচারিকার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঘরে এসে ঢুকল। যোশুয়া কোথায়। মিসেস ম্যাক?

–একটা মৃদু গোঙ্গানির আওয়াজ ভেসে এল। জেনিফার আলো জ্বালল। জামাকাপড় যেখানে কাঁচা হয় সেদিকে এগিয়ে গেল। মিসেস ম্যাক মেঝের ওপর পড়ে আছেন, তাঁর চার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা।

–একটা লোক বাড়ির ভেতর ঢুকেছিল, মিসেস ম্যাক বললেন, আমি বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু আটকাতে পারিনি। যোশুয়াকে তুলে নিয়ে গেছে।

জেনিফারের বুকটা ধড়াস করে উঠল। বুঝতে দেরী হল না, লোকটা কে?

এমন সময় টেলিফোন বেজে উটল।

জেনিফার ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল।

–তুমি তাহলে বাড়িতে এসে গেছো?

–আমার ছেলে কোথায়? জেনিফার গর্জে উঠল।

ভারী মিষ্টি ছেলেটা তোমার।

–জ্যাকসন, দোহাই তোমার, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। যা বলবে, তাই করব।

–তুমি তো আগেই যা করার করেছে।

–দোহাই, দয়া করো। আমার ছেলেকে...

কাঁদো। মন ভরে কাঁদো, জ্যাকসন বলে চলল, ঘাবড়াচ্ছো কেন? ছেলেকে ফেরত দেব। হ্যাঁ, কাল সকালে খবরের কাগজ খুললেই ওর মৃতদেহের ছবিটা তুমি দেখতে পাবে।

জেনিফার শিউরে উঠল। কিছু বলতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে টেলিফোন নীরব হয়ে গেছে।

এই মুহূর্তে কে তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে? অ্যাডাম ওয়ার্নার? যোশুয়া তো তারই সন্তান। বলবে, যোশুয়াকে হত্যা করে জ্যাকসন জেনিফারের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে। কিন্তু অ্যাডাম এখন আছেন দুশো পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। তাহলে উপায়, রবার্ট ডি সিলভা? হয়তো তিনি কাজটা করে দিতে পারবেন। কিন্তু সময় বেশী লেগে যাবে।

এফ বি আই? সে তার নিজের পথ ধরে এগোবে। সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

হঠাৎ একটা নাম পড়ে গেল তার। একটা বিশেষ নম্বর ডায়াল করল।

–হ্যালো।

–আমি মাইকেল মোরেটির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

–আমিই মাইকেল মোরেটি।

-মাইকেল, আমি জেনিফার, ভীষণ বিপদ। একমাত্র আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। কান্নায় তার গলা বন্ধ হয়ে এল। সে কোনো রকমে সমস্ত ঘটনাটা জানাল।

মোরেটি লোকটির নাম, চেহারার বিবরণ সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল। তারপর বললেন–ওকে পেলে কী করব?

–খুন। খুন করে ফেলবেন। তখন কী এক অদৃশ্য শক্তি বুঝি জেনিফারের ওপর ভর করেছিল।

আপনি অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি।

ফোন কেটে গেল।

.

মোরেটির তলব পেয়ে তিন বিশ্বস্ত অনুচর–নিক ভিটো, স্যালভাতোর ফিওরে আর জোসেফ কোলেলা এসে হাজির হল। জ্যাকসন স্ক্যানলন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানালেন তিনি। তারপর বললেন–এখন মাঝরাত, যে ভাবেই হোক ওই লোকটাকে তোমরা খুঁজে বের করবে। আট ঘণ্টা সময় পাবে। তবে বাচ্চাটার যেন কোনো ক্ষতি না হয়। প্রয়োজনে ফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।

তিন বিশ্বস্ত অনুচর তিন পেশাদার খুনে। মাইকেল মোরেটির অঙ্গুলি নির্দেশে তারা নির্দ্বিধায় ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দিতে পারে। তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অপরাধ চক্রের কুশীলবদের নাড়িনক্ষত্র ওই তিন মস্তানের নখদর্পণে। তাই জ্যাকসানের খোঁজ পেতে তাদের দেরী হল না।

আট ঘণ্টা কাটেনি, তার আগেই মাইকেল মোরেটিকে তারা জানাল ব্রুকলিন কুইনস । এক্সপ্রেসওয়েতে সাত নম্বর বাংলোয় ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন ওই বাচ্চা ছেলেটাকে আটকে রেখেছে।

পরদিন সকাল সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে বিশাল একটি লিমুজিন গাড়ি সাত নম্বর বাংলোর। সামনে এসে দাঁড়াল। মাইকেল মোরেটি গাড়ি থেকে নামলেন। তিন সাগরেদ তার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল।

ওদের ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সাইলেন্সর লাগানো রিভলবার হাতে নিয়ে মোরেটি পায়ে পায়ে সাত নম্বর বাংলোর সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। পরক্ষণেই লাথি মেরে দরজাটা খুলে ফেললেন। দেখলেন একটি লোক হাঁটু ভাজ করে পেছন ফিরে বসে আছে, পাশে একটি বছর তিনেকের সুন্দর ছেলে।

দরজা খোলার আওয়াজে লোকটা ততক্ষণে মুখ ফিরিয়েছে। দাড়ি গোঁফে ঢাকা তার মুখ। লোকটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাইকেল মোরেটির রিভলবার থেকে গুলি ছুটে এল– এক...দুই...তিন। কপালে...গলায়...আর হৃৎপিণ্ডে। ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন ওরফে জ্যাকসন স্ক্যানলনের রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে তিন সাগরেদ ঘরের চৌকাঠে এসে পা রেখেছে। মোরেটি তাদের ঘরের ভেতরে ঢুকতে বললেন। তিনি ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেলেন। নাড়ি দেখলেন অত্যন্ত ক্ষীণ গাতি, কিন্তু বেঁচে আছে।

–ডঃ পেট্রনকে খবর দাও। জোসেফকে নির্দেশ দিলেন মোরেটি, ওকে বলো আমরা যাচ্ছি।

জোসেফ ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে চলে গেল।

এবার তিনি জেনিফারকে ফোন করে জানিয়ে দিলেন যে, তার ছেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। খুব তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে তিনি ফিরে আসবেন।

.

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন যযাশুয়াকে সঙ্গে নিয়ে মাইকেল মোরেটি ফিরে এলেন জেনিফারের বাড়িতে। ছেলের দুহাতের কবজি আর দুপায়ের গোড়ালিতে পুরু ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে জেনিফার আঁতকে উঠল।

ডাক্তার জানাল–শক্ত করে বেঁধে রাখার ফলে এমনটি হয়েছে। একটু ক্ষত হয়েছে। ওর নার্ভ বা ব্রেনের কোনো ক্ষতি হয়নি। ও সেরে উঠবে। আমি মাঝে মধ্যে এসে ওকে দেখে যাব।

মিসেস ম্যাক যোশুয়াকে খাটে শুইয়ে দিল। জেনিফার ছেলের মাথার কাছে বসল। কিছুক্ষণ বাদে যোশুয়ার ঘুম ভাঙল। মাকে দেখে বলল, আমি জানতাম মা, তুমি ঠিক আসবে।

–আগামী সপ্তাহে আমরা কী করব জানো? ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জেনিফার বলল, তুমি আর আমি একসঙ্গে মিলে–

জেনিফার লক্ষ্য করল যোশুয়া আবার ঘুমের জগতে হারিয়ে গেছে।

কয়েক ঘণ্টা বাদে জেনিফার ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকল। সেখানে বসে আছেন মাইকেল মোরেটি। মনে পড়ে গেল অ্যাডাম ওয়ার্নারের সাথে প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা। ওই একইভাবে তিনিও বসেছিলেন তার ছোট্ট ফ্ল্যাটে।

মাইকেল মোরেটি জানালেন-জ্যাকসনের মৃত্যু হয়েছে।

জেনিফার কীভাবে যে মাইকেল মোরেটিকে তার কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পেল না। এই লোকটির কাছে সে ঋণী হয়ে রইল। কীভাবে এই ঋণ শোধ করবে সে?

মাইকেল মোরেটি তখন পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিলেন জেনিফারের দিকে।

.

খোলা জানলার পাশে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জেনিফার। সামনে ট্যাজিয়ার উপসাগর। ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। আছড়ে পড়ছে গর্জন করে। শরৎকালের প্রকৃতি শান্ত। দূরে

সাগরের মাঝখানে দু-একটা পালতোলা নৌকা দেখা যাচ্ছে। দুটো বড় ইয়াট দেখতে পেল জেনিফার। নোঙর করে আছে।

হঠাৎ হাতের ওপর পুরুষের স্পর্শ। ঘাড় ফেরাল জেনিফারমাইকেল মোরেটি।

–জেনিফার, ওই সুন্দর প্রকৃতির মতো তোমাকেও সুন্দর লাগছে। জেনিফারের বুকের বোঁটায় হাত বোলাতে বোলাতে মোরেটি বললেন, চলো, আমরা বিছানায় যাই।

মোরেটির হাতের ছোঁয়ায় জেনিফারের শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে। তিনি এমন সব জিনিস দাবী করছেন, যা সাধারণ মানুষ চাইবার সাহস পায় না। এমন এমন আচরণ তিনি করছেন যা আগে কেউ তার সঙ্গে করেনি।

গায়ে গা ঠেকিয়ে হাতে হাত রেখে ওরা এল শোবার ঘরে।

সে রাতে তারা বারবার শরীর সংযোগ করেছিল। আকর্ষণীয় এক সুখ সাগরে ভেসে গিয়েছিল জেনিফার।

-তোমাকে পরিতৃপ্তি দিতে পেরেছি তো?

মাইকেল মোরেটির প্রশ্নে জেনিফার কেবল ঘাড় নাড়ল। লজ্জা এসে তখন তাকে গ্রাস করেছে। মাইকেল মোরেটিকে কাছে পাওয়া, তার সঙ্গে শরীর নিয়ে খেলা, এর মধ্যে যে কী নিদারুণ লজ্জা লুকিয়ে আছে, তা অন্য কারো পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

সেদিন মোরেটিকে সে প্রত্যাখান করতে পারেনি। হয়তো ঋণশোধ করছে সে? অথবা কৃতজ্ঞতাবোধ।

অ্যাডামের সঙ্গে সে এর আগে বহুবার দৈহিক মিলন ঘটিয়েছে। কিন্তু মাইকেল মোরেটির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। মাইকেল মোরেটি প্রথম রাতেই তাকে মুঠো বন্দী করে ফেলেছে। সমুদ্রের অশান্ত ঢেউয়ের মতো মোরেটির পুরুষালি যৌবন দৃপ্ত শরীর বারবার ভেঙে পড়ছে জেনিফারের শরীরের ওপর। পরম সুখে জেনিফার তাঁকে আঁকড়ে ধরে আছে।

তারা সে রাতে চার ঘণ্টা একসাথে কাটিয়ে ছিল। মোরেটির বন্য চাহিদা তাকে মেটাতে হয়েছিল। জেনিফার বুঝেছিল, এই মুহূর্ত থেকে তার জীবন ধারা অন্য গতিপথ ধরে এগোবে।

জেনিফার অবাক হয়ে ভেবেছে, মোরেটির সঙ্গে তার এই আচরণ শুধু কী কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। সে অ্যাডামকে ভালোবাসে এখনও। তবে মোরেটির সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে তা তার একাকীত্বের পরিণাম।

কিন্তু? একটা অপরাধ বোধ তার মনকে কাটার মতো বিঁধছে। মোরেটির পরিচয় ও পেশা জেনিফারের অজানা নয়। তার ছেলেকে উদ্ধার করতে সে একজনকে খুন করেছে, এরকম অসংখ্য খুন সে করে। টাকা, ক্ষমতা আর প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে একের পর এক মানুষ খুন করতে পারে সে। এরকম একটা পাষণ্ড জঘন্য লোকের কাছে সে কী করে দেহদান করল? কী করে শরীরে শরীর রেখে পরম সুখ লাভ করল?

পরদিন সকালে মোরেটি ফোন করলেন। যোশুয়া কেমন আছে জানতে চাইলেন। তারপর দুপুরে বারোটায় তাকে ডোনাটো রেস্তোরাঁয় লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানালেন।

জেনিফার মোরেটির ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হল ওই রেস্তোরাঁয়। কথায় কথায় সে জানতে চাইল, মাইকেল মোরেটি কীভাবে এই অন্ধকার পাতালপুরীর মাফিয়া সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে উঠেছে।

মোরেটি বলেছিলেন–ভেবো না, কারো চাপে পড়ে আমি একাজে নেমেছি। ক্ষমতা আর টাকার মোহ ছিল আগাগোড়া। দুনিয়ার অধীশ্বর হব আমি। সেই স্বপ্নই পূরণ হয়েছে আমার। আচ্ছা–মোরেটি জানতে চাইলেন, এক বিছানায় তুমি কেন আমার সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলে, জানতে বড় ইচ্ছে করে।

জেনিফার আমতা আমতা করে বলল তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাবোধই আমাকে..

–ভুল। আসলে তুমি আমার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছ। তোমার মনে আমার সাথে বিছানায় শোওয়ার বাসনা জেগেছিল।

মাইকেল, আমি

জেনিফার, টাকা বা কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে আমার মেয়ে কেনার প্রয়োজন হয় না। ওরা এমনিতেই আসে। খুব সাবধান, ভেবো না আমায় নিয়ে খেলবে। সে চেষ্টা বৃথা।

জেনিফার অবাক চোখে মোরেটির দিকে তাকাল। বুঝি এই মুহূর্তে জেনিফারের মনের সব শক্তি উবে গেছে।

লাঞ্চের শেষে ডেসার্ট খেতে খেতে মাইকেল মোরেটি কথাটা পাড়ল।

-জেনিফার, একটা মামলায় তোমাকে দাঁড়াতে হবে।

কে যেন জেনিফারের গালে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে।

কাজটা তোমাকেই করতে হবে। ভাস্কো গামবুটি আমার দলের একটি ছেলে। পুলিশকে খুন করে ধরা পড়েছে। ওর হয়ে তোমাকে লড়তে হবে।

জেনিফার নীরব। চাপা পুরোনো রাগটা যেন আবার চাগাড় দিয়ে উঠতে চাইছে।

দুঃখিত মাইকেল। আমার পক্ষে তোমার দলের লোকদের সঙ্গে জড়ানো সম্ভব নয়।

-তাই নাকি? মোরেটির চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। কোথায় যাবে তুমি? যেদিকে তাকাবে, শুধু জঙ্গল আর ঘন জঙ্গল।

জেনিফার নীরব। মাইকেল মোরেটি, ভুল কিছু বলেনি। শহরের কংক্রীট সভ্যতার আনাচে-কানাচে যে জঙ্গল তিলে তিলে গড়ে উঠেছে, তার অস্তিত্ব অস্বীকার করবে কী করে সে। সেই জঙ্গলের সম্রাট মাইকেল মোরেটি, অবশ্য এই সম্রাটের মাথায় তাজ নেই। সভ্য আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেই অন্ধকার গভীর জঙ্গলে বসে সে তার অন্ধকার জগতকে শাসন করে চলেছে। জেনিফার কোনোদিন সেই অন্ধকার জঙ্গলের

বাইরে আসতে পারবে না। সে উপলব্ধি করল, মাইকেল মোরেটির সেই অন্ধকার জঙ্গলে প্রবেশ করে সে পথ হারিয়েছে।

তবুও সে ঠিক করল, অন্তত একবারের জন্য মাইকেল মোরেটির কাজটা করে দেবে।

পরদিন অফিসে এসে জেনিফার কেনেথকে জানাল সব কথা।

সব শুনে কেনেথ চমকে উঠল–অবিশ্বাস্য চোখে জেনিফারের দিকে তাকাল জেনিফার, তুমি জানো, ও একজন মাফিয়া। অন্ধকার জগতের ডন। এই ধরনের মক্কেলের কাজ আমরা নেব কেন?

–ভাস্কো একজন মানুষ। সুবিচার পাবার অধিকার তারও আছে। জেনিফার ভাবলেশহীন গলায় জবাব দিল–আমি ওর হয়ে আদালতে দাঁড়াব।

না, তা তুমি কিছুতেই করতে পারো না।

-এই অফিসের মালিক আমি। অতএব সিদ্ধান্ত আমিই গ্রহণ করব। জেনিফারের কাঠোর হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কী পরিস্থিতিতে পড়ে সে যে এই মামলার দায়িত্ব নিয়েছে, সেটা যদি শুনত কেনেথ। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এমন কী নিজের কাছে সে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

.

পরদিন শহরের সমস্ত খবরের কাগজে বড়ো বড়ো হরফে ছাপানো হল ভাস্কো গামবুটির মামলার ব্যাপারে। কম্বলের দোকানে ঢুকে ডাকাতি করতে গেলে এক পুলিশ কর্মচারী বাধা দিলে তাকে খুন করে। ওই মামলার আসামী পক্ষের হয়ে সওয়াল করবেন জেনিফার পার্কার।

খবরটা বিচারক লরেন্স ওয়াল্ডম্যানের নজর এড়াল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন– জেনিফার, কাগজে যা ছাপিয়েছে তা কি সত্যি?

–হ্যাঁ।

–তুমি জানো, ও কার দলের লোক? ওয়াল্ডম্যানের কণ্ঠে বিস্ময়।

–হ্যাঁ, জানি।

–জেনিফার, তুমি জেনেশুনে একটা মারাত্মক ফাঁদে পা দিতে চলেছে।

না, তা নয়। আমি আমার এক বন্ধুর উপকার করছি মাত্র।

–তবুও সাবধান থাকাই ভালো।

–ধন্যবাদ। জেনিফার ফোন নামিয়ে রাখল।

জেনিফার জানত, ভাস্কো গামবুটির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব নেই। এই মামলায় জেতার মতো অস্ত্র কিছু নেই। তবে একটা উপায় আছে, সে নিহত পুলিশ অফিসার

নরম্যান, স্কটের স্বভাব চরিত্র এবং অন্যান্য বিবরণ খুঁটিয়ে জানার জন্য কেনেথ বেইলিকে কাজে লাগাল।

টানা দশদিন ধরে মামলাটা চলল।

খোঁজ খবর নিয়ে কেনেথ বেইলি এসে জানাল, নিহত পুলিশ অফিসার নরম্যান স্কটের চাকরিতে বিশেষ সুনাম ছিল না। কুড়ি বছর চাকরি জীবনের মধ্যে তিনি তিনবার অকারণে গুলি চালানোর অপরাধে সাসপেন্ড হয়েছিলেন। নিরস্ত্র অবস্থায় একাধিক সন্দেহভাজন লোককে খুন করেছেন, বারে ঢুকে মাতালদের পিটিয়েছেন।

জেনিফার এইসব তথ্যগুলিকে অস্ত্র হিসাবে আদালতে পেশ করল। কাজ হল। জুরীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এলেন যে, ভাস্কো গামবুটি যে অপরাধ করেছে, তাকে খুন বলা যায় না। হাতাহাতির ফলে পুলিশ অফিসার নরম্যান স্কটের মৃত্যু হয়েছে। বিচারক জুরীদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ভাস্কো গামবুটিকে মৃত্যুদণ্ড দিলো না।

খুশী হয়ে মাইকেল মোরেটি হীরের আংটি উপহার দিলেন জেনিফারকে। সে রাতে আবার তারা শরীর নিয়ে খেলেছিল এক চরম ও পরম খেলা।

এরপর থেকে মাইকেল মোরেটি একের পর এক মামলা তুলে দিলেন জেনিফারের হাতে। আসামী পক্ষের হয়ে তাকে কাজ করতে হল। এইভাবে চলতে চলতে একসময় জেনিফার বুঝতে পারল, মাইকেল মোরেটির খপ্পরে সে একেবারে বন্দী হয়ে গেছে।

জেনিফারকে একদিন মোরেটি নিজের শ্বশুরবাড়িতে ডিনারের আসরে নিয়ে এলেন। জেনিফার মোরেটির স্ত্রী রোজা, শ্বশুর অ্যান্টোনিও গ্র্যানেলি আর আইন উপদেষ্টা টমাস কোলফ্যাক্সের সঙ্গে বসে ডিনার সারল।

মোরেটির শ্বশুর গ্রানেলি শোনালেন মাফিয়া চক্রের পূর্ব ইতিহাস।

আমাদের আদি গোষ্ঠীর নাম ছিল ইউনিয়ান সিসিলিয়ামা। ক্ষমতাসীন ধনী ও বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের হাত থেকে গরীব ও দুর্বল লোকদের রক্ষা করাই ছিল এই দলের উদ্দেশ্য। গরীবদের ওপর অত্যাচার যে চালাত, তাকেই মরতে হত। ধীরে ধীরে এই দলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এত বেড়ে গেল যে, সরকারী আইনও তার কাছে পাত্তা পায় না। আমরা কখনও বিশ্বাসঘাতককে প্রশ্রয় দিই না। বিশ্বাসের অমর্যাদা করলে মৃত্যুঅনিবার্য।

.

গোষ্ঠীর ইতিহাস বর্ণনা করার ফাঁকে জেনিফারকেও যে হুঁশিয়ারি দেওয়া হল, সেটা বুঝতে দেরী হল না তার। বর্তমানে আমেরিকার আনাচে কানাচে মাফিয়াদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বহু বিলিয়ন ডলারের লেনদেন হয়। এইসব দলের যেসব সদস্যরা আইনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে, তাকেই উদ্ধার করে আনতে হবে জেনিফারকে।

একের পর এক এই ধরনের মামলা আসতে লাগল জেনিফারের কাছে। কেনেথ বেইলি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

সে বলল–জেনিফার, এসব কী হচ্ছে? গুণ্ডা-বদমাশদের হয়ে তুমি মামলা লড়ছ, ওদের পাল্লায় পড়ে আমরা তো শেষ হয়ে যাব।

–তুমি ভেবো না। জেনিফার আশ্বাস দেয়–পাপের শাস্তি ওদের ভোগ করতেই হবে একদিন।

–ভেবো না, তুমি ওদের থেকে রেহাই পাবে।

তখনকার মতো জেনিফার এই প্রসঙ্গ থামিয়ে দিল।

.

একদিন ফাদার রায়ান এলেন জেনিফারের সঙ্গে দেখা করতে।

–তুমি নাকি আজকাল খারাপ আর বদ লোকদের সঙ্গে আইনি কারবার করছ?

বদ লোক বা অসৎ তোক কারা, ফাদার। আপনার কাছে কোনো লোক সাহায্যের জন্য এলে তাকে পাপী বলে দূরে সরিয়ে দেন? সৎ অসৎ-এর বিচার করেন?

-না, তা কখনোই করি না, ভুল করে কোনো মানুষ অপরাধ করতেই পারে। কিন্তু দুর্নীতি আর পাপ যখন হাতে হাত মিলিয়ে চলে, তখন তা ক্ষমার অযোগ্য। এসব লোককে সাহায্য করা মানে নিজেকেও ওই রকম হতে হয়।

–ফাদার, জেনিফার বলল, বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করাই আমার পেশার ধর্ম।

মাঝে মাঝে জেনিফার ভাবে, অ্যাডাম ওয়ার্নার আর মাইকেল মোরেটি মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। তারা কর্তব্যে অটল। অবশ্য দুজনের কাজের ধারা আলাদা।

.

ছয় বছরের ছেলে যোয়া এখন বাইসাইকেলে চেপে বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে যায়। জেনিফার চায়, তার ছেলে মনে ও দেহে প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠুক। স্বাধীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হোক। তাই সে ছেলের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসা প্রকাশ করে না।

যোশুয়া বই পড়তে শিখেছে। গানের প্রতি আগ্রহ আছে তার। ছেলেকে নিয়ে জেনিফার মাঝে মাঝে ঘুরতে যায়। নাটক বা সিনেমা দেখে সময় কাটায়। রেস্তোরাঁয় বসে খায়। রবিবার তারা নৌকোয় চেপে জলভ্রমণ করে। বাপের অভাব বুঝতে দেয় না তাকে।

পড়াশুনা আর খেলাধুলায় চৌখস হয়ে উঠেছে সে। ক্লাসের সেরা ছাত্র। বুদ্ধি ধরে দারুণ।

স্কুলের ছুটি পড়েছে। ছেলেকে নিয়ে জেনিফার হল্যান্ডে ছুটি কাটাতে এল। গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে একসময় যোশুয়া বলে উঠল–মা, আমি এখানকার স্কুলে পড়াশুনা করতে পারব?

জেনিফারের যেন টনক নড়ল। তাইতো যোয়া বড়ো হচ্ছে। সে আরো বড়ো স্কুলে পড়বে, কলেজে পড়বে। নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী করবে। বিয়ে করে সংসারী হবে। তখন কী আর এই মায়ের কথা সে মনে রাখবে?

এক রবিবারে কথা। সকাল বেলা। মিসেস ম্যাকের ছুটির দিন। যোশুয়া কোথায় যেন বাইরে গেছে। রাতের খাবার বানাতে হবে। ফ্রিজ খুলল। এক টুকরো কাগজ নজরে পড়ল। টেনে বের করল। তাতে লেখা আছে

আজ রাতে অ্যালানকে আমাদের বাড়িতে ডিনারে নেমতন্ন করেছি। তুমি রাগ করবে নাতো মা?

অ্যাডাম, অ্যাডামও এককালে এইভাবে তার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে ফ্রিজের ভেতরে রেখে যেত। বাপের অনেক স্বভাব ছেলে পেয়েছে।

মাঝে মধ্যে যোশুয়া তার বাবার পরিচয় জানতে চায়।

জেনিফার কেবল বলে–তোমার বাবা ভিয়েতনামের যুদ্ধে মারা গেছেন?

–কোনো ছবি নেই?

আবার মিথ্যে বলতে হয় জেনিফারকে আমাদের বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই আর ছবি তোলার সুযোগ হয়নি।

শুধু যোশুয়া নয়, মাইকেল মোরেটিও একবার যোশুয়ার পিতৃপরিচয় জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। ..

জেনিফার জানে, সত্যি কথাটা মোরেটি জানলে কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাবে। যদি শোনে অ্যাডাম ওয়ার্নার ওর বাবা, তাহলে কী যে, প্রতিক্রিয়া হবে ওর মধ্যে, ভেবে পায় না জেনিফার।

সে শুধু বলল নাম জেনে কাজ নেই। কেবল জেনে রাখো, উনি ভিয়েতনামের যুদ্ধে মারা গেছেন।

.

মেক্সিকো থেকে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের পাচার সাঙ্ঘাতিক ভাবে বেড়ে যাওয়াতে সরকার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। মাফিয়া সংগঠনগুলি এর জন্য সর্বাধিক দায়ী। মাদক দ্রব্যের বেআইনি চালান বন্ধ করতে হবে। গঠিত হল একটি তদন্ত কমিশন। সেনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নারকে করা হল কমিশনের চেয়ারম্যান। যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সরকার এবং অ্যাডাম ওয়ার্নারের উদ্যোগে তিন মাসের মধ্যে মেক্সিকো থেকে নিষিদ্ধ মাদকের চোরাচালান অস্বাভাবিকভাবে কমে গেল।

ব্যাপারটা মাইকেল মোরেটিকে ভাবিয়ে তুলল। নিউজার্সির কাছে ছোটো এক খামারবাড়িতে তিনি তার দলের সকলকে ডেকে পাঠালেন। ঘটনাচক্রে জেনিফারকেও সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হল। এমন কি শ্বশুর অ্যান্টোনিও গ্র্যানেলি এবং আইন উপদেষ্টা টমাস কোলফ্যাক্সও সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।

জেনিফার পার্কারের বুদ্ধির তারিফ করেন টমাস কোলফ্যাক্স। কিন্তু মাইকেল মোরেটি ওই মেয়েটির ওপর বড্ড বেশী ভরসা করেন, তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না, একথা ভেবে হিংসায় তার গা রি-রি করে। এই দলে তার প্রভাব ছিল যথেষ্ট, কিন্তু ওই উকিল মেয়েমানুষটা এসে সব ভণ্ড কর দিয়েছে।

বৈঠক শুরু হয়নি তখনও দেখা গেল পার্কারের বিরুদ্ধে মোরেটির কান ভাঙানোর চেষ্টা করছেন। তিনি বললেন–এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠকে একজন মেয়ে মানুষকে। ডেকে আনা ঠিক হয়নি। দলের অন্যান্য শাখার নেতাদেরও তিনি বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু তার কাথায় কেউ পাত্তা দিল না। দলের প্রধান নেতা যখন তাকে ডেকে এনেছে, এ ব্যাপারে তাদের আর কী বলার থাকতে পারে।

–তুমি অ্যাডাম ওয়ার্নারের নাম শুনেছো জেনিফার?

মাইকেল মোরেটির আচমকা আক্রমণে জেনিফার হকচকিয়ে গেল। মনে হল তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাইকেল মোরেটি ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

–আপনি, মানে–ওই সিনেটরের কথা বলছেন? কোনো রকমে ঢোক গিলে জেনিফার জবাব দিল।

-হ্যাঁ, লোকটা ভীষণ বাড় বেড়েছে। এবার ওর ডানাদুটো ছেটে দিতে হবে। ও এবার নিপাত যাবে।

-কেন মাইকেল? জেনিফারের বুকের ভেতরটা যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে।

–ও আমাদের কারবার লাটে তুলতে চাইছে। এর মধ্যে ওর মাথা গলাবার কী ছিল? ওর কথা শুনেই মেক্সিকো সরকার সেখানকার অনেকগুলো কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের কারবারের মালও সেখানে তৈরী হত। না, আর নয়! লোকটার এবার পরপারে যাবার সময় হয়েছে।

–মাইকেল। জেনিফার উত্তেজনা চেপে রেখে বলল, জেনে রেখো, ওকে খুন করলে তোমরাও বাঁচবে না। তাছাড়া, এখন অ্যাডাম ওয়ার্নারকে সরিয়ে দিলে দেখবে সেখানে আরও দশটা এসে দাঁড়িয়েছে, দশটাকে মেরে ফেললে আসবে একশোটা। আর খবরের কাগজগুলো ওরা কি তোমাকে ছেড়ে দেবে? রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। অ্যাডাম ওয়ার্নার খুন হলে যে তদন্ত শুরু হবে, জেনে রেখো বর্তমান তদন্ত তার কাছে কিছুই নয়।

–আমি বলছি, অ্যাডাম আমাদের ক্ষতি করছেন, আক্রোশে ফেটে পড়লেন মোরেটি।

-মাইকেল। রাগের মাথায় বোকামি করো না। এই ধরনের তদন্ত নিশ্চয়ই তুমি প্রথম দেখছ না? কতদিন ধরে চলে এসব তদন্ত। সেনেটর দীর্ঘদিন ধরে নিশ্চয়ই একটা বিষয় নিয়ে লেগে থাকবে না। কয়েক মাস পরে দেখবে, তোমাদের ব্যবসা আগের মতো রমরম করে চলছে। তোমাদের বন্ধ কারখানাগুলি আবার খুলে যাবে। এর ফলে কোথাও কোনো ঝামেলা দেখা দেবে না, অথচ তোমার ব্যবসা ঠিকই রইল। আমার কথা মতো কাজ করো মাইকেল।

–আমি আপনার যুক্তি মেনে নিতে পারছি না। টমাস কোলফ্যাক্স বলে উঠলেন। আমি বলি–

–আপনি থামুন। মাইকেল মোরেটি গর্জে উঠলেন। মনে হল কে যেন তার গালে সপাটে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অ্যাডাম ওয়ার্নারের প্রসঙ্গ সেবারের মতো চাপা রইল।

মাইকেল মোরেটি বললেন–ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গ এখন থাক। সোনার ভারী লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তিনি বলতে শুরু করলেন, জেনিফার তোমার জন্য একটা কাজ আছে। আমার দলের এক সদস্য, নাম মার্কো লোরেঞ্জো, ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

কী করত চাও? জেনিফার জানতে চাইল, আপিল?

না, আমি ওকে জেলের মধ্যেই রাখতে চাই।

মাইকেল মোরেটির মনোভাব বুঝতে না পেরে জেনিফার তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

আমার কাছে খবর আছে, রবার্ট ডিসিলভা ওকে আবার সিসিলিতে ফেরত পাঠাতে চাইছেন। কিন্তু ওখানে গেলে মার্কো একদিনও বাঁচবে না। ওর শত্রুরা ওকে খতম করে দেবে। সিং সিং জেল ওর পক্ষে উপযুক্ত বছর দুয়েকের মধ্যে নিশ্চয়ই ওর শত্রুরা ঠান্ডা

হয়ে যাবে। তখন না হয় ওকে গরাদের বাইরে আনা যাবে। এই কাজটা তোমাকে করে দিতে হবে। পারবে?

রবার্ট ডি সিলভা কোনো সমঝোতায় আসতে চান না। ওর সঙ্গে রফা করা মুশকিল।

-বেশ, তাহলে অন্য কারোকে দায়িত্বটা দেওয়া হোক। টমাস কোলফ্যাক্স ফোড়ন কাটলেন।

–না। টমাস কোলফ্যাক্সকে চুপ করিয়ে দিয়ে মোরেটি বললেন, আমি চাই, মামলাটা তুমি করো।

বৈঠক শেষ হল। যে যার বাড়ি ফিরে গেল।

জানলার পাশে এসে দাঁড়ালেন মাইকেল মোরেটি, তার ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে নিক ভিটো।

দেখা গেল, টমাস কোলফ্যাক্স তার সিডানে উঠে বসেছেন। স্টার্ট দিচ্ছেন।

সেদিকে তাকিয়ে মোরেটি টমাসকে লক্ষ্য করে নিককে বললেন, লোকটা বুড়ো হয়েছে। ওকে আর বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই।

–ওই কোলফ্যাক্সকে?

–হ্যাঁ, ওকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। আমার শ্বশুরের মতোই বুড়ো হয়ে গেছে।

বেশ তো ওস্তাদ, যেদিন বলবে, সেদিনই সাবাড় করে দেব।

–হ্যাঁ, আমি তোমায় বলব, কিছুদিন পরে।

জজ লরেন্স ওয়াল্ডম্যানের খাস কামরায় তার উল্টোদিকের চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছেন রবার্ট ডি সিলভা আর জেনিফার পার্কার। মাকো লোরেঞ্জোকে কোন জেলে ফেরত পাঠানো হবে, সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

জেনিফার বলল, আমার মতে ওকে সিসিলিতেই ফেরত পাঠানো উচিত। একজন বিদেশী, বেআইনিভাবে এখানে বসবাস করবে, তা ঠিক নয়।

জেনিফারের এই প্রস্তাবে রবার্ট ডি সিলভা চমকে উঠলেন। তিনি নিজেই মার্কোকে সিসিলিতে ফেরত পাঠানোর পক্ষপাতী। কিন্তু জেনিফার যখন তার যুক্তিকে সমর্থন করছে, তখন তাকে তো অন্য কিছু বলতে হয়।

–ওকে বরং সিং সিং জেলে পাঠানো হোক। রবার্ট ডি সিলভা মন্তব্য করলেন, ওখানে। ও ঠান্ডা হয়েই থাকতে পারবে। নতুন করে কোনো ঝামেলা করবে না।

–লোরেঞ্জোর বয়স হয়েছে, জেনিফার বলতে থাকল, জেলে বন্দী থাকলে ওর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। তাছাড়া সিসিলিতে ওর বন্ধুরা আছে। জীবনের বাকি দিনগুলি ও শান্তিতেই কাটাতে পারবে।

–ওই গুণ্ডবদমাশটার জন্য আপনার দরদ দেখছি উথলে উঠছে। রবার্ট ডি সিলভা রাগে ফেটে পড়লেন।

দরদ নয়। আর পাঁচজনের মতো ওর সুবিচার পাবার অধিকার আছে।

–না, কোনো অধিকার নেই। ওর বিরুদ্ধে সবরকম অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে জজ, ওয়াল্ডম্যানের দিকে তাকিয়ে রবার্ট ডি সিলভা বললেন–ধর্মাবতার, বাজে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনি ওকে সিং সিং জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

–আপনারও কি ওই একই অভিমত? কিছু বলবেন?

–জেনিফারের দিকে বিচারক ওয়াল্ডম্যান প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

-না, ধর্মাবতার। জেনিফার তাকাল রবার্ট ডি সিলভার দিকে। বুঝি ভস্ম করে দেবে তাকে।

জজ ওয়াল্ডম্যান বললেন আপনারা তাহলে আসুন। এই মামলার রায় আগামীকাল। বেরোবে।

জেনিফার ওখান থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকল একটা পাবলিক বুথে। ফোন করে মোরেটিকে জানিয়ে দিল যে, চিন্তার কোনো কারণ নেই, মার্কোকে সিং সিং জেলেই ফেরত পাঠানো হবে।

.

বিকেলবেলা অফিসে ফিরে এল জেনিফার। দেখল কেনেথ বেইলি বসে আছে।

কথাটা আমায় আগে বলেনি কেন? সরাসরি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কেনেথ জেনিফারের দিকে।

-কোন কথা?

–মাইকেল মোরেটির সঙ্গে তোমার যে গোপন প্রেম ও প্রণয় গড়ে উঠেছে, সেই কথা বলছি আমি।

এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই, কথাটা বলতে গিয়েও জেনিফার বলতে পারল না। কেনেথ তার বন্ধু। অতীতে কোনো একদিন কেনেথের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ফলে টেবিল চেয়ার নিয়ে অফিস খুলে বসতে পেরেছিল সে। এমন কী সপিনা বিলি করার কাজও তাকে জুটিয়ে দিয়েছিল। তখন জেনিফারের আর কোনো রোজগার ছিল না।

–এ প্রসঙ্গ থাক কেনেথ। জেনিফার শান্ত গলায় বলল।

–কেন? থাকবে কেন? কেনেথ গর্জে উঠল। যে লোকটা তোমার একদিন সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, তার সঙ্গেই কিনা। ছিঃ ছিঃ, কান পাতা যাচ্ছে না। সবাই বলছে তুমি নাকি মাইকেল মোরেটির রক্ষিতা হয়ে গেছে। সে একটা নরকের কীট। নর্দমার পোকা। তুমি ওই নর্দমার যত নোংরা এই অফিসে এনে তুলেছে। আর নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যই

আমাদেরও ওই কাজে লাগিয়েছে। তুমি জাহান্নামে যাও, আমি দেখতে যাব না। আমি আর এই অফিসে থাকতে চাই না। আমি চললাম।

জেনিফার বলল–কেনেথ, তুমি শুধু শুধু উত্তপ্ত হচ্ছে। লোকটার মনটা ভারী ভালো। আলাপ হলে তোমার এই ধারণা পাল্টে যেত।

উত্তেজনার বশে কথাটা বলে জেনিফার বুঝতে পারল, কী সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেছে, নিজের মনের দুর্বলতা প্রকাশ করে দিয়েছে।

জেনিফার, তুমি অনেক পাল্টে গেছে। কেনেথের কণ্ঠে এক রাশ বেদনা, তোমার প্রথম দিনের প্রতিমূর্তি আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। আমি সেদিনের সেই জেনিফারকে মনে রেখে বিদায় নিলাম তোমার কাছ থেকে, যোশুয়াকে আমার বিদায় জানিও।

কেনেথ চলে গেল। জেনিফার কান্নায় ভেঙে পড়ল। ডেস্কের ওপর মাথা রেখে বসে রইল।

রাত হয়েছে। জেনিফার চোখ মেলে তাকাল। চারপাশ অন্ধকার। জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। শহরের পথ আলোতে ঝলমল করছে। গোটা শহরটা যেন এক জঙ্গল। এই জঙ্গলের রাজা একজন–মাইকেল মোরেটি। এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার পথ আজ বন্ধ।

.

আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে আকাপুলকোয়। জেনিফার সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছে। আকাপুলকো মেক্সিকোর একটি বিখ্যাত শহর। সমুদ্রের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। মার সঙ্গে বেড়তে যাবে শুনে যোশুয়া খুশিতে নেচে উঠল।

বিকেল চারটের সময় বেলিটো জুয়ারেজ এয়ার পোর্টে প্লেন থেকে নামল জেনিফার আর যোশুয়া। আকাপুলকো থেকে আট মাইল দূরে লাসরিসাসের একটা বড়ো হোটেলের বাংলো আগে থেকে সে ভাড়া করেছিল, সেখানে গিয়ে উঠল।

.

বিশাল হল ঘরের ভেতর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাড়ে সাত হাজার প্রতিনিধি এখানে এসে জড়ো হয়েছে। তারা গল্পগুজব করছে। মঞ্চের ওপর কয়েকজন প্রতিনিধি বসে আছে। একজনকে দেখে জেনিফার চমকে উঠল–অ্যাডাম। অ্যাডাম ওয়ার্নার।

বেশ কয়েক বছর পর সে অ্যাডামকে আজ সামনা সামনি দেখল। তাদের শেষ দেখা হয়েছিল যখন ওর বউ মেরিবেথ গর্ভবতী ছিল।

জেনিফার ঠিক করল সভা শেষ হবার আগেই এখান থেকে চলে যাবে। অ্যাডাম জানে না, এখানে তার ছেলে যোশুয়া উপস্থিত আছে।

মাননীয় সুধিবৃন্দ, বার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বলতে শুরু করলেন। আমাদের প্রধান অতিথি সেনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নার আপনাদের সামনে এখন বক্তব্য রাখবেন। উনি হলেন নিউইয়র্ক বার অ্যাসোসিয়েশনের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করবেন বলে আমরা আশা রাখি।

অ্যাডাম ওয়ার্নার মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন–

মাননীয় সভাপতি এবং সদস্যবৃন্দ। আমরা আজ এখানে সবাই মিলিত হয়েছি একটাই উদ্দেশ্যে তা হল ভাবের আদান প্রদান।

আজকের যুক্তরাষ্ট্রের আইনবিদরা বিভিন্ন মহলের তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছেন। এমন কী, সুপ্রীম কোর্টের চিফ জাস্টিস নিজেও আমাদের মহান পেশার প্রতি কটাক্ষপাত করেন মাঝে মাঝে, যা আগে কখনও ঘটেনি...

অ্যাডামের ভাষণ শেষ হল। জেনিফার এবার বেরিয়ে আসার জন্য তৈরী হল। কিন্তু তাকেও ঘিরে ধরেছে কত মানুষ। কারণ আইনজীবী হিসেবে জেনিফার যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। তার সঙ্গে অনেকেই আলাপ করতে চাইছে। ভিড় কাটিয়ে বেরিয়ে আসতেই অ্যাডাম ওয়ার্নার তাকে দেখে ফেলল।

-জেনিফার।

অ্যাডামের কণ্ঠস্বর। পালাবার সুযোগ পেল না জেনিফার। অ্যাডাম নিজেই তার দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

-তোমাকে কতবার টেলিফোন করে, চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। তুমিও তো যোগাযোগ করার চেষ্টা করোনি।

অ্যাডামের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জেনিফার চুপ করে রইল।

তোমার অনেক কথা কাগজ পড়ে জানতে পাই। অ্যাডাম আবার বলল।

–আমিও কাগজে তোমার সম্পর্কে অনেক খবর পড়েছি। জেনিফার বলল, মনে মনে আমি খুব গর্ববোধ করি।

-জেনিফার, তোমার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মাইকেল মোরেটির বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় করাই আমার কমিটির কাজ। লোকটা আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না।

–অ্যাডাম, ও আমার মক্কেল। তাঁর সম্পর্কে কোনো আলোচনা আমি তোমার সাথে করতে পারি না।

–তুমি বিয়ে করোনি জেনিফার।

না।

অল্পক্ষণের নীরবতা। অ্যাডাম জানতে চাইলেন–আজ রাতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। তুমি রাজী?

-না।

–জেনিফার, তুমি এভাবে আমার সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পারো না। তোমাকে অনেক কথা বলার আছে আমার।

–অ্যাডাম। জেনিফারের কণ্ঠে মিনতি, আমরা এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি না। বিশেষ করে মাইকেল মোরেটি তোমার শত্রু যেখানে

আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খাবে। আমার এক বন্ধুর মোটর বোট পেয়েছি। পালোমা ব্লাঙ্কা। ঠিক আটটায় ইয়ার্ট ক্লাবে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

–আমি যেতে পারব না।

–কোনো কথা শুনব না। তোমার জন্যই বসে থাকব।

ওরা যখন কথোপকথনে ব্যস্ত ছিল তখন বারের এককোণে বসে মাইকেল মোরেটির এক সাগরেদ নিক ভিটো ওদের ওপর নজর রেখেছিল। কিন্তু জেনিফার বা অ্যাডাম ওয়ার্নার তা জানতে পারল না।

.

নিউইয়র্কে ফিরে এসেছে জেনিফার। যোশুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার মাথার পেছনদিকটা আলুর মতো ফুলে উঠেছে। আকাপুলকোয় থাকার সময় সমুদ্রে ওয়াটার স্কি করতে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল সে। সম্ভবত সেই কারণে–

ছেলেকে নিয়ে জেনিফার হাসপাতালে এল। মাথায় চোট লাগার ফলে যোশুয়ার মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাথা অপারেশন হল। কিন্তু যোশুয়া আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল না।

জেনিফারের বিশ্বাস হল না যে, তার একমাত্র সন্তান আজ আর বেঁচে নেই। সে একটুও ভেঙে পড়ল না। নিজের হাতে ছেলেকে শেষ সাজে সাজিয়ে দিল।

যোশুয়া কবরের অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। জেনিফার বাড়ি ফিরে এল। সে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল। বাড়ির সর্বত্র যোশুয়ার স্মৃতি চিহ্ন, খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে সে একাকিনী পাঁচদিন কাটিয়ে দিল যোশুয়ার ঘরে।

জেনিফারের খোঁজ না পেয়ে মাইকেল মোরেটি তার সাঙ্গপাঙ্গদের পাঠালেন। ঘরের জানলা ভেঙে তারা ভেতর ঢুকল। অর্ধ অচেতন জেনিফারকে তারা হাসপাতালে ভর্তি করে দিল।

.

এদিকে টমাস কোলফ্যাক্সকে খুন করার নির্দেশ পেয়েও নিক ভিটো কাজটা করতে পারল না। হাজার হোক ওই লোকটা তাকে আর ভাইকে একাধিক খুনের মামলা থেকে

বাঁচিয়েছে। সেই কৃতজ্ঞতার কথা মনে রেখে সে কোলফ্যাক্সকে নিউইয়র্ক ছেড়ে প্লেনে চেপে ওয়াশিংটনে চলে আসতে সাহায্য করল।

টমাস কোলফ্যাক্স উঠলেন ক্যাসিটন হোটেলের ১৪ নম্বর ঘরে। অ্যাডাম ওয়ার্নারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন। মাইকেল মোরেটির যাবতীয় অপরাধের বিবরণ তিনি জানাবেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তাকে দিতে হবে নিরাপত্তা।

অ্যাডাম ওয়ার্নার টমাস কোলফ্যাক্সের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। এতো মেঘ না চাইতেই জল।

তিনি ক্যাসিটন হোটেলে এলেন। টামস কোলফ্যাক্সের সঙ্গে কথা বললেন। অ্যাডাম প্রতিশ্রুতি দিলেন, দেশ ছেড়ে চলে যাবার মতো প্রচুর টাকা সরকারের পক্ষ থেকে টমাস পাবেন এবং একটি নতুন পরিচয় পত্র।

টমাস কোলফ্যাক্সকে জেরা করতে অ্যাডাম ওয়ার্নারের সঙ্গে এসেছিলেন ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা এবং এফ বি আই-এর সহকারী ডিরেক্টর।

–আপনার অবর্তমানে মোরেটির আইন উপদেষ্টার কাজ কে করবেন?

ডি সিলভার প্রশ্নের জবাবে টমাস বললেন মিস জেনিফার পার্কার। উনি মোরেটির খুব কাছের লোক হয়ে উঠেছেন।

অ্যাডাম জানেন, মাইকেল মোরেটি জেনিফারের মক্কেল। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, কোলফ্যাক্স যেন অন্য প্রসঙ্গে চলে আসেন।

কিন্তু টমাস তখন জেনিফারের মুন্ডছেদ করে গায়ের ঝাল মেটানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন।

–মোরেটির নানারকম আর্থিক প্রতারণার সঙ্গে, এমন কী একটা খুনের সঙ্গেও জেনিফার জড়িয়ে পড়েছেন।

খুন? প্ররোচনা? জেনিফার? ঘরের ভেতর বোমা ফাটলেও অ্যাডাম এতটা বিচলিত হতেন না। তিনি বুঝতে পারছেন, জেনিফার ভয়ানক একটা ঝামেলার মধ্যে পড়তে চলেছে। ওকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। যেভাবেই হোক জেনিফারকে খুঁজে বের করবেন তিনি।

মাফিয়াদের সবকটি সংগঠনের বিরুদ্ধে এবার তারা চূড়ান্ত অভিযানে নামলেন, এত বড়ো অভিযান যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম।

এর পাশাপাশি অ্যাডাম জেনিফারের খোঁজ করতে লাগলেন। তার অফিসে বারবার ফোন করলেন। ওর সহকর্মীরা সঠিক কোনো খবর জানে না তার।

অ্যাডাম খুব ভালো ভাবেই জানেন, এফ বি আই, কাস্টমস, ইন্টারন্যাল রেভিনিউ এইসব সংগঠন মোরেটি সমেত মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামলে যাদের গ্রেপ্তার করা হবে, তাদের নামের তালিকায় জেনিফার পার্কারের নামও থাকবে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে জেনিফার। পাহাড়ের ওপরে একটা বাড়িতে সে এসে উঠেছে, মাইকেল মোরেটিরই বাড়িটি।

মাইকেল একদিন সেই বাড়িতে এলেন। জানালেন বিশেষ একটা কাজে জেনিফারকে সিঙ্গাপুরে যেতে হবে। সন্তানের অসময়ে মৃত্যু, একাকীত্ব এবং অপরাধবোধ জেনিফারের মনে তখন এক নতুন চেতনার জন্ম দিয়েছে। সে স্থির করল আর নয়, মাইকেল মোরেটির কাছ থেকে দূরে অন্য কোথাও চলে যাবে। নতুন করে জীবন শুরু করবে। সিঙ্গাপুরের কাজটাই হবে তার শেষ কাজ।

.

জেনিফারের ওপর মাইকেল মোরেটির আগেই সন্দেহ হয়েছিল। আকাপুলকোতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তার সেই সন্দেহকে আরও দৃঢ় করল।

জেনিফার এখন সিঙ্গাপুরে। মাইকেল মোরেটি লোক লাগিয়ে জেনিফারের সমস্ত অতীত খবর সংগ্রহ করলেন। জানতে পারলেন, জেনিফার আগে বেলমন্ট টাওয়ার্সে একটি পাঁচ কামরার অ্যাপার্টমেন্টে থাকত। সেখানে অ্যাডাম ওয়ার্নার নামে এক পুরুষ বন্ধু আসত। এবং তারা এক সঙ্গে রাত কাটাত।

তার মানে? তার মানে জেনিফার আর অ্যাডাম ওয়ার্নার একসঙ্গে শলা-পরামর্শ করে তার সর্বনাশ করার খেলায় মেতে উঠেছে। প্রতিহিংসার নেশায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মাইকেল মোরেটি। এমন কি টমাস কোলফ্যাক্স যে বেঁচে আছে, সে খবরও তার অজানা রইল না।

বাইরে থেকে পুসিক অ্যাসিড মেশানো খাবার চরের মাধ্যমে ম্যারিনস বাহিনীর অফিসার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিলেন। সেই বিষাক্ত খাবার খেয়ে টমাস কোলফ্যাক্সের মৃত্যু হল।

সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এল জেনিফার। নিউইয়র্কের মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এফ বি আই গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার করল।

জেনিফার এফ বি আই-এর হাজত থেকে মাইকেলকে ফোন করল–মাইকেল, আমি জেনিফার। রাইকার আইল্যান্ডে আমি বন্দী, আমার জামিনের ব্যবস্থা কে করবে?

শান্ত হও। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। জিনো যাচ্ছে। ও সব ব্যবস্থা করবে। ফোন নামিয়ে রেখে মোরেটি জিনোকে ডেকে পাঠালেন।

–শোনো জিনো, জেনিফার পার্কারকে এফ বি আই রাইকার আইল্যান্ডে আটকে রেখেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ওর জামিন হয়ে যাবে। তারপর সোজা ওকে এখানে নিয়ে আসবে। আর হ্যাঁ, পথে আসতে আসতে, জেনিফারকে জানিয়ে দিও যে অ্যাডাম ওয়ার্নারকে নিয়ে আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই।

তার মানে? জিনোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

-হ্যাঁ। আজ নিউ ক্যানানের ব্রীজে একটা দুর্ঘটনা হবে। বক্তৃতা দিয়ে যাবার পথে অ্যাডাম ওয়ার্নারের মৃত্যু হবে।

.

জেনিফার পার্কার যাতে জামিন না পায়, তার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন রবার্ট ডি সিলভা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল তাকে। পাঁচ লক্ষ ডলার জামিনে জেনিফার খালাস হল।

আদালত থেকে ফিরছে জেনিফার। জিনো একথা সেকথার পর জানিয়ে দিল যে, নিউ ক্যানানের ব্রীজে এক দুর্ঘটনায় ভাষণ দিতে যাবার পথে অ্যাডাম ওয়ার্নারের মৃত্যু হবে। কথাটা শুনে জেনিফারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সে ছুতো করে একটা ওষুধের দোকানে গাড়ি দাঁড় করাল। জিনোর নজর এড়িয়ে একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে পড়ল। রবার্ট ডি সিলভাকে ফোন করে জানিয়ে দিল যে মাইকেল মোরেটি অ্যাডাম ওয়ার্নারকে খুন করার এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র করছেন।

.

জেনিফারের অপেক্ষাতেই মাইকেল মোরেটি বসেছিল।

-মাইকেল, তোমায় দেখে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, তা তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারছি না। জেনিফার সরাসরি কথাটা বলল।

আমিও তোমার অপেক্ষায় বসে আছি জেনিফার।

মেয়েটার অভিনয়ের প্রশংসা করলেন মোরেটি মনে মনে। অ্যাডাম ওয়ার্নারের সঙ্গে যোগসাজশ করে তার সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, আর এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

–তুমি ভালো আছে তো?

জেনিফারের প্রশ্নের জবাবে মোরেটি বললেন, খুব ভালো। এত ভালো এর আগে কখনও ছিলাম না। সেনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নার দুর্ঘটনায় মারা যাবেন। একটু পরেই খবরটা পাব।

জেনিফার উঠে দাঁড়াল–আচ্ছা, আমি এখন আসি।

বসো। মাইকেলের কণ্ঠস্বর হিমশীতল।

মাইকেল

শান্ত হয়ে বসো।

ঘরের বন্ধ দরজায় তখন ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনো। তার কঠিন মুখ, ভাবলেশহীন দৃষ্টি।

–মাইকেল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

–একটাও কথা বলবে না, চুপ করে বসে থাকো।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। মোরেটি ফোন তুললেন। কথা বললেন। ফোনের লাইন কেটে গেল।

–নিউ ক্যানান ব্রীজে পুলিশের ঢল নেমেছে।

তার মানে?

তার মানে ওখানেই তো অ্যাডাম ওয়ার্নার খুন হবে।

.

ব্যারিটন নদীর ওপর জোড়া ব্রীজের দিকে সেনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নারের লিমুজিন গাড়িটা ছুটে আসছিল। তার সঙ্গে ছিলেন তিনজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। ব্রীজের মুখে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিল একটা ট্রাক। লিমুজিন ব্রীজে উঠে এল। ট্রাকটিও উঠে এল। দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের খেলা শুরু হল।

–গাধা নাকি! লিমুজিনের ড্রাইভার বিরক্ত হল। এইটুকু ছোটো ব্রীজের ওপর দিয়ে পাশাপাশি দুটো গাড়ি কখনও যেতে পারে, সে হুঁশ নেই।

লিমুজিন স্পিড বাড়িয়ে দিল। ট্রাকও সেই গতিতে ছুটল। পর মুহূর্তেই লিমুজিন এক ধাক্কা খেল। লিমুজিন ব্রীজের ডানদিকের রেলিং ভেঙে বিপদজনকভাবে ঝুলে রইল। ট্রাকটি লিমুজিনকে বারবার আঘাত করল, যাতে দুশো ফুট নীচে ব্যারিটন নদীর অতলে ডুবে যায়।

অ্যাডাম এবং অন্যান্য আরোহীদের জীবন তখন মৃত্যুর কিনারায় এসে গেছে।

ট্রাকের ধাক্কা খেতে খেতে লিমুজিন ব্রীজের একেবারে কানায় এসে এমনভাবে ঝুলে রইল, যে একচুল নড়লেই জলে পড়ে যাবে।

ঠিক এই সময় কোথা থেকে দুটো হেলিকপ্টার এসে হাজির হল ব্রীজের ঠিক মাথার ওপর। হেলিকপ্টার থেকে ঝাঁকে ঝাকে গুলি ছুটে আসছে ট্রাক এবং তার ড্রাইভারকে লক্ষ্য। করে। ট্রাক স্তব্ধ হল। গোটা দুয়েক স্কোয়াড কার এসে থামল। উর্দিপরা পুলিশ অফিসাররা নেমে এলেন। তাদের হাতে উদ্যত রিভলবার। লিমুজিন গাড়ি থেকে অ্যাডাম ওয়ার্নার এবং অন্যান্য আরোহীদের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করলেন, অবশ্য জানলা দিয়ে।

.

বাবা, নিশ্চিন্ত হলাম। মাইকেল মোরেটি বলে উঠলেন, তোমার পুরুষ বন্ধুর ভবলীলা সাঙ্গ।

না, এ অসম্ভব। ফ্যাকাশে মুখে জেনিফার চিৎকার কর উঠল।

–আহা-হা, চটছো কেন। তুমিও সুবিচার পাবে। মোরেটি লাফিয়ে উঠে জেনিফারের মুখে কয়েকটা আঘাত করলেন। জেনিফার মেঝের ওপর পড়ে গেল।

জিনোকে গাড়ি আনতে বলল মোরেটি। জিনো প্রভুর নির্দেশ পালন করতে ঘরের বাইরে চলে গেল।

–তোমায় আমি ভালোবেসেছিলাম। আর তুমি কিনা এইভাবে আমার সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিলে?

জেনিফার নীরব। ওকে হ্যাঁচকা টানে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করাল মোরেটিআমাকে দিয়ে শরীরের সাধ মেটাবে তাই না। ওসব ভুলে যাও। যে নদীতে অ্যাডাম ডুবে মরেছে, তোমাকেও ওখানে পাঠিয়ে দেব। তারপর তোমরা দুজনে জলের গভীরে শুয়ে যত খুশী সোহাগ করো।

বস্। জিনো গ্যালো প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আতঙ্কে আর উত্তেজনায় কাঁপছে সে সর্বনাশ হয়ে গেছে বস্। বাইরে... ।

জিনোর কথা শেষ হল না। প্রচণ্ড একটা শব্দ শোনা গেল, কী যেন ভেঙে পড়েছে। মাইকেল মোরেটি ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা হাতে তুলে নিলেন।

সাবধান। একপাও নড়বেন না। ইতিমধ্যে দুজন এফ বি আই এজেন্ট ঘরে এসে ঢুকে পড়েছেন। তারা রিভলবার উঁচিয়ে আছেন।

নিমেষের মধ্যে মাইকেল মোরেটি তার আশু কর্তব্যটি স্থির করে ফেললেন। পরপর । তিনটি গুলি ছুঁড়ে দিলেন জেনিফারকে লক্ষ্য করে।

এজেন্ট দুজনের রিভলবার গর্জে উঠল। দুটি বুলেট এসে বিদ্ধ করল মাইকেল মোরেটির হৃৎপিন্ড। তারপর আরো একটি গুলি। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাইকেল মোরেটি পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন।

.

অপারেশন থিয়েটার থেকে জেনিফারকে নিয়ে আসা হল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। তখনও তার জ্ঞান ফেরেনি।

উর্দি পরা পুলিশ কর্মচারী, সাদা পোশাকের গোয়েন্দা আর খবরের কাগজের রিপোর্টারে গোটা হাসপাতাল গিজগিজ করছে।

রিসেপশনে এসে দাঁড়াল কেনেথ বেইলি–আমি জেনিফার পার্কারকে একবার দেখতে যেতে পারি কি?

আপনি কি ওর আত্মীয়?

না, বন্ধু।

দুঃখিত বাইরের লোকেদের এখন ঢোকার অনুমতি নেই। ওর এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

–বেশ, আমি তাহলে অপেক্ষা করি।

হাসপাতালের লাগোয়া একটি ছোটো ঘরে এসে ঢুকলেন অ্যাডাম ওয়ার্নার, সঙ্গে একদল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

–মিস পার্কারের শরীর এখন কেমন? একজন ডাক্তারকে অ্যাডাম প্রশ্ন করলেন।

আমরা পুরোপুরি ওর সেরে ওঠার ওপর ভরসা করতে পারছি না। তিনটে বুলেট তার শরীরে গেঁথেছিল।

এই সময় ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা ওই ঘরে প্রবেশ করলেন–অ্যাডামকে দেখে বললেন–আপনি নিশ্চয়ই সুস্থ আছেন?

–আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব। অ্যাডাম বললেন, আচ্ছা আপনি খবরটা জানলেন কী ভাবে?

জেনিফার পার্কারের কাছ থেকে। আমাকে ফোন করে বলেছিল নিউক্যানান ব্রীজে ওরা আপনাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছে। আমি ব্যাপারটাকে প্রথমে গুরুত্ব দিইনি নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের কোনো চাল, আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই। তাই পুলিশকে খবর দিলাম। ওরা ব্রীজ ঘিরে ফেলল। আপনি যেখান দিয়ে আসছেন সেখানেও পুলিশের হেলিকপ্টার গেল। জেনিফার পার্কারই এসবের মূল পান্ডা। সে আপনাকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিল বলে মনে হয়।

–না, অ্যাডাম কঠিন এবং কঠোর গলায় বলে উঠলেন, জেনিফার সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই।

–ডাক্তারদের সঙ্গে অ্যাডাম ওয়ার্নার এসে ঢুকলেন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, সেখানে জেনিফার অচেতন হয়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটি বন্ধ। মুখ ফ্যাকাসে। স্যালাইন আর রক্ত চলছে ফোঁটা ফোঁটা।

অ্যাডাম তাকালেন জেনিফারের দিকে। মনে পড়ে গেল সেই সেদিনের কথা। সেদিন জেনিফার রেগে গিয়ে তাকে বলেছিল–টাকা নিলে আমি এমন নোংরা পরিবেশে বাস করতাম? আপনি আপনার যা খুশী রিপোর্ট দিন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি একা থাকতে চাই।

সেই জেনিফার ছিল সাহসী, সে ছিল আদর্শবতী। সততা ও ন্যায়বিচারের পক্ষপাতি। আদর্শকে সে কখনও বিসর্জন দিতে চায়নি। তাহলে আজ? আজ কেন তার এই দুর্মতি? জেনিফারকে তিনি ভালোবেসেছেন। আজও একইরকম ভালবাসেন তাকে। একটা মারাত্মক ভুলের জন্য আজ তাদের সবার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এর জন্য অ্যাডাম নিজেকেই দায়ী করেন। তিনি জানেন, ওই অপরাধবোধ তাকে আমৃত্যু খুবলে খুবলে খাবে।

-উনি কেমন থাকেন, আমায় জানাবেন–অ্যাডামের কথা যেন বন্ধ হয়ে এল।

নিশ্চয়ই। ডাক্তার জবাব দিলেন।

জেনিফারের দিকে তাকালেন অ্যাডাম ওয়ার্নার। নীরবে তাকে বিদায় জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে তখন সাংবাদিকদের দল তার জন্য অপেক্ষা করছে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন জেনিফার শুনতে পেল সেই গলার আওয়াজ–যোশুয়া নেই। অ্যাডাম নেই, মাইকেল নেই। কে যেন তার কানে কানে এই দুঃসংবাদ শুনিয়ে গেল।

নিঃসঙ্গ এবং একাকিনী জেনিফার তখন শান্তির এক জগতে বিরাজ করছে। একটা শীতল অনুভূতি তার সর্বাঙ্গে ছেয়ে গেল। তার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ঘটে গেল।

.

জানুয়ারি মাস। হাড় কাঁপানো শীত। যুক্তরাষ্ট্রের চল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাডাম ওয়ার্নার শপথ গ্রহণ করবেন।

ওয়াশিংটনের কেলসোতে একটা ছোট্ট আইন, প্রতিষ্ঠানের অফিসে বসে আছে জেনিফার। সে টিভি সেট চালিয়ে দিল। প্রেসিডেন্ট অ্যাডাম ওয়ার্নারের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান সে দেখতে থাকল। তার পাশে বসে আছে স্ত্রী মেরীবেথ, সম্ভবত সে আবার মা হতে চলেছে, তাদের মেয়ে সামান্থাকেও দেখা গেল।

অনুষ্ঠান শেষ। দেখা গেল অ্যাডাম ওয়ার্নার স্ত্রী মেরীবেথ ও কন্যা সামান্থাকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে আসছেন। এবার তারা বাড়ি ফিরে যাবেন হয়তো।

জেনিফার টিভি সেট বন্ধ করে দিল। অফিসের বাইরে দেওয়ালে আঁটা সাইনবোর্ডের দিকে আচম্বিতে তার নজর পড়ে গেল–জেনিফার পার্কার। এ্যাটর্নি অ্যাট ল।

এখন থেকে জেনিফার ন্যায় ও সুবিচারের প্রতি আত্মনিবেদিত থাকবে। সে আদালতের দিকে হেঁটে চলেছে। সেখানে কেউ নেই। কেবল তুষার পড়ছে। সেই তুষার কণার মধ্যে দিয়ে সে ভবিষ্যতের পথকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে।

আসলে জেনিফার পার্কার তখন একটাই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে–কেন আমার জীবনের সব হাসি আর আনন্দ এভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল?